বৃক্ষ

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক :

তন্বী (এম্-সি সরকার এণ্ড্ সন্স্, কলিকাতা)
অর্কেষ্ট্রা (ভারতী ভবন, কলিকাতা)
ক্রন্দসী (ভারতী ভবন, কলিকাতা)

স্বগত

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত
প্রণীত

ভারতী ভবন
কলিকাতা

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে—

সূচীপত্র

সূচনা

বন্ধুমহলে আমার লেখা দুর্ব্বোধ্য ব'লে নিন্দিত। হিতৈষীদের বিচারে সংস্কৃত আর ইংরেজী ভাষার বর্ণসঙ্কর ঘটিয়ে আমি যে-অস্পৃশ্য রচনারীতির জন্ম দিয়েছি, বঙ্গভারতীর নাটমন্দিরেও সে-হরিজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ; এবং আত্মনির্ভরের অভাববশতই আমি যেকালে গুরুজনদের ভর্ৎসনাভাজন, তখন ওই অহৈতুক অপবাদকে অমূলক বিবেচনায় উপেক্ষা করা আমার সাধ্যের অতীত। সুতরাং আরম্ভেই জানিয়ে রাখছি যে স্বগত-শব্দটা স্বাগতের মুদ্রাকরপ্রমাদ নয়, ওই কালিদাসী রঙ্গনির্দ্দেশ শ্বেতদ্বীপ ঘুরে বাংলা নাট্যসাহিত্যে স্থান পেয়েছে প্রাক্‌মাইকেলী যুগ থেকে। সে-কালের বিপুলায়তন পাত্র-পাত্রীরা স্বাভাবিক জাড্যের দৌরাত্ম্যে যখন কর্ম্মকাণ্ডে নিজেদের মনোভাবপ্রকাশে অপারগ হতো, তখন তাদের অভিপ্রায় দর্শকের কাছে পৌছতো ওই বন্ধনীগত শব্দেরই দৌত্যে।

অদৃষ্টগতিকে আমিও সেই পঙ্গুসমাজের সভ্য। প্রকৃতিস্থ মানুষ যে-বয়সে বিষয়কর্ম্মে হাত পাকায় কিম্বা লোকসেবায় নেমে পরকালের পাথেয় জমায়, সে-কুলগ্নে শনির ক্রোধকটাক্ষে এসে আমার মনে কাব্যরোগের দারুণ দুর্লক্ষণ জাগে। জ্যোতির্গণনায় দেখা গেছে যে সে-সময়ে বৃহস্পতিও আমাকে সদ্ভাবসূত্রে বেঁধেছিলেন। তাই উক্ত ব্যাধি এ-ক্ষেত্রে আর মারাত্মক রূপ ধরে নি, আমার অধ্যবসায় চুকিয়েই রাশ টেনেছিলো। কিন্তু ভাগ্য পরিহাসরসিক; এবং স্বাস্থ্য আর কাজে লাগবে না বুঝেই সে মানুষের অসুখ সারায়। অতএব আমার বেলাতেও ছন্দোরক্ষা শেখার আগেই কাব্যঝর্ণা সমূলে শুকলো; এবং যা বাকী রইলো, তাকেই যদিও উনিশ শতকের বিখ্যাত খেয়ালীরা 'ঐশী অতৃপ্তি' বলেছেন, তবু তার নামকরণে আত্মগ্লানি ছাড়া অন্য কোনো কথাই আমি অন্তত খুঁজে পাই নি।

কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষের অহঙ্কার; তার আত্মপ্রসাদ রক্তবীজের বংশধর। সেইজন্যেই সে-সর্ব্বনাশের দায় আমি নিজের উপরে চাপাতে পারি নি, ভেবেছি আমার কবিপ্রতিভার অভাব বিরূপ পরিমণ্ডলের অভিশাপ। কিন্তু পরিমণ্ডল আরো দুর্ম্মর; সে স্থান-কাল-পাত্র-ভেদেও বদলায় না; তার নীল নয়নের নির্ব্বাক অনবধানে যে-বৈদ্যুতিক বিদ্রূপ নিহিত থাকে, তাতে অবচেতনার অন্ধকার কাটে, মমতার অশ্রুবাষ্প মহাশূন্যে উবে যায়, এবং কানে বাজে কেবল আত্মজিজ্ঞাসার আকাশবাণী, যেমন নৈর্ব্যক্তিক, তেমনি অনুপকারী। পরবর্ত্তী রচনাবলী সেই প্রশ্নোত্তরের ফলাফল; এবং কোন্

তবে উপরোক্ত ফিলজফি শুধু বিশ্ববীক্ষার লোভেই চর্চ্চনীয়; এবং একদেশদর্শিতা দার্শনিকের পক্ষেও একচক্ষু হরিণের মতোই সাংঘাতিক। তৎসত্ত্বেও আমার কাব্যজিজ্ঞাসা আপাতত দেহাত্মবাদী; এবং সে-দেহাত্মবাদে অন্যায় আস্ফালন নেই বটে, কিন্তু তার পক্ষপাত আমার নিজের কাছেও সুপরিস্ফুট। অথচ আমি মতপরিবর্ত্তনে অপারগ। কারণ মন আনুমানিক সামগ্রী; তার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ যেমন দুষ্কর, তার অতনু সত্তাও তেমনি কষ্টকল্পনা; এবং মানুষমাত্রেই যদিও কালে-ভদ্রে সঙ্কল্পের আভাস দেয়, তবু সে-সঙ্কল্পের অনন্য প্রকাশ অঙ্গসঞ্চালনে। অর্থাৎ চৈতন্যের স্বভাব বহিরায়তনিক; বস্তুর পৌত্তলিকতাই তাকে জ্ঞানগোচরে আনে; এবং অতিচিন্ময় পুরুষও নিজের অতলে তলিয়ে তার সাক্ষাৎ পান না, আবেগাদির শরীরধর্ম্মেই তার সাক্ষ্যসংগ্রহ করেন। অবশ্য এ-মত বের্গসঁ-প্রমুখ দার্শনিকদের অগ্রাহ্য; সার্ব্বভৌম সাধকসম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁরা সমস্বরে রটিয়েছেন যে স্বজ্ঞাপ্রসূত আত্মবেদ বাদে অন্য সকল অনুভূতিই মায়ামুগ্ধ ভেদবুদ্ধির উপদ্রব; এবং অনেকান্ত ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে ফ্রয়েডী মনঃস্তত্ত্বের সিদ্ধান্ত উক্ত অদ্বৈতবাদের অনুকূল। কিন্তু মনোবিদ্যা এখনো বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে উঠতে পারে নি; এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার অসৌকর্য্যবশত মানসজগতের অনেক সমস্যা আজও অমীমাংসিত ব'লেই, জিজ্ঞাসুরা সমস্যামাত্রকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য নন।

অন্ততপক্ষে এ-বিশ্বাস নিশ্চয়ই অস্বীকার্য্য যে জৈব প্রবৃত্তির যেহেতু একটা জাতিস্মর দিক আছে, তাই শিল্পপ্রতিভা লোকোত্তর প্রেরণার মুখপাত্র। উপরন্তু সমালোচনা বন্দনার সপত্নী; এবং প্রতিভাকে নিরুপাধিক বিবেচনায় ছেড়ে দিলে, হয়তো ভক্তিমার্গের চূড়ান্তে পৌঁছনো যায়, কিন্তু জ্ঞানমার্গের সূচ্যগ্র ভূমিও দখলে আসে না। আসলে প্রতিভা দুষ্প্রাপ্য হলেও, তার বিকাশ সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য; এবং যে-ক্ষেত্রে ভোগ বিদ্যমান, সেখানে ভোক্তা-ভোগীর সম্পর্কও নিঃসংশয়। সুতরাং সরস্বতীপূজায় আমি জাতিবিচার মানি না, দেবীর বরপুত্রদের বিশ্বমানবের প্রতিনিধি হিসাবেই দেখি; এবং মনুষ্যসংসারের অধিকাংশ ব্যাপার যখন দেহাচারের কল্যাণেই চলে, তখন কেবল কলাকৌশলের মধ্যে পরমাত্মার লীলাকৈবল্য খুঁজতে আমি প্রস্তুত নই। এই অনিচ্ছা অন্ধ কুসংস্কারের ফল কিনা জানি না; এ-প্রসঙ্গে অন্য সিদ্ধান্তও বোধহয় সম্ভব। কিন্তু দেহাত্মবাদে যতই ভুল-চুক থাক না কেন, অক্যামী ক্ষৌরকার্য্যে অনুমিতির বাহুল্যবর্জ্জনই চিত্তশুদ্ধির সনাতন উপায়।

প[illegible]ন্তরে দেহাত্মবাদ শুধু তত্ত্বসংক্ষেপের প্রয়োজনেই গ্রাহ্য নয়, মানুষের

সমাজজীবন যে-সর্ব্বসম্মতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাও দেহেরই দান। আমার শরীরে পরিবর্ত্তন ঘটাতেই আমি যেমন বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব মানি, তেমনি প্রতিবেশীদের মধ্যে অনুরূপ দেহাচার না চেনা পর্য্যন্ত সে-অবগতির সংশয় ঘোচে না। সে-ঐকতানও নিশ্চয়ই ঐকান্তিক; তবে তার সঙ্গে অন্তর্দর্শনের প্রভেদ সুস্পষ্ট। কারণ অপরের গতিবিধি আমারই ইন্দ্রিয়গম্য বটে, কিন্তু আত্মজ্ঞান খুব সম্ভব নিরিন্দ্রিয়, তার একমাত্র বার্ত্তাবহ হয়তো বা ভাবচ্ছবি। সুতরাং আত্মজ্ঞান স্বভাবতই বস্তুজ্ঞানের প্রতিযোগে পিছিয়ে পড়ে; এবং বহির্জ্জগতের উত্তেজনা যেহেতু একাধিক ইন্দ্রিয়কে একসঙ্গে উদ্বুদ্ধ করে, তাই তার ডাকে আমরা যত শীঘ্র সাড়া দিই, অন্তর্যামীর আদেশে সে-পরিমাণ ক্ষিপ্রতা আসে না। বোধহয় স্বপ্ন আর সত্যের তারতম্য এই সংখ্যাগত পার্থক্যের ফল; এবং পাঞ্চজন্য মতৈক্যের চেয়ে একজনের নিরুক্তিতেও ভুলের ভয় অপেক্ষাকৃত বেশি ব'লেই, সোহংবাদীরা সুদ্ধ কার্য্যত ভুয়োদর্শনকে আত্মদর্শনের অসবর্ণ ভাবেন।

আমার মতে সাহিত্যের বস্তুবত্তাও এই মৌলিক আত্ম-পর-বোধের ফল; এবং স্বয়ং হোমর যদিচ আমার উপলব্ধ গোটাকয়েক কালো রেখা ছাড়া অন্য কোনো প্রাণ-সামগ্রীর ধার ধারেন না, তবু আমার দৃষ্ট ভর্জিল্-শব্দের অভ্যাঘাতে পারিপার্শ্বিক আচরণের অন্যথা দেখেই আমি ওই কবিদ্বয়ের স্বাতন্ত্র্য বুঝি। যাঁরা স্মৃতিকে ভয় পান না, অন্তত গেষ্টাল্ট্-নামক স্নায়বিক রূপকল্পে যাঁদের শ্রদ্ধা আছে, তাঁরা হয়তো বহির্জ্জগতে না ঢুকেও স্বকীয়া-পরকীয়া-সংবাদ শোনেন। কিন্তু তাহলে ব্যক্তিকে আর অবিভাজ্য ও কালাতীত ভাবা চলে না, কালপ্রবাহের বুদ্বুদপরম্পরায় তার উপমা খুঁজতে হয়। কারণ জ্ঞান সর্ব্বদাই একটা তুলনামূলক ব্যাপার, এবং বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত যেখানে বহুর সমর্থনে তার যাথার্থ্যপ্রমাণে অপারগ, সেখানে জ্ঞাতার ভূতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজের সমীকরণেই সে চরিতার্থ। আসলে বহির্জ্জগৎ হয়তো জ্ঞাতারই বিবিধ অংশ, এবং জ্ঞান সেই অংশসমূহের সামঞ্জস্যসাধক; কিন্তু সংখ্যাভূয়িষ্ঠতাই যেকালে জ্ঞানের মুখ্য সম্বল, তখন স্বয়ংসম্পূর্ণ মন তার উপকারে লাগে না, বহুলাঙ্গ দেহেই সে সন্তুষ্ট।

অবশ্য মনের বালাই চুকলেও, প্রাণের আপদ ঘোচে না; এবং সাঙ্গ জীবের বিশ্লেষণে যদিও জড়বিজ্ঞানই প্রশস্ত, তবু তার স্নায়ুমণ্ডলীর সমগ্রতা পদার্থবিদ্যার অতীত। কিন্তু পদার্থবিদ্যার পরাজয় অবিদ্যার দিগ্বিজয় নয়; এবং অখণ্ড আর খণ্ডসমষ্টি সাধারণত তুল্যমূল্য না হলেও, অবৈকল্যের সঙ্গে ভূমার সৌসাদৃশ্য নগণ্য। কারণ বিদ্যমান বস্তুমাত্রেই যখন অল্প-বিস্তর সম্পূর্ণ, তখন কেবল স্বাধিকারগুণে মানুষ অসামান্য নয়। আসলে স্বাতন্ত্র্যের জন্যে

হয়তো প্রাণেরও প্রয়োজন নেই ; এবং স্টীম্ এঞ্জিন্ থেকে গরুর গাড়ি পর্য্যন্ত সকল রকম যানেরই চাকা আছে বটে, কিন্তু আকারে-প্রকারে, আচারে-ব্যবহারে উভয় যন্ত্র ভিন্নধর্ম্মী। ফলত ব্যক্তিস্বরূপেও রহস্যঘনতার স্থান নেই ; পৃথক পৃথক মানুষের বৃত্তি পৃথক ব'লেই, তারা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ; এবং বৃত্তি যেহেতু বৃত্তেরই গুণ, তাই নাস্তিজাত মানুষ যত ক্ষণ নাস্তিতে না ফেরে, তত ক্ষণ তার চক্রচরণের পরিচয় স্বতই অসমাপ্ত।

অর্থাৎ ব্যক্তির স্বরূপ তার আয়ুর সঙ্গে জড়িত ; এবং ভবিষ্যদ্ব্যাহত মানুষের কাছে ও-দুটোই অনিশ্চয় ঠেকলেও, সে-অনিশ্চয়বিধিতে স্বৈরাচারের সুযোগ নেই। কারণ হেগেল্-এর বিচারেও বিশুদ্ধ সত্তা শুধুই বিকল্পনা, সচরাচর অস্তিত্ব বলতে একটা প্রক্রিয়াকেই বোঝায় ; এবং সে-প্রক্রিয়ার যদি আর কোনো লক্ষণও না দেখি, তবু আত্মরক্ষার চেষ্টা তার স্বভাবগত। অতএব অবাধ স্বাধীনতা কেবল নাস্তির মধ্যেই সম্ভব ; যেখানে নিষ্ক্রিয়তা অনাদ্যন্ত, সেই সর্ব্বতোভদ্র নির্ব্বাচনক্ষেত্রেই সকল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত রাখা যায়। অন্যত্র নিয়মই সর্ব্বেসর্ব্বা ; এবং সে-নিয়ম হয়তো খেয়ালমতো স্বাধীনতার ছদ্মবেশ পরে, কিন্তু চুল-পরিমাণ ত্রুটি-বিচ্যুতিও তার প্রশ্রয় পায় না। সেইজন্যেই সতর্ক জীবনযাত্রার ফলে শুধু দীর্ঘায়ু মেলে, অমরতা আয়ত্তে আসে না ; সেইজন্যেই স্থলচর মোটর সংস্কারান্তে নৌকা চালাতে পারে, ঘোড়দৌড় জেতে না। অসাধ্যসাধনের ক্ষমতা ব্যক্তি-স্বরূপেরও নেই ; দেশ ও কালকে উৎরিয়ে তার দৈবী প্রভাব লোকে লোকান্তরে অনুস্যূত থাকে না ; তাকেও মানুষী উপায়েই ফুটিয়ে তুলতে হয় ; এবং উপায় যেকালে উদ্দেশ্যেরই দাস, তখন যে নিজের অভীষ্ট-সম্বন্ধে যতখানি সচেতন, তার ব্যক্তিস্বরূপ সেই অনুপাতে ব্যক্ত।

এই দিক থেকে দেখলে, ব্যক্তিস্বরূপ আর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশ খাবে না, বোঝা যাবে মরমীরা কেন একাগ্র ধ্যানের মধ্যে আত্মসমর্পণের উপদেশ দিয়ে গেছেন। কিন্তু আত্মসমর্পণই ব্যক্তিস্বরূপের সহায়ক, আত্মম্ভরিতা নয় ; এবং ইষ্টলাভ যেহেতু আত্মম্ভরিতার অনুকূল, তাই ব্যক্তিস্বরূপের পক্ষে সাধনা সিদ্ধির অগ্রগণ্য। হয়তো সেইজন্যেই সকল জাতির আধ্যাত্মিক আদর্শ ত্যাগবরণ করেছে ; হয়তো সেইজন্যেই বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণে সংসারযাত্রার পরাকাষ্ঠা দেখেছেন, মিলনবিমুখ মহাপ্রেমিকেরা খুঁজেছেন চিরবিরহ। কেননা প্রয়োগপ্রবণ মনোবিজ্ঞানের মতেও আলস্য মানুষের মজ্জাগত, সামঞ্জস্যের অভাবই তাকে সতর্ক রাখে ; এবং উন্নিদ্র চৈতন্যই যখন ব্যক্তি-স্বরূপের অদ্বিতীয় সম্বল, তখন গতব্যাগত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে তার আভাস নেই, তার [illegible] নিরুদ্দেশযাত্রায়

উদাহরণত ক্রাইস্ট্ উল্লেখযোগ্য; এবং চরিত্রগুণে তাঁর সমকক্ষ লোক আগে ও পরে এত জন্মেছে যে তাঁর নামে সে-রকম কোনো স্বকীয়তা মনে আসে না, জীবনের বিরাট বৈফল্যের জন্যেই তিনি আমাদের স্মরণীয়। বিমানের উদ্ভাবককেও শুধু বিশেষজ্ঞেরাই চেনেন, কিন্তু ডীভেলাস্ আবালবৃদ্ধবনিতার প্রিয়পাত্র; এবং লেওনার্দো যদিও চিত্রকরদের শিরোমণি, তবু জীবনীলেখকের কাছে তাঁর অকারী বৈজ্ঞানিক স্বপ্নগুলো শিল্পপ্রতিভার চেয়েও মূল্যবান্। অবশ্য এইজন্যেই ব্যক্তিত্ব অবজ্ঞেয় নয়; এবং তদ্ব্যতীত দিনগত পাপক্ষয় তো দুর্ঘট বটেই, এমনকি মুহূর্তের অযত্নে তো ব্যক্তিস্বরূপের মতো শূন্যে মিলায় না। কিন্তু এই অবিনশ্বরতাই আত্মচেতনার শত্রু; এবং লাভের কড়ি মুঠোয় না পেলে মানুষ যেমন তার হাতের অস্তিত্ব ভোলে না, তেমনি অসীমের আমন্ত্রণই সীমাকে জাগায়, ভূত-ভবিষ্যতের সমুদ্রমন্থনে ভেসে ওঠে বর্ত্তমান।

দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান ইলেক্ট্রনের চেয়েও চঞ্চল; পরিবর্ত্তনই তার তন্মাত্র; সে কোথায় ছিলো, তা বোঝার আগেই, এখন কোন্ দিকে চলেছে, এই তথ্যসন্ধানের প্রয়োজন পড়ে। কাজেই সে-মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবনে মানুষ বেশি দূর এগোতে পারে না; সে অগত্যা নিজের জ্ঞানার্জ্জনীবৃত্তির বিশ্লেষণে নামে এবং গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে আপন অক্ষমতার হিসাব নিয়ে জানে কোন্ নঙর্থক নিয়ম তার দুরাশার বাদ সাধছে। ফলত ব্যক্তি-স্বরূপ সদাসর্ব্বদা দ্বিমুখী; ব্যক্তির সামর্থ্যের অনুপাতে অভীপ্সার আতিশয্যই তার ঐকান্তিক উপলব্ধি; এবং ব্যক্তিস্বরূপ বাদ দিলে, যখন সাহিত্য আর সংবাদপত্রের মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না, তখন মন, প্রাণ বা আত্মিক সম্পদের জন্যে গৌরববোধ কবির কর্ত্তব্য নয়, তার আরাধ্য মাত্রাজ্ঞান আর তন্ময়তা।

অতএব কাব্যরচনা ও কাব্যবিবেচনা একই অখণ্ডতার এ-পিঠ আর ও-পিঠ; এবং কিশোরের অব্যক্ত কবিতা প্রৌঢ়ের বাচাল বৈদগ্ধ্যে বদলাক বা না বদলাক, পরিণত কাব্য যে আশৈশব বিতর্ক-বিচারের মুখাপেক্ষী, তাতে আমার তিলার্দ্ধ সন্দেহ নেই। কারণ কবিও সমালোচকের মতো সনির্ব্বন্ধ মানুষ; এবং অভ্যাসদোষে বা স্বভাবগুণে রসজ্ঞ যেমন তাঁর বালসুলভ আবেগের অনির্ব্বচনীয়তা জেনেও প্রাপ্তবয়স্ক রুচি-অরুচিকে সর্ব্ববাদিসম্মত ভাবেন, কবি তেমনি তাঁর প্রাথমিক প্রতর্কের অপদার্থতা বুঝেও পরবর্ত্তী জীবনের সুসম্বদ্ধ উপলব্ধিকে সংশয়ের চক্ষে দেখেন। কিন্তু তাঁদের অয়ন যদিও অভিন্ন, তবু উদ্দেশ একেবারে বিপরীত; এবং [illegible]মিতির অভাববশত স্বাবলম্বী স্রষ্টা যেখানে বহিরাশ্রয় খুঁজতে বাধ্য, সেখানে [illegible]রজীবী

সমালোচক অগত্যা স্বয়ম্ভর। অর্থাৎ কাব্যে তথা বৈদগ্ধ্যে, উভয়ত্রই, কীট্‌স্‌-প্রশংসিত নিরাশক্তি বা 'নেগেটিভ্‌ কেপেবিলিটি' ক্রিয়াশীল; এবং এই ঐক্য সত্ত্বেও, উক্ত শক্তি যেকালে নিষেধাত্মক, তখন হৃদয়বান কবি স্বকীয় ভাববিলাস হারিয়ে স্বাভাবিক বস্তুনিষ্ঠায় পৌছন, আর বুদ্ধিমান সমালোচক নিজের বিদ্যাভিমান ভুলে সংক্রামক চিত্তপ্রসাদে তলান।

আসলে এই সাঙ্কেতিক আত্মহত্যা ব্যক্তিস্বরূপেরই অভিব্যক্তি; এবং সেই আপাতবিরোধী অন্তঃসঙ্গতিতে বাদ না পড়লে, আমিও নিশ্চয় এতগুলো পুনরুক্তিময় প্রবন্ধে পাঠকের ধৈর্য্যপরীক্ষা করতুম না, প্রত্যেকটাতেই রস-সামগ্রীর পরিচয় দিতে পারতুম। কিন্তু রসপ্রতিপত্তি আজও বৈজ্ঞানিক সাধারণ্যের আয়ত্তে আসে নি ব'লে, সে-রহস্যের উদ্‌ঘাটনে শুধু অনুকম্পায়ীরই চমক ভাঙে; এবং সেইজন্যে এ-পুস্তকের অক্ষরে অক্ষরে ব্যক্তিস্বরূপের মুদ্রা থাকলেও, এর নির্ব্যূঢ়তা কিছু সকলেই মেনে নিতেন না, প্রামাণিকেরাই সব চেয়ে বেশি মাথা নাড়তেন। উপরন্তু সময়োপযোগিতাই প্রবন্ধের প্রাণ; এবং পরবর্ত্তী রচনাগুলোর সব কটাই যেকালে উপলক্ষ্যবিশেষের প্রতিক্রিয়া, তখন এই নৈমিত্তিক বিগ্রহে নিত্যের উদ্বোধন ন্যায়ের সাধ্য নয়, নিষ্ঠারই সাপেক্ষ। তাহলেও প্রবন্ধকার কালজ্ঞমাত্র, উচ্চল নিমেষের পদসেবা তাকে মানায় না; তার ভাবনা-বেদনায় অকপট আন্তরিকতার স্পর্শ না লাগলে, সে সহজেই পাঠকের মনোযোগ হারায়। বিশেষত সে যদি সমালোচকের ভূমিকায় লোকসমক্ষে নামে, তবে আর আত্মহারা ক্ষণবাদে তার কুলোয় না, ব্যক্তিস্বরূপ না হোক, অন্তত একটা নাতিভঙ্গুর আদর্শনির্ম্মাণে সে বাধ্য।

সেইজন্যে আমার চিন্তাধারার মানচিত্র এই প্রস্তাবনায় সন্নিবিষ্ট করলুম। কিন্তু এই ভৌগোলিক বৃত্তান্তে কোনো নূতন দেশের বিবরণ চাইলে, নৈরাশ্যই জুটবে। কারণ আমি আমার সমসাময়িক দিশারীদের অনুচর; তাঁদের অসমসাহস যে-দুর্গম পথকে লোকযাত্রার অধিকারে এনেছে, সেই অধুনানির্ব্বিঘ্ন মার্গ ই আমার বিহারভূমি; আমি জানি যে আমার মতো মামুলী মানুষের ক্ষেত্রে অজানার অভিসার কেবল উপহাস্যই নয়, দণ্ডযোগ্যও। অথচ আমার এই অকিঞ্চিৎকরতা এক হিসাবে যেমন শোচনীয়, অন্য দিকে তেমনি লাভজনক; এবং মৌলিকতার দারিদ্র্যই আমাকে ভবিষ্যতের কৌতূহলী দৃষ্টির আড়ালে রাখবে বটে, কিন্তু বর্ত্তমানের পক্ষে এই জাতীয় রোমন্থনেই আপন জীর্ণ উপজীব্যের সাক্ষ্য [illegible]জে পাওয়া সম্ভব। অতএব আমার নিষ্কুণ্ঠ চিন্তাচৌর্য্যের অতিমাত্রিক সাজস[illegible] অনাবশ্যক; পাঠকমাত্রের মনেই যেহেতু অনুরূপ মতামত উপ্ত

আছে, তাই আমার যুক্তিজালের অসম্পূর্ণতা তাঁরা স্বগত অন্বীক্ষার সীবনে জুড়ে নিতে পারবেন। বস্তুত আমি নিরবধি কাল বা বিপুলা পৃথ্বীর অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী নই, সমানধর্ম্মীর সহানুভূতিই আমার একান্ত কাম্য। বিদ্যা-বুদ্ধিতে আমাকে বহু পশ্চাতে ছেড়ে গিয়েও যে-অনুকম্পায়ী শুধু সুযোগের অভাবে এ পর্য্যন্ত সাহিত্যসমালোচনায় হাত দেন নি, তাঁর হৃদয়স্থ বররুচি পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলোয় স্বীয় মর্ম্মবাণীর প্রতিধ্বনি শুনবেন ব'লেই আমার বিশ্বাস।

এই রকম একটা অন্ধ বিশ্বাস না থাকলে, পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর পুনর্মুদ্রণ অসম্ভব; এবং আমি যেহেতু সত্যই ভাবি যে নগণ্য হলেও, আমি আমার দেশ ও কালের অবিকল প্রতিনিধি, তাই রচনারীতির যথাসাধ্য সংস্কার কোথাও আমার বিবেকে না বাধলেও, তদানীন্তন মতামতের ইদানীন্তন সংশোধনে আমি প্রায় সর্ব্বত্রই সঙ্কোচবোধ করেছি। তবে কালানুগত্য জন্মপত্রিকার ধার ধারে না; এবং যেমন সততার খাতিরে এ-কথা না মেনে আমার নিস্তার নেই যে এ-বইয়ের বহু সিদ্ধান্তেই আমি সম্প্রতি বীতশ্রদ্ধ, তেমনি সেই সঙ্গে এটুকু না জানালেও, অপলাপ বাঁচবে না যে অতিক্রান্ত মনোভাব এখনো আমার কাছে মতিভ্রমের সমপাংক্তেয় নয়, আমি বুঝি যে চিত্তবিপ্লব ব্যক্তিগত বৃদ্ধিরই অপরিহার্য্য অঙ্গ। সুতরাং বিশেষজ্ঞ বন্ধু-বান্ধবের প্রতিবাদ সত্ত্বেও অনেক সময়োচিত প্রমাদ সুদ্ধ আমি আজ পর্য্যন্ত ছাড়তে পারি নি; এবং যাতে সে-সব ভ্রান্তির স্বপক্ষে যতটা বলবার আছে, তা সবিস্তারে পাঠকের গোচরে আসে, সেই চেষ্টাতেই আমি প্রবন্ধগুলোকে বয়সানুক্রমে সাজাই নি, বিষয়ানুসারে বিবিধ বিভাগে চারিয়ে দিয়েছি। কিন্তু পরবর্ত্তী লেখার এক ছত্রও পুস্তকপ্রণয়নের সঙ্কল্পপ্রসূত নয়; এবং সেইজন্যেই আমার অতীত স্বগতোক্তির বর্ত্তমান ঐক্য কৃত্রিম ও কাল্পনিক, তার বিদ্যমান বিন্যাসে যুক্তির চেয়ে জেদই নিশ্চয় বেশি।

কাব্যের মুক্তি

কাব্য অনাদি; অথবা, *বিশেষণটায়* আমাদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি যদি পীড়া পায়, তবে বলা যেতে পারে যে আদিম মানুষ যবে নানা প্রকার ছন্দোবদ্ধ ধ্বনিকে বিবিধ বস্তু ও বিভিন্ন আবেগের সঙ্গে দুশ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধতে পারলে, সেই দিনই কাব্যের জন্মতিথি। সে আজ অনেক হাজার বছর আগের কথা। তার পর মানুষের ভাষা ক্রমশ বেড়ে উঠলো; এবং মানুষ দেখলে যে সেই বাক্যগুলিই অনায়াসে আমাদের মনে থাকে, যেগুলির মধ্যে যতির ব্যতিক্রম নেই। এই সূচনা থেকে কাব্যের পরবর্ত্তী বিকাশ সহজেই অনুমেয়: আস্তে আস্তে এখানে ওখানে এমন দু-এক জন নিশ্চয়ই দেখা দিতে লাগলো যাদের কল্পনাশক্তি অন্যদের তুলনায় ক্ষিপ্র, যাদের স্মৃতি সাধারণের চেয়ে সবল, যারা সমবেত সংঘের নীরব অনুমোদনে ও বিরল সহযোগে শুভ দিনে স্মরণীয় ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে সক্ষম। অল্পে অল্পে যখন সংঘ জাতিতে পরিণত হলো, এবং দৈনন্দিন কর্ত্তব্যগুলোকে মানুষ বৃত্তিতে বেঁটে নিলে, তখন এই গাথাপরিচালকের অনির্দ্দিষ্ট স্থান এলো চারণের দখলে। আধুনিক কবি সেই চারণের উত্তরাধিকারী।

কাব্যের জন্মবৃত্তান্তে আমাদের প্রয়োজন নেই; সে-সন্ধান নৃতত্ত্ববিদের। আমরা শুধু এইটুকু জানলেই সন্তুষ্ট যে কাব্য কবির পূর্ব্বপুরুষ, কবি কাব্যের জন্মদাতা নয়। প্রথম কবিতার আবির্ভাব হয়েছিলো কোনো ব্যক্তিবিশেষের মনে নয়, একটা মানবসমষ্টির মনে; প্রথম কবিতার প্রসার শুধু একটি মানুষের উপরে নয়, সমগ্র জীবনের উপরে; প্রাথমিক কবিতার উদ্দেশ্য বিকলন নয়, সঙ্কলন। সেই দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত কাব্যের বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি কেবল ক্ষয়ে গেছে, তার সেই নীহারিকার মতো আয়তন সৃষ্টির রীতিতে আজ কবি-রূপ উল্কাখণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ। ফলে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন কাব্যের পরিণতি এইখানেই সমাপ্ত কিনা। আমার তাই বিশ্বাস। আমি মনে করি এই ধরণের একটা পর্য্যায়ে পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে। এর পরেও আবার যদি কাব্যের মধ্যে একটা তীব্র জ্যোতি দেখা যায়, তবে বুঝবো সে-জ্যোতি পথচ্যুত উল্কার চিতাগ্নি।

উপরে যা বললুম, তার সমর্থনে এমন অভিমত পোষণীয় নয় যে এই অবশ্যম্ভাবী অধঃপতনের জন্যে দায়ী আধুনিক কবি। সে তো দূরের কথা, বরং আমার মনে হয় যে সাহিত্যের ইতিহাসে কবি আর কখনো এত শ্রদ্ধেয় রূপে দেখা দেয় নি। এত দিন ধ'রে স্থানে-অস্থানে তার অতিমানুষিকতার

যে-ঘোষণা শোনা গেছে, সে-দাবির প্রথম প্রমাণ এইবার হয়তো মিললো। কারণ চিরকালের কীর্ত্তিস্তম্ভগুলোকে ভেঙে চুরে সভ্যতার স্টীম্ রোলর আজ যখন তার অভিমুখে ধাবমান, তখনও দুঃসাহসে ভর ক'রে কবি আছে সৌন্দর্য্যের দরজা আগলে। তার মনে আশা নেই। সে জানে তার পরাজয় নিশ্চিত। সে বোঝে সে একা; যাদের জন্যে তার বিদ্রোহ, তাদের কাছে এই আসুরিক স্পর্দ্ধা যেহেতু পাগলামিরই নামান্তর, তাই তার পরিচিত বিশ্বকে দৈব ছাড়া আর কেউ বাঁচাতে পারবে না। তবু তার চেষ্টায় ত্রুটি নেই, বিরাম নেই তার গানে। সে-গান হয়তো আনন্দের নয়। তার কণ্ঠ হয়তো ক্রোধে ও ক্ষোভে কর্কশ। ভয় ভুলতেই সে হয়তো চেঁচিয়ে সারা। কিন্তু আসন্ন প্রলয়ের প্রখর কোলাহল ছাপিয়ে উঠেছে একা তারই বাণী। অতএব সে আমাদের নমস্য, রাহুগ্রস্ত হলেও, সে আমাদের নমস্য।

অনেকে বলবেন আমি একটু বাড়াবাড়ি করছি; এবং কাব্য যদি আসলে আর্ট হয়, তবে বেষ্টনীর বৈরিতায় তার আশঙ্কা নেই। এ-মত একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। কেননা মানুষ ও তার পরিমণ্ডলের মধ্যে সামঞ্জস্য আনে ব'লেই, আর্ট জীবনে এত অবর্জ্জনীয়; এবং সামাজিক অবস্থার প্রতিকূলতায় আর্ট অসম্ভব বটে, কিন্তু পরিণামে প্রতিবেশকে ছাড়িয়ে উঠতে না পারলে, তা নিরতিশয় ব্যর্থ। কথাগুলো যে নিতান্ত নিরর্থ নয়, তার প্রমাণ আধুনিক চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীত; এবং ললিত কলার অন্যান্য বিভাগে যাই ঘ'টে থাকুক, আজকের চিত্রে ও সঙ্গীতে বর্ত্তমান সভ্যতার বিকট বিভীষিকাগুলোও যে রূপের আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত নয়, তা অবশ্যস্বীকার্য্য।

এইখানে একটা কথা স্পষ্ট করতে চাই। উনবিংশ শতাব্দীর নবম দশকে কলাকৈবল্যের নামে দিন কতক যে-সোর-গোল উঠেছিলো, তার সঙ্গে উল্লিখিত অভিমতের কোন সংস্রব নেই। ওটি বরং ওয়াইল্ড্ ও তাঁর বিদগ্ধ বন্ধুদের অমূলক দম্ভের প্রতিবাদ। গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরে আমরা আর যাই খুইয়ে থাকি, অভিজ্ঞতার মূলধন সুদে বেড়েছে। অজস্র সংঘর্ষের ফলে আমরা আজ শিখেছি যে আসল স্বাতন্ত্র্য সংসারে তো দুর্লভ বটেই, এমনকি ব্রহ্মাণ্ডের নিভৃততম কোণেও তার ঠিকানা নেই; এবং আর্ট যেহেতু সৃষ্টিছাড়া নয়, সৃষ্টির অঙ্গমাত্র, তাই শিল্পোৎকর্ষের অনন্য পরীক্ষা সাময়িক জীবনের কষ্টিপাথরে তার যোগ্যতা ক'ষে দেখা। অবশ্য তার মানে এ নয় যে সকল কবিই মহাকালের ক্রীতদাস। কিন্তু অতঃপর এ-কথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে শুধু উন্মূল কবিতাই জাগতিক আকর্ষণের অবাধ্য; এবং সে-রকম

কাব্য হয়তো বা পিরামিডের আওতায় মৃত্যুকে ফাঁকি দেয়, তবু তার সাহায্যে মানুষের কৌতূহল মিটলেও, আত্মার অব্যক্ত জিজ্ঞাসা তার কাছে কোনো সদুত্তর পায় না।

এই মানদণ্ডে মাপলে, সাহিত্যের অনেক সমস্যা সরল হয়ে আসে। মহাকবির সমস্ত গুণাবলী নিয়েও টেনিসন্ কেন মহাকাব্যপ্রণয়নে ব্যর্থকাম, তার ব্যাখ্যা হয়তো এইখানে মেলে। কবির কর্ত্তব্য তার প্রতি দিনের বিশৃঙ্খল অভিজ্ঞতায় একটা পরম উপলব্ধির মাল্যরচনা। কবির উদ্দেশ্য তার চার পাশের অবচ্ছিন্ন জীবনের সঙ্গে প্রবহমাণ জীবনের সমীকরণ। কবির ব্রত তার স্বকীয় চৈতন্যের রসায়নে শুদ্ধ চৈতন্যের উদ্‌ভাবন্। বৈরাগ্যের দ্বারা, ত্যাগের সাহায্যে, আভিজাতিক মর্য্যাদাবোধের নির্দ্দেশে এ-সাধনায় সিদ্ধি পাওয়া যায় না; কাব্যের মুক্তি পরিগ্রহণে; এবং কবি যদি মহাকালের প্রসাদ চায়, তবে শুচিবায়ু তার অবশ্যবর্জ্জনীয়, তবে ভুক্তাবশিষ্টের সন্ধানে ভিক্ষাপাত্র হাতে নগরপরিক্রমা ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই। কারণ কাব্যের পথে উল্লঙ্ঘন চলে না; সেখানকার প্রত্যেকটি খাত পদব্রজে তরণীয়, প্রত্যেকটি ধূলিকণা শিরোধার্য্য, প্রত্যেক কণ্টক রক্তপিপাসু; সেখানে পলায়নের উপায় নেই, বিরতির পরিণাম মৃত্যু, বিমুখমাত্রেই অনুগামীর চরণাহত। এ-সত্যস্বীকারে যাঁরা কুণ্ঠিত, তাঁদের পক্ষে উনিশ শতকী কাব্যের অন্তিম দুর্দ্দশা স্মরণীয়। সেজান্ যখন গোলাবাড়ির চূণকাম-করা দেওয়ালে সুন্দরের স্বাক্ষর খুঁজছিলেন, তখন বাষ্পাকুল সুইন্‌বর্ন্ কুঞ্জ থেকে কুঞ্জান্তরে ছুটেছিলেন বনদেবীর অভিসারে—অতিমর্ত্ত্য আর্টের অন্তিম রিক্ততা এইখানেই পরিস্ফুট।

টেনিসন্ ও সুইন্‌বর্ন্-এর বিরাট কারবারের দরজায় হঠাৎ লাল বাতি জ্বালার ফলেই বোধহয় সে-দিনকার কবিমহলে হিসাবপরীক্ষার অত ধুম পড়েছিলো; এবং তার পর কারো বুঝতে বিশেষ দেরি লাগে নি যে বুনিয়াদী চাল বজায় রাখার ব্যর্থ চেষ্টাতেই অভিমানী কাব্য সর্ব্বস্ব খুইয়েছে। হিসাবনবিসেরা অনায়াসেই ভজিয়েছিলেন যে সারা উনবিংশ শতাব্দীতে এক গোড়ার দিকের তিন-চার জনকে বাদ দিলে, সকলে কেবল উড়িয়েছে, জমার কথা কেউ মুহূর্ত্তের জন্যেও ভাবে নি; কারো মাথায় আসে নি যে বিষয় যতই বড় হোক, বংশবৃদ্ধি ও কালক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারি না বাড়ালে, সোনার খনিও অবশেষে গজভুক্ত কপিত্থের দশা পায়। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর সুরুতেই দেখা গেলো যে পূর্ব্বপুরুষের অনন্ত শোষণে কাব্যের কলেবর থেকে অর্থ ও আবেগের মজ্জাটুকু শুকিয়েছে, প'ড়ে আছে শুধু কঙ্কাল, প্রতিধ্বনিপূর্ণ মরুভূমির মধ্যে প'ড়ে আছে শুধু দীর্ণ, জীর্ণ, বৈশিষ্ট্য-বিহীন কঙ্কাল।

What are the roots that clutch, what branches grow
Out of this stony rubbish? Son of man,
You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,
And the dry stone no sound of water...
Here is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rock without water...
There is not even silence in the mountains
But dry sterile thunder without rain
There is not even solitude in the mountains
But red sullen faces sneer and snarl
From door of mudcracked houses
If there were water
And no rock
If there were rock
And also water
And water
A spring
A pool among the rocks
If there were the sound of water only
Not the cicada
And dry grass singing
But the sound of water over a rock
Where the hermit thrush sings in the pine trees
Drip drop drip drop drop drop drop
But there is no water. (T. S. Eliot)

উপরের পংক্তি-কটা উনবিংশ শতাব্দীর যথাযথ বর্ণনা, এ-কথা অনেকেই মানবেন না। ব্রাউনিং-এর নাম নিয়ে, জানি, তাঁরা বলবেন যে অন্তত এই কবি উদ্ধৃত বিবরণের সঙ্গে খাপ খায় না। গত শতাব্দীর কাব্যমরুতে ব্রাউনিং যে শুধু রোমন্থন করেন নি, সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন, তা সহস্র বার স্বীকার্য্য। ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্‌ ও কোল্‌রিজ্‌ ছাড়া একমাত্র ব্রাউনিং-ই বুঝেছিলেন যে বাঁচতে চাইলে, ধ্বংসাবশিষ্ট পৈতৃক প্রাসাদের অন্তঃপুরে ব'সে রূপকথার রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখা কাব্যের আর চলবে না; তাকে বেরিয়ে আসতে হবে, পোকায়-খাওয়া শিরোপা, মরচে-পড়া

সাঁ:জোয়া, রজ্জুসার জয়মাল্য ফেলে তাকে বেরিয়ে আসতে হবে হাটের মাঝে, যেখানে পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ, দেব-দানব সমস্বরে জটলা পাকাতে ব্যস্ত।] তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে শুধু ব্রাউনিং-ই অস্পষ্টভাবে মেনেছিলেন যে নটরাজের নৃত্যের তাল সব সময়ে শ্রবণসুভগ নয়, সৃষ্টির সুরে আসন্ন-প্রসবার আর্ত্তনাদও মাঝে মাঝে শোনা যায়; একা তিনিই জেনেছিলেন যে সিদ্ধ-সমৃদ্ধদের অসহযোগে জীবনের মিছিলে হয়তো আড়ম্বরের অভাব ঘটে, কিন্তু নিঃস্ব-লাঞ্ছিতদের অপাংক্তেয় ভাবলে, সে-শোভাযাত্রার সঙ্গে শবযাত্রার কোনো প্রভেদ থাকে না।

সেইজন্যে ব্রাউনিং-ই সর্ব্বপ্রথমে কাব্যকে যুগরূপের ছাঁচে ঢালতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কেবল চেষ্টাই করেছিলেন সফল হন নি। যদি এই মহৎ বৈফল্যের হেতু খোঁজা যায়, তাহলে তাঁর কাব্যের দুটো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে: প্রথমত, দু-একটা বিরল দৃষ্টান্ত ছাড়া ব্রাউনিং-এর নায়ক-নায়িকার সকলেই ইহলোকে বেড়াতে এসেছিলেন বৈতরণীর পরপার থেকে; এবং দ্বিতীয়ত, তিনি যত পতিতের তরফে ওকালতি করেছেন, তাদের প্রত্যেকের পদস্খলন ঘটেছিলো হয় অনিচ্ছায়, নয় দৈব-দুর্ব্বিপাকে। এর প্রথমটা পরিগ্রহণ নয়, পলায়ন; এবং দ্বিতীয়টা অন্তর্দৃষ্টি নয়, অভিনয়, সেই ধরণের অহঙ্কৃত অভিনয় যার সাহায্যে ধর্ম্মধ্বজ উকিল আসামীর পক্ষে দাঁড়িয়ে কাজির উপরে ভোজ-বাজি খাটায়। কারণ কথাটা রূঢ় শোনালেও, এতে সন্দেহ নেই যে ব্রাউনিং খৃষ্টান, ক্রাইস্ট্ নন; এবং সেইজন্যে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে ভ্রষ্টের দল ইহলোকে ধার্ম্মিকের পাশে বসতে না পারলেও, পরলোকে করুণাময়ের কৃপাকণা কুড়বে, জীবনের ভগ্ন বৃত্ত পূরবে মরণে, এবং ইতিমধ্যে অভ্রান্ত জগতের অনন্ত তীর্থযাত্রায় কোথাও বিঘ্ন থাকবে না, বরং তার নিরুদ্বিগ্ন পুরঃসরণে ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল ফুটে উঠে অবিশ্বাসীর মূর্ত্ত প্রশ্নগুলোকে দেবে আগা-গোড়া ঢেকে। দুঃখের বিষয়, এই মঙ্গলময় জগতেও রুচিবিকার এত প্রচুর যে ব্রাউনিং-এর দুর্দ্দান্ত শুভবাদের পায়ে আমার মাথা কোনোমতেই নুইতে চায় না; এবং সেই রকম অতিবাস্তব মনোভাবের চেয়ে এমনকি ইন্দ্রিয়পরায়ণ "য়েলো বুক্"-এর অসুস্থ কলুষপ্রীতিও আমার কাছে বেশি স্বাভাবিক ঠেকে।

সে যাই হোক, উল্লিখিত অতিবাদের মাঝখানে বিংশ শতাব্দী চোখ খুললো। ফলে কোনো সৎকবিরই আর বুঝতে বাকী রইলো না যে সে-ফাঁকির মধ্যে সত্যের শৃঙ্খলা আনতে গেলে, আড়ম্বরের মোহ অবশ্য-পরিত্যাজ্য, অন্তঃসারশূন্য বস্তুমাত্রার আমূল উচ্ছেদ অত্যাবশ্যক। কেননা

শুধু নূতন ক'রে অট্টালিকানির্ম্মাণে কোনো স্বার্থকতা নেই, হর্ম্ম্যখানাকে বাসোপযোগী ও কালোপযোগী করা চাই, দেখা চাই যাতে আকাশের আলো তার ভিজে দেওয়ালে বাধা না পায়, বিশ্বের বাতাস ফিরে না যায়, তার অর্গলিত দ্বারের শিকল নেড়ে। সেজন্যে একটা নগণ্য বাহ্য সৌন্দর্য্যের দিকে নজর রেখে ইঁটের পর ইঁট সাজানো যথেষ্ট নয়, বাড়িতে যারা থাকবে, তাদের ভুললে চলবে না; ভুললে চলবে না তারা মানুষ, ভুললে চলবে না তারা রক্তে-মাংসে-গড়া, দুঃখ-আনন্দের দাস, পরিবর্ত্তনশীল, বর্দ্ধিষ্ণু। তাতে যদি প্রথাগত স্থাপত্য বর্জ্জনীয় ঠেকে, তবে তাই স্বীকার; তাতে যদি নাস্তিক, বস্তুবাদী ইত্যাদি অন্যায় অপবাদ ঘাড়ে পড়ে, তবে তাও বরণীয়। প্রথম দফায় দরকার অবৈকল্য, দ্বিতীয় দফায় দরকার অবৈকল্য, তৃতীয় দফায় দরকার অবৈকল্য, শেষের দফায় দরকার অবৈকল্য। বিংশ শতাব্দীর মূল মন্ত্রই হচ্ছে অবৈকল্য আর অকপটতা।

অকপট-বিশেষণটাকে আজ আমরা সন্দেহের চোখে দেখি। কারণ ওই মহাবাক্যের আশীর্ব্বাদে এ-জগতে যত প্রবঞ্চনা চ'লে গেছে, অন্য কিছুতে তার সিকির সিকিও আমদানি হয় নি। তাহলেও আজকের দিনে ও-শব্দটি একেবারেই অপরিহার্য্য। সাহিত্যে অকৃত্রিমতার মানে প্রত্যক্ষ দর্শনের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন অভিভাবের পরিণয়। এই কথাটাকেই আরো সহজে বলা যেতে পারে যে কবি যখন কোনো দৃষ্ট বস্তু বা অনুভূত ভাবের মুখপাত্র, তখন তার কবিতা শুধু সেই বস্তু বা সেই মনোভাবের আধারেই আবদ্ধ থাকবে, লোকাচার হিসাবে তাদের নাম জানতে চাইবে না।

এইখানে অনেকে হয়তো আপত্তি তুলবেন যে কবি যদি লোকাচারই বাদ দিলে, তবে জগৎকে কোলে নেওয়ার গর্ব্ব সে রাখে কি ক'রে? তার উত্তরে এইটুকুই স্মরণীয় যে লোকাচার আর জগৎ সমার্থবাচক নয়। ভারতের দণ্ডবিধি না মেনেও যখন ভারতকে আপন ব'লে ভাবা চলে, তখন লোকাচার উপেক্ষিত হলে, জগৎ নিপাতে যায় না; এবং ভারতশাসক যেমন ভারতবর্ষের আসল সত্তার প্রতিনিধি নয়, তেমনি একদল লোকের আচারে-ব্যবহারে বিশ্বমানবের আকার-প্রকার ধরা পড়ে না। সুতরাং মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করলে, জগতে কবির জায়গা মিলবে না বটে, কিন্তু সতীত্বে আস্থা খোয়ালেই, জীবনের প্রত্যাখ্যান অনিবার্য্য নয়; বরং তার পরেই যথার্থ জীবনবেদ সহজ ও সম্ভব। কারণ মৃত্যু যেহেতু জীবনের মূল তত্ত্ব, তাই তার প্রতি অবহেলা জীবনেরই অপমান; কিন্তু সমগ্র জীবযাত্রার তুলনায় মনুষ্যদেহ, এমনকি মনুষ্যসমাজ, এতই তুচ্ছ যে নারীমাহাত্ম্যের অস্বীকারে জীবনের মূল্য কমে না, বাড়ে।

কাব্যে অকপটতার এই ব্যাখ্যা যাঁদের কাছে আধ্যাত্মিক ঠেকবে, তাঁরা যেন ভুলে না যান যে (একটা লোকোত্তর পটভূমি না জুটলে, কবি তো কবি, খুব স্থূল অনুভূতির মানুষও বাঁচে না। ব্রহ্মাণ্ডের মূলে যদি আসলে কোনো মাঙ্গলিক নিয়ম নাও থাকে, তবু কবির পক্ষে একটা এমন কাল্পনিক নিয়মের প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক যার সূত্রে আমাদের দিনানুদৈনিক খণ্ড অভিজ্ঞতাগুলো সার্থক ও সংগ্রথিত।) চৈতন্য, বিশুদ্ধ চৈতন্য, এবং সঙ্কল্প, নিরহঙ্কার সঙ্কল্প, এই দুটি দুর্লভ গুণের সাহায্য-ব্যতিরেকে আমাদের পারিপার্শ্বিক নাস্তির মধ্যে কোনো রকমের শৃঙ্খলা আনা অসম্ভব। কিন্তু এ-কথা ভাবলে, খুবই অন্যায় হবে যে ওই দুটি ধ্রুবতারায় কেবল কবিরই প্রয়োজন, কেবল কবিরই অধিকার। অন্ধকার যেখানে ঘনায়মান, সেখানেই ওই আকাশপ্রদীপ অপরিহার্য্য, নিরুদ্দিষ্ট চক্রচরণে যার রুচি নেই, গন্তব্যে পৌঁছনোই যার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা, সেই উক্ত নিয়ামকদ্বয়ের অনুগত। তবে কবির সম্মান এইটুকু, তার মর্য্যাদা এইখানে যে মানুষের অনন্ত সন্ধিৎসা তার কণ্ঠে ভাষা পায়; এবং এইখানেই তার বৈশিষ্ট্যের শেষ। কারণ যে-কবির স্বকীয় অন্বেষণ এই সার্ব্বিক অন্বেষণের পরিপন্থী, তার অমরাবতী গ্রন্থবিহারের পরিত্যক্ত প্রকোষ্ঠে। এই অর্থেই ই-এম্ ফর্স্টর বোধহয় সকল মহৎ আর্টকে নৈরাত্ম বলেছেন; এবং সময়-রূপ চতুর্থ আয়তনের নির্দ্দেশে শাশ্বত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলতে না পারলে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিতান্ত মূল্যহীন। সেইজন্যই প্রত্যাখ্যান কবিকে সাজে না, এবং কালজ্ঞান ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই।

কথাগুলো হয়তো একটা উপমার দ্বারা সুবোধ্য হবে। কবি ঘটকের মতো; পাত্র-পাত্রীর মিলনেই তার উপকারিতার শেষ; তার পরে তার নাম কারো স্মরণে রইলো বা না রইলো, তা নিয়ে মাথা ঘামানো হাস্যকর। কিন্তু এ-মিলনসাধনের জন্যে অসাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা চাই, এমনকি খানিকটা বোধিও হয়তো ফেলা যায় না। শুধু জগতের প্রত্যেক পাত্র-পাত্রীর নাম মনে রাখাই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, সকলের প্রতি অনুকম্পাও তার অর্জ্জনীয়, যার ফলে সে দেখলেই, বলতে পারে কে কার যোগ্য। এই কার্য্যোদ্ধারে তার নিজের বিবাহিত জীবনের সুখ-দুঃখ সহায় ন..., অন্তরায়; এ-ক্ষেত্রে কোনো রকম পক্ষপাতপোষণও বিষম বিড়ম্বনা। রুচির মর্জ্জি মানতে গিয়ে সে যদি কোনো কুরূপাকে পার করার সুযোগ হেলায় হারায়, তাহলে বুঝতে হবে ব্যবসা থেকে অবসরগ্রহণের দিন তার ঘনিয়ে এসেছে। অপর পক্ষে ঘটকজীবনের অভিজ্ঞতা গার্হস্থ্যজীবনে চালানোর চেষ্টাও কম বিপজ্জনক নয়। সুতরাং নিরবলম্ব নিরপেক্ষতাই তার একমাত্র সম্বল, এবং তদ্ঘটিত পরিণয়ে কুফল ফললে, বিবাহ-সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ ধারণার বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী

এই রকম কোনো একটা আদর্শের প্ররোচনাতেই এলিয়ট্ কবিকে "ক্যাটালিটিক্ এজেণ্ট্" উপাধি দিয়েছেন।

আর্টে ব্যক্তিবাদ অচল শুনে অনেকেই হয়তো আঁৎকে উঠবেন। মুখ না নাড়লেও, তাঁরা মনে মনে ভাববেন যে সভ্যতার যাঁতাকলে প'ড়ে আজ সকলেই প্রায় পথধূলির সামিল; এত দিন একা কবি ছিলো একটু পৃথক, একা কবি ছিলো মানুষের অন্তর্হিত বৈচিত্র্যের স্মৃতি জাগাতে; এবারে এসেছে তার পালা, মানুষবনস্পতিকে ছাঁটাই কলে ফেলে দিয়াশলাই বানানোর একমাত্র বাধা আজ একেবারে ঘুচলো। আসলে কিন্তু এ-আশঙ্কা অহৈতুক; কারণ ব্যক্তি যখন বিশ্বমানবের মধ্যে নিঃশেষে ডুবে যায়, তখনই পিঞ্জরিত ব্যক্তিস্বরূপ পায় মুক্তি। এ-সত্য আমরা ইতিহাসে বার বার দেখেছি; এবং এখনও, এই ঐতিহ্যবিপ্লবের যুগেও বুদ্ধ, ক্রাইস্ট্, সেণ্ট্ ফ্রান্সিস্ অফ্ আসিসাই শুধু নিরর্থ, নিষ্ক্রিয় নাম নন, সে-নামের মাহাত্ম্যে আজও অঘটনসংঘটন সম্ভবপর। তাহলেও আমি কবির সামনে ধর্ম্মের আদর্শ ফুটিয়ে তুলতে চাই না; এবং ধার্ম্মিক ব'লেই উক্ত মহাপুরুষেরা আমার স্মরণীয় নন, তাঁদের নিরাসক্ত আত্মবিলোপই এখানে উল্লেখযোগ্য। অর্থাৎ মহাপ্রাণ যেমন খণ্ড প্রাণের বিসর্জ্জনেই লভ্য, তেমনি মহাকাব্যের আরম্ভ সেইখানে, যেখানে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের অবসান। কিন্তু এ-কথার মানে এ নয় যে কবিতে কবিতে প্রভেদ নেই; এবং মহানুভবতা সত্ত্বেও বুদ্ধ আর ক্রাইস্ট্ পৃথক, মহাকবি হয়েও শেক্স্পীয়র ও গোয়টে বিভিন্ন।

উল্লিখিত সিদ্ধান্তে যে আপাতবিরোধ আছে, তা হয়তো একটা উপমার সাহায্যে দূর হবে। কাব্য সমুদ্রের মতো, এবং কবি নদীমাত্র। সে যদি ইচ্ছা করে, তবে পথপ্রান্তের মরুভূমিতে নিজেকে অনায়াসে হারিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে আত্মনিমজ্জন চাইলে, একটা বিশেষ দিকে বইতে সে বাধ্য। তার সঙ্গে অন্য নদীর সাদৃশ্য এই দিগ্দর্শনে। কিন্তু গভীরতায়, বেগে, রাসায়নিক উপকরণে স্বকীয় সত্তাকে স্বতন্ত্র রাখার সুযোগ ও অধিকার তার নিশ্চয়ই আছে। পক্ষান্তরে কাব্যসমুদ্রেও বৈচিত্র্যের অপ্রতুল নেই। তার কোনো উপকূল পর্ব্বতবহুল, কোনো স্থান বা পঙ্কিল; কোনো অংশ হয়তো তরঙ্গায়িত, কোথাও বা মসৃণতা বিরাজমান। এমনকি তার আকারও চির কালের জন্যে নির্দ্দিষ্ট নয়; তার তলায় তলায় মানবচৈতন্য নিরন্তর বহ্যুৎগারে রত; এবং ফলে তার সীমা কখনও বা বাড়ে, কখনও আবার কমে। শুধু তাই নয়, তার আস্বাদনে সুদ্ধ অল্প-বিস্তর তারতম্য থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা নির্ব্বিকার গুণ তার সর্ব্বত্রই সদাসর্ব্বদা বর্ত্তমান; এবং উপযুক্ত নামকরণের অভাবে কাব্যের এই সনাতন লক্ষণটাকে

লাবণ্য বলা বোধহয় অনুচিত নয়। কিন্তু এই লাবণ্য মাত্রাভেদে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যেই লক্ষণীয়; এবং সেইজন্যেই কাব্যের সঙ্গে বিশ্বের যোগ স্বতঃপ্রমাণ।

উনিশ শতকী ব্যক্তিবাদের উত্তর রাগে যাঁদের মন এখনো রঞ্জিত, তাঁরা হয়তো নৈর্ব্যক্তিক কাব্যের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যকে অগ্রাহ্য করবেন; এবং কাব্যকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে তাঁদের আপত্তি সম্ভবত এই আকার ধরবে যে তাহলে সাহিত্যে আর স্বরগ্রামের তফাৎ ধরা পড়বে না, শোনা যাবে শুধু একটা বীভৎস চীৎকার। এই যুক্তির সাহায্যে আধুনিক কাব্যের তুলনায় সাবেকী কাব্যের শ্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদনই যদি তাঁদের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমার কোনো বক্তব্য নেই; কারণ রুচির খেয়াল তর্কাতীত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর কবিতায় আর যাই থাকুক, ব্যক্তিত্বের যে ছড়াছড়ি ছিলো না, এ-সত্যের সাক্ষ্য-স্বরূপ বাল্যজীবনের অধ্যাপকীয় অনুশাসনগুলোর স্মরণই যথেষ্ট। পরবর্ত্তী কবিদের উপরে ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্‌-এর প্রভাবপ্রমাণের জন্যে "উপযুক্ত পংক্তি"-র উদ্ধার এখানকার পরীক্ষার্থীদেরও অবশ্যকর্ত্তব্য কিনা জানি না, তবে আমাদের সময়ে সাফল্যের শিখরে পৌঁছতো কেবল শ্রুতিধরেরা; এবং সে-দিন সেই দুর্লভ স্মরণশক্তি আয়ত্তে আনতে পারলে, আজ অনায়াসেই ভজাতুম যে আঠারো ও উনিশ শতকের কবিরাও কখনো সোহংসিদ্ধি খোঁজে নি, সাময়িক পাঠকদের মন জোগাতে শুধু সর্ব্ববাদিসম্মত শালীনতার শরণ নিয়েছিলো। এই কথাকেই ঘুরিয়ে বলা চলে যে অবস্থাপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিতালক্ষ্মী প্রাকৃত পুষ্পাভরণ ছেড়ে কতকগুলো মজবুত সোনার গহনা গড়িয়েছিলেন; এবং সেই নির্ব্বিশেষ আড়ম্বরের আড়ালে আপনার আসন্ন বার্দ্ধক্য না ঢেকে তিনি কখনো কবির অভিসারে বেরোতেন না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সাহিত্যিক ও কথ্য ভাষার সমন্বয় ঘটিয়ে ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্‌ এই অলঙ্কারসর্ব্বস্ব সর্ব্ববল্লভার আস্ফালন থামান; এবং সেইজন্যেই তিনি আমাদের পূজ্য, সেইজন্যেই সাহিত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভে তাঁর নাম চিরতরে সাক্ষরিত।

গদ্য-পদ্যের সমীকরণচেষ্টায় ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্‌ কৃতকার্য্য হন নি; কারণ দৈনন্দিন ভাষা আর কাব্যের ভাষা বস্তুতই বিভিন্ন, বৈধ মতেই বিভিন্ন। এই প্রভেদ গদ্যের ও পদ্যের স্বভাবগত। গদ্যের অবলম্বন বিজ্ঞান, কাব্যের অন্বিষ্ট প্রজ্ঞান। তাই গদ্য চলে যুক্তির সঙ্গে পা মিলিয়ে, আর কাব্য নাচে ভাবের তালে তালে; গদ্য চায় আমাদের স্বীকৃতি, আর কাব্য খোঁজে আমাদের নিষ্ঠা; রেখার পরে রেখা টেনে পরিশ্রান্ত গদ্য যে-ছবি আঁকে, গোটা-কয়েক বিন্দুর বিন্যাসে কাব্যের যাদু সেই ছবিকেই ফুটিয়ে তোলে

আমাদের অনুকম্পার পটে। কাব্যের এই মরমী ব্রতে সিদ্ধি আসে প্রতীকের সাহায্যে। শব্দমাত্রেরই দুটো দিক আছে; একটা তার অর্থের দিক, অন্যটা তার রসপ্রতিপত্তির দিক। গদ্যের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক ওই প্রথম দিকটার খাতিরে; গদ্যে শব্দগুলো চিন্তার আধার। কিন্তু কাব্য শব্দের শরণ নেয় ওই দ্বিতীয় গুণের লোভে; কাব্যের শব্দ আবেগবাহী। এর থেকে বোঝা যাবে কাব্য কেন অভিজাত সহানুভূতিকে ছেড়ে অন্ত্যজ দরদকে কোল দিয়েছে। এর থেকে বোঝা যাবে নীচের নমুনাগুলি কেন কাব্য হিসাবে স্মরণীয়, এত স্মরণীয় যে আমার মতো অলসমনা লোকের পক্ষেও সেগুলোর আবৃত্তি দুষ্কর নয়:

...Immemorial elms
And murmur of innumerable bees. (Tennyson)

* * * *

পথে হলো দেরি, ঝ'রে গেলো চেরি,
দিন গেলো বৃথা, প্রিয়া;
তবুও তোমার ক্ষমাহাসি বহি
দেখা দিলো আজেলিয়া। (রবীন্দ্রনাথ)

* * * *

As cool as the wet leaves of the lily-of-the-valley
She lay beside me in the dawn. (Ezra Pound)

* * * *

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল। কৈ গো কৈ মেঘ? উদয় হও;
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি আজ মন্দ্র মন্থর বচন কও।
সূর্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ দাও হে কজ্জল, পাড়াও ঘুম;
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চ'লে যাও, অঙ্গে হর্ষের উঠুক ধুম। (সত্যেন্দ্রনাথ)

* * * *

Among twenty snowy mountains
The only moving thing
Was the eye of the blackbird. (Wallace Stevens)

মুহূর্তের বিচারেই বোঝা যাবে যে এই পংক্তিগুলোর ভাবানুষঙ্গ অভিধানের সাহায্যে স্পষ্ট হয় না। কারণ এদের অনির্বচনীয়তার মূলে শুধু শব্দার্থ নেই, আছে শব্দের অন্তঃশীল আবেগ, সমাবেশ ও ধ্বনিবৈচিত্র্য, এবং ছন্দের শোভনতা। এই গুণসমষ্টির নাম রূপ; এবং রূপের প্রত্যেক অঙ্গ

অপরিহার্য্য। রূপ আর প্রসঙ্গের পরিপূর্ণ সঙ্গমেই কাব্যের জন্ম। তাই কাব্যের ভাষান্তর অসাধ্য, তাই কাব্যের ভাষা আর কথ্য ভাষা স্বভাবত স্বতন্ত্র; তাই আধুনিক কাব্যে রূপের এত প্রাধান্য। ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ্‌ ভেবেছিলেন কবি বাগাড়ম্বর ছাড়লেই, কাব্যের কৃত্রিমতা ঘোচে। কিন্তু আমরা দেখছি যে ভাষা রূপের উপকরণমাত্র। সুতরাং আজকের কবি ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ্‌-এর পরামর্শে আর সন্তুষ্ট নয়। তার বিশ্বাস যে নিষ্কলুষ কাব্যে রূপ রূপজীবী নয়, রূপের সঙ্গে প্রসঙ্গের সম্পর্ক বৈধ ও স্থায়ী।

আসলে ভাষার সঙ্গত শাসন থেকে মুক্তি পাওয়া কাব্যের পক্ষে অসম্ভব। যে-শব্দ কোনো ভাষার অন্তর্গত নয়, যে-শব্দ কেবল নিরর্থ ধ্বনির সাহায্যে আবেগ জাগায়, কাব্যের চেয়ে মন্ত্রেই তার প্রয়োগ প্রশস্ত। লেখক ও পাঠকের মধ্যে অনুকম্পার সেতুবন্ধই যদি কাব্যের উদ্দেশ্য হয়, তবে কাব্যের শব্দ চির দিনই অভিধানের মুখাপেক্ষী থাকবে। এ-যুক্তির দ্বারা আমি কবিকে শব্দপ্রণয়নের সনাতন অধিকারে বঞ্চিত করতে চাইছি না। শুধু এইটুকু বলছি যে দুগ্ধপোষ্য শব্দের চেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক শব্দই বেশি কর্ম্মঠ, এবং 'কেমিস্ট্রী'-র তুলনায় 'অ্যাল্কেমি'-র ভাবানুষঙ্গ গভীরতর। কিন্তু মানুষের কার্য্যকারিতার যেমন একটা সীমা আছে, তেমনি শব্দের সক্রিয়তাও অমিত নয়। শব্দের স্বভাব টাকার মতো; বহু ব্যবহারে তা ক্ষয়ে যায়, হস্তান্তরে তাতে কলঙ্ক জমে, বয়স তাকে অচল করে, আবার কালে সে স্থান পায় যাদুঘরের গ্লাস্‌কেসে। কিন্তু ম্যুজিয়ম্‌-ভুক্তি বিলুপ্তির নামান্তর নয়; অপ্রচলিত শব্দও অবস্থাবিশেষে কাজে লাগে। প্রাচীন মুদ্রার ব্যাবহারিক মূল্য যখন ক'মে আসে, তখন তার আলঙ্কারিক মর্য্যাদা বাড়ে।

অতএব রূপদক্ষের হাতে পড়লে, পুরানো শব্দও কাব্যের বাদ সাধে না; এবং ডাউটি-র রচনায় অ্যাংলো-স্যাক্সন্‌ শব্দগুলোই আমার কথার শ্রেষ্ঠ সাক্ষী। উপরন্তু সম্ভ্রান্ত শব্দ-সম্বন্ধে যে-কথা খাটে, অপভাষার পক্ষেও তা মিথ্যা নয়, এবং ক্ষেত্রবিশেষে, বিশিষ্ট ভাবানুষঙ্গের খাতিরে আধুনিক কবি সাধু-অসাধু, নবীন-প্রবীণ, দেশী-বিদেশী, সকল শব্দকেই সমান প্রশ্রয় দেয়। ভাষার বিষয়ে তার একমাত্র মানদণ্ড প্রাসঙ্গিকতা; কেননা ভাষা রূপেরই উপাদান। সেইজন্যেই ভাষা-সম্বন্ধে ওয়র্ডস্‌ওয়র্থী বিপ্লববাদের উপেক্ষা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। তবু সে-যুগের চরমপন্থী ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ্‌ আত্মজ্ঞ অকৃত্রিমতার গরজে যেখানে গেয়েছিলেন:

> And now the same strong voice more near
> Said cordially, "My friend, what cheer?
> Rough doing these! as God's my judge,

The sky owes somebody a grudge!
We have had in half an hour or less
A twelve months' terror and distress!

সেখানেই এ-যুগের রক্ষণশীল রুপর্ট্ ব্রুক্ স্বসিদ্ধ ভাষায় লিখতে পেরেছেন :

The damned ship lurched and slithered. Quiet and quick
My cold gorge rose; the long sea rolled; I knew
I must think hard of something or be sick
And could think hard of only one thing—you!
Do I forget you? Retching twist and tie me,
Old meat, good meals, brown gobbets up I throw,
Do I remember? Acrid and slimy,
The sobs and slobber of a last year's woe.........

ভাষা, ভাব আর ছন্দ, এই তিনের সন্নিপাতে কাব্য গ'ড়ে ওঠে। ভাষা ও ভাব-সম্বন্ধে কোনো রকম পূর্ব্বসংস্কার পোষণীয় নয়; এবং আধুনিক তরুণদের মতো তারাও মিলন-ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষের হিতোপদেশ মানে না, বলে আবেগসৃষ্টিই যখন তাদের ধর্ম্ম, তখন স্বয়ম্বরপ্রথার পুনঃপ্রচলন অত্যাবশ্যক। ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, আমাদের কপটতার ভয় দেখিয়ে তারা তাদের অভীষ্টসিদ্ধ করেছে। এবারে এসেছে ছন্দের পালা। এখন প্রশ্ন এই যে কৃত্রিমতার আশঙ্কায় কি মাত্রাগণনাও উঠে যাবে, এবং তাহলে কাব্যের আর থাকবে কী? সমস্যাটা সবিশেষে বিচার্য্য; কিন্তু সে-প্রসঙ্গ এত বিস্তারিত যে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা এখানে অসম্ভব। এখানে কেবল এইটুকুই স্মরণীয় যে ছন্দ আর মিল এক জিনিস নয়; মিল কাব্যের অপেক্ষাকৃত নূতন অলঙ্কার, ছন্দ অনাদি। কাব্যের জন্মবৃত্তান্তের তদন্তে নেমে আমরা বুঝেছিলুম যে আবেগের সঙ্গে ছন্দের সংমিশ্রণেই কাব্যের উৎপত্তি। কিন্তু সে-বিবরণ হয়তো একেবারে নির্ভুল নয়; তাতে ছন্দই জ্যেষ্ঠের আসন পেয়েছিলো, হয়তো আসলে সে-সম্মান তাকে অদেয়। কারণ ছন্দ আর আবেগ যমজ, তাদের টান নাড়ির টান; এবং আবেগ আর বেগ বিষমার্থবাচক, আবেগের মধ্যে বেগের চেয়ে বিরামই বেশি; অর্থাৎ মুখর আবেগ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়য় না, চলে বিরতিবহুল গতিতে। ধ্বনি ও যতির এই সুব্যবস্থিত নক্সাই বোধহয় ছন্দ; এবং ছন্দের এই সংজ্ঞা সমীচীন হলে, গদ্য-পদ্যের সীমাসন্ধি অনিশ্চিত। উদাহরণত রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' উল্লেখযোগ্য; এবং উদ্ধৃতাংশ পড়ার পরে এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে আবেগপ্রবণ গদ্য কাব্য-পদবাচ্য।

এখানে নামলো সন্ধ্যা। সূর্য্যদেব, কোন্ দেশে, কোন্ সমুদ্রপারে তোমার প্রভাত হলো?

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো; কোন্খানে ফুট্‌লো ভোরবেলাকার কনকচাঁপা?

জাগলো কে? নিবিয়ে দিলো সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ, ফেলে দিলো রাত্রে-গাঁথা সেঁউতি ফুলের মালা।

এখানে একে একে দরজায় আগল পড়্‌লো, সেখানে জানলা গেলো খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।

কুসংস্কার ছেড়ে শুনলে, আমাদের কান ওই লাইন-কটার মধ্যে একটা অদৃশ্য ছন্দের ঝঙ্কার ধরতে পারবে। কিন্তু সেই গূঢ় শৃঙ্খলার মূলে কোনো রহস্য নেই; কেবল উপমা আর ভাবের বৈকল্পিক বিন্যাসেই সেই প্রতিসাম্য সুগঠিত। তুলাদণ্ডের এক দিকে সন্ধ্যা যেমনি রজনীগন্ধার ভারে নুয়ে পড়ে, অমনি ভোরবেলাকার কনকচাঁপা ফুটে উঠে তাদের প্রতিপক্ষে দাঁড়ায়; আমাদের সংশয় যেই শুধোয় 'জাগলো কে?' তখনি অর্ঘ্যে আর আরাত্রিকে তার প্রশ্ন যায় হারিয়ে; কল্পনার পালে স্বপ্নের হাওয়া লেগে ঘাটবিবাগী নৌকো ঘুমন্ত মাঝিকে নিয়ে করে নিরুদ্দেশযাত্রা।

ওই লেখাটাকে যদি কাব্যের পর্য্যায়ে ফেলা অসঙ্গত না হয়, তবে আমরা মানতে বাধ্য যে আলঙ্কারিকের গণিতসাপেক্ষ ছন্দ-ব্যতিরেকেও কবিতারচনা সম্ভব। বস্তুত আলঙ্কারিক যাকে ছন্দ বলে, সে একটা যান্ত্রিক কৌশলমাত্র; সেই নাগরদোলার ঘূর্ণি লেগেই আমাদের মন অনেক সময়ে কবিতাবিশেষের মধ্যে ভাব আর আবেগের অভাব দেখতে পায় না। সংস্কৃত কবিরা এই যন্ত্রবিদ্যাটাকে খুব ভালো ক'রে আয়ত্তে এনেছিলেন; সংস্কৃত কাব্যের প্রকাণ্ড ফাঁকি সেইজন্যেই অদ্যাবধি ধরা পড়ে নি। সেইজন্যেই অজবিলাপের এই বিখ্যাত শ্লোকটা শোকের সঙ্গে কোনো সংস্রব না রেখেও আমার মনে একটা দারুণ বিষাদের মুগ্ধ মূর্ত্তি ফুটিয়ে তোলে:

> স্রগিয়ং যদি জীবিতাপহা
> হৃদয়ে কিং নিহিতা ন হন্তি মাম্।
> বিষমপ্যমৃতং কচিদ্‌ভবেৎ
> অমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া।

কিন্তু যখনই মোহ কাটে, তখনই বুঝি কালিদাস সে-দিন সুন্দরীর শরণ নিয়েছিলেন আবেগের স্বসমুত্থ ধারা শুকিয়ে এসেছিলো ব'লেই।

আধুনিক কবি আমার এই মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন না করলেও,

আসে; এবং পরের তিন লাইনে সেই বহ্বারম্ভের নিষ্ঠুর, নিরর্থ পরিসমাপ্তি আমাকে জর্জ্জরিত ক'রে দেয়। পংক্তি-কটার বিধিবদ্ধ সঙ্কীর্ণতার ভিতরে দেখতে পাই একটি নিরুদ্বিগ্ন, নির্ব্বোধ রমণী ভাঙা বাসরে অকারণে ঘুরে বেড়াচ্ছে; এবং মিলের ধাক্কায় জেগে গ্রামোফোন-শব্দটা অনর্গল স্পর্দ্ধায় আমাকে বলতে থাকে যে এই নগণ্য নাটিকার মুখ্য প্রবর্ত্তনা তারই চীৎকারের মতো যান্ত্রিক, তারই উল্লাসের মতো নিরর্থক।

স্বয়ম্বহ ছন্দের এই নমুনার পাশে পোপ্-অনূদিত হোমর-কে বসালেই, ধরা পড়বে আধুনিক কবি কাব্যকে কেন প্রথাসিদ্ধ ছাঁচে ঢালতে অসম্মত। তার বিশ্বাস কাব্য বিজ্ঞানোক্ত ক্রিস্টালের মতো; সুযোগ মিললে, সে আপনার রূপ আপনি বেছে নিতে পারে; কিন্তু বাহ্য উপদ্রবে তার মধ্যে ফোটে শুধু বিকার। এই কথার ভিতরে কাব্যের অতিমর্ত্ত্যতার কোনো আভাস নেই। আধুনিক কবি প্রেরণা মানে বটে, কিন্তু প্রেরণা বলতে সে বোঝে পরিশ্রমের পুরস্কার। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে কাব্য যদি সত্যই স্বয়ম্ভূ, তবে কবি পারিশ্রমিকপ্রার্থী কোন্ সাহসে। এর উত্তরে বক্তব্য এই যে কাব্য সেই অর্থে স্বয়ম্ভূ, যে-অর্থে স্বয়ম্ভূ গাছ। এক দিন হয়তো সে বাড়ার আনন্দেই আকাশে হাত বাড়াতো। কিন্তু বিশ্বের সেই আদিম উর্ব্বরতা আজ আর নেই। এখন সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজসংগ্রহ না করলে, কাব্যের কল্পতরু জন্মায় না। তার পর বহু পরিচর্য্যার ফলে তার অঙ্কুর দেখা দিলেও, কবি নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় পায় না, তখনও উন্নিদ্র যত্নে সেই অনিকাম বৃদ্ধির রক্ষণাবেক্ষণ তার অবশ্যকর্ত্তব্য; এবং এই অসামান্য আত্মোৎসর্গের প্রতিদানে কবি আর কিছুই চায় না, সে শুধু আশা করে যে কাব্যের অক্ষয় বট কেবল তাকেই আতপতাপ থেকে বাঁচাবে না, সকল শরণাগতকে অনুরূপ আশ্রিতবাৎসল্য দেখাবে।

স্থান ও সময়-সংক্ষেপের চেষ্টায় আধুনিক কবির মোহমুক্তিকে আমি যতখানি সরল বললুম, তা অপ্রাকৃত। আসলে তার প্রগতি ইস্রেলীয়দের মতোই পতন ও অভ্যুদয়ে বন্ধুর। তার প্রতিশ্রুত নন্দনের পথ বারম্বার মরুর প্রান্তরে দিশা হারিয়েছে, জনপদের কুহকে গন্তব্য ভুলেছে, দেবতাকে ছেড়ে অনুসরণ করেছে অপদেবতার। প্রতীকীদের রুদ্ধশ্বাস পানশালা থেকে বেরিয়ে তার চোখে এমনি ধাঁধাঁ লেগেছে যে সে কেঁচোমাটি আর পাহাড়ের তফাৎ বোঝে নি। এ-নেশা কাটার সঙ্গে সঙ্গে সে ভেবেছে সিম্বলিস্ট্‌দের অস্বাস্থ্যকর ভাবালুতার চেয়ে ইমেজিস্ট্‌দের ডঙ্কামুখর চিত্রলতা বুঝি অধিক সারগর্ভ। কিন্তু ভাবচ্ছবিও জীবন্ত নয়, তাতে রূপরেখার স্পষ্টতা থাকলেও, রক্ত-মাংশের সংস্পর্শ নেই; এবং সেইজন্যে এইচ্-ডি-প্রমুখ

পৌত্তলিকদের অর্ব্বাচীন ধ্রুপদ অচিরে ডুবেছে জর্জিয়ান্ গোপগাথার নকল ভাটিয়ালে। ইতিমধ্যে বেধেছে মহাযুদ্ধ, তাণ্ডবের উতরোলে গ্রাম্য গীতি আর শোনা যায় নি, সনাতনীরাও আর না মেনে পারে নি যে চষা মাঠ ছাড়াও পৃথিবীতে অন্য এক রকম ক্ষেত্র আছে, যেখানে লাঙল চলে না, গোলা-গুলি আঁকে মরণের রেখা। এই উপলব্ধির চরম ও পরম নিদর্শন বোধহয় ওয়েন্-এর নিম্নলিখিত কবিতা :

Move him in the sun—
Gently its touch awoke him once,
At home, whispering of fields unsown.
Always it woke him, even in France,
Until this morning and this snow.
If anything might rouse him now
The kind old sun will know.

Think how it wakes the seeds,—
Woke, once, the clays of a cold star.
Are limbs so dear-achieved, are sides,
Full-nerved—still warm—too hard to stir?
Was it for this the day grew tall?
—O what made fatuous sunbeams toil
To break earth's sleep at all?

বাঞ্ছিত সহজতার সুরু এইখানে। কিন্তু আধুনিক কবির অগ্নিপরীক্ষা সে-দিনেও শেষ হয় নি; তখনও তার বুঝতে বাকী ছিলো যে শান্তি যুদ্ধের চেয়ে আরো নিরাশ্বাস, আরো নিঃসঙ্গ, আরো ভয়ঙ্কর। সম্প্রতি তার ভ্রান্তিবিলাস-নাটিকার উপরে যবনিকা পড়েছে, তার আত্মম্ভরি প্রগল্‌ভতার আর অণুমাত্র অবশিষ্ট নেই; আজ তার আড়ম্বরশূন্য লেখনী অনায়াসেই লিখতে পারে :

These fought in any case,
and some believing,
                    pro domo, in any case...
Some quick to arm,
some for adventure,
some from fear of weakness,
some from fear of censure,
some for love of slaughter in imagination,
learning later...
some in fear, learning love of slaughter;

Died some, pro patria,
non 'dolce' non 'et decor'......
walked eye-deep in hell
believing in old men's lies, then unbelieving
came home, home to a lie,
home to many deceits,
home to old lies and new infamy;
usury age-old and age-thick
and liars in public places.

Daring as never before.
Young blood and high blood,
fair cheeks, and fine bodies;
fortitude as never before,
frankness as never before,
disillusion as never told in old days,
hysterias, trench confessions,
laughter out of dead bellies. (Ezra Pound)

কিন্তু এই কি তার অন্বিষ্ট নন্দন ?

এত ক্ষণ আধুনিক কবিদের সাধনার কথা বলেছি; এইবার তার সিদ্ধির পরিমাপ করা যাক্। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সে মহৎ কবিতা লিখেছে। সে হয়তো শেক্স্‌পীয়র-এর পাশে স্থান পাবে না; কিন্তু তার কারণ উৎকর্ষের অভাব নয়, তার কারণ জাতির ভিন্নতা। অবশ্য এ-কথা নিঃসন্দেহ যে বর্ত্তমান কবিদের অধিকাংশই সাম্প্রতিক, আধুনিক নন। কিন্তু এ-দুর্নাম শুধু আমাদের যুগেরই প্রাপ্য নয়, অতীতের কাব্যসমষ্টিতেও সূর্য্যের চেয়ে বালির তাপই বেশি। তবে আজকালকার শ্রেষ্ঠ কবিতা-সম্বন্ধেও একটা দারুণ অভিযোগ আংশিক ভাবে সত্য: এখনকার কবিতা দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু দুরূহতার দুটো দিক আছে, একটা পাঠকের দিক, অন্যটা লেখকের। যে-দুরূহতার জন্ম পাঠকের আলস্যে, তার জন্যে কবির উপরে দোষারোপ অন্যায়। দর্শন-বিজ্ঞান-গণিতকে বাদ দিলেও, কলার অন্যান্য বিভাগে প্রবেশাধিকার যে-আগ্রহ, অভিনিবেশ ও অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে, কবি যদি তার নিজের কলার বিভাগে সেই পরিমাণের শ্রদ্ধা ও একাগ্রতা চায়, তাহলে তার দাবি নিশ্চয়ই সঙ্গত। কিন্তু যে-দুরূহতার উৎপত্তি অনুকম্পার অভাবে, যার মূলে কবির নিজের দ্বিধা নিহিত, তার কতকটার দায় যুগসন্ধির স্কন্ধে চাপানো গেলেও, বেশির ভাগটাই কবির বহনীয়।

পূর্ব্বেই দেখিয়েছি যে কাব্য কেবল তখনই অমর-পদবাচ্য, যখন তার

সন্ধান প্রতর্ক ছাড়িয়ে পৌঁছয় প্রমিতিতে। এই উদ্বর্ত্তন আধুনিক কাব্যে দুর্লভ; এবং অন্তত আমার মনে এমন আশা নেই যে এ-দিক থেকে সে কখনো লব্ধকাম হবে। কারণ জীবনের সহজ সূত্র পাঁচ হাজার বছরে যে-জটিল ও কুটিল আকার ধরেছে, তাতে প্রাথমিক ঋজুতা স্বতই অনুপস্থিত; এবং আমাদের জ্ঞান যেহেতু কমছে না, প্রত্যহ বেড়ে চলেছে, তাই প্রাক্তন বিশ্ববীক্ষার অবৈকল্য আজ অভাবনীয়। বর্ত্তমানের বুদ্ধি বৈনাশিক; তার উল্লেখনী মানুষী কীর্ত্তিস্তম্ভের আপতিক ভিত্তিকে এমনি নিষ্ঠুর অন্বেষণে আমাদের জ্ঞানগোচরে এনেছে যে তথাকথিত সনাতন সত্যসমূহে আমরা আজ স্বভাবতই বীতশ্রদ্ধ। অতএব কাব্যের কল্পতরু আজকে আর বটের মতো ধরিত্রীর অঙ্কে বদ্ধমূল নয়; সে-গাছ পর্ব্বতজাত রডডেণ্ড্রনের মতো তনুবাত অন্তরীক্ষে উচ্ছ্বসিত; এবং সেইজন্যেই তার দেহ গ্রন্থিল, তার পরিসর খর্ব্ব, তার তলায় ছায়া নেই, ফল নেই তার শাখায়, আছে শুধু একটা অহৈতুক আন্দোলন, আর আছে ফুল, নির্ম্মম, রক্তাক্ত ফুল।

কিন্তু আধুনিক কাব্যের অবশ্যম্ভাবী সঙ্কীর্ণতাকে স্বীকার করলেও, আধুনিক কবির বিরাট আত্মত্যাগ অনিন্দনীয়। আমরা যেন কোনো দিন না ভুলি যে সে যে-দিন তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলো, সে-দিন তার পিছনে বেজেছিলো অনুযাত্র বিশ্বের জয়ধ্বনি, এবং সম্মুখে জেগেছিলো আগন্তুক সিদ্ধির বরাভয়। সে-করতালি ক্রমশ মিলিয়ে এসেছে; ধরা পড়েছে সে-সাফল্য মরীচিকা। তার সহযাত্রীরা পথপার্শ্বের পান্থশালার প্রলোভন জিততে না পেরে তার সঙ্গ ছেড়েছে; তার শিয়রে নেমেছে ধ্রুবতারাহীন অন্ধকার। তবু সে চলেছে, নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ নেয় নি, উপশায়ী বিপদকে ডরায় নি, খেয়াল রাখে নি যে তার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ পদে পদে খ'সে যাচ্ছে। সে রসের আশায় রসালুতার প্রশ্রয় দেয় নি, প্রাণের পরিপূর্ণ লীলা দেখবে ব'লে, নিজের ছাল ছাড়িয়ে ফেলেছে, চরমোৎকর্ষের প্রতিবন্ধক ভেবে টান মেরে উপড়েছে উপত্যকার মমত্বময় শিকড়গুলো। ইতিমধ্যে মণ্ডলাকার প্রগতির পরিক্রমা হয়তো তার শেষ হয়েছে; আর অগ্রগমনের স্থান নেই; এর পরেই হয়তো মৃত্যু। তবুও তার গতিবেগ থামতে চাইছে না; এখনো তার উদামের অন্ত নেই, শ্রান্তি নেই তার চরণে। এই অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের পারিতোষিক-স্বরূপ সে যেন কেবল এইটুকুই বুঝতে চায় যে শূন্যগর্ভ মায়ার মধ্যে তার সৃষ্টি আরো শূন্যময়!

> কনকনে ঠাণ্ডায় হোলো আমাদের যাত্রা
> ভ্রমণটা বিষম দীর্ঘ, সময়টা সব চেয়ে খারাপ,
> রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট,

একেবারে দুর্জ্জয় শীত।
উটগুলোর ঘাড়ে ক্ষত, পায়ে ব্যথা, মেজাজ চড়া,
তারা শুয়ে শুয়ে পড়ে গলা বরফে।
মাঝে মাঝে মন যায় বিগড়ে
যখন মনে পড়ে পাহাড়তলীতে বসন্তমঞ্জিল, তার চাতাল,
আর সরবতের পেয়ালা হাতে রেশমী সাজে যুবতীর দল।
এ-দিকে উট-ওয়ালারা গাল পাড়ে, গন্‌গন্‌ করে রাগে,
ছুটে পালায় মদ আর মেয়ের খোঁজে।
মশাল যায় নিবে, মাথা রাখবার জায়গা জোটে না।
নগরে যাই, সেখানে বৈরিতা, নগরীতে সন্দেহ,
গ্রামগুলো নোংরা, তারা চড়া দাম হাঁকে।
কঠিন মুস্কিলে পড়া গেলো।
শেষকালে ঠাওরালেম চলব সারা রাত,
মাঝে মাঝে নেব ঝিমিয়ে,
আর কানে কানে কেউ গান গেয়ে যাবে—
এ-সমস্তই পাগলামি।

ভোরের দিকে এলেম, যেখানে মিঠে শীত সেই পাহাড়ের খদে,
সেখানে বরফসীমার নীচেটা ভিজে-ভিজে, ঘন গাছ-গাছালির গন্ধ।
নদী চলেছে ছুটে, জলযন্ত্রের চাকা আঁধারকে মারছে চাপড়।
দিগন্তের গায়ে তিনটে গাছ দাঁড়িয়ে,
বুড়ো সাদা ঘোড়াটা মাঠ বেয়ে দৌড় দিয়েছে।
পৌছলেম সরাবখানায়, তার কবাটের মাথায় আঙুরলতা।
ছ'জন মানুষ খোলা দরজার কাছে পাশা খেলছে টাকার লোভে,
পা দিয়ে ঠেলছে শূন্য মদের কুপো।
কোনো খবরই মিল্‌ল না সেখানে,
তাই চল্‌লেম আরো আগে।
যেতে যেতে সন্ধ্যে হলো;
সময় পেরিয়ে যায় যায়, তখন খুঁজে পেলেম জায়গাটা।
বল্‌তে পারো, ব্যাপারটা তৃপ্তি পাবার মতো বটে।

মনে পড়ে, এ-সব ঘটেছে অনেক কাল আগে,
আবার ঘটে যেন এই ইচ্ছে, কিন্তু লিখে রাখো,
এই লিখে রাখো, এত দূরে যে আমাদের টেনে নিয়েছিল
সে কি জন্মের সন্ধানে না মৃত্যুর।

জন্ম একটা হয়েছিল নিশ্চিত,
প্রমাণ পেয়েছি, সন্দেহ নেই।
এর আগে তো জন্মও দেখেছি, মৃত্যুও,
মনে ভাবতেম তারা এক নয়।
কিন্তু এই যে জন্ম এ বড়ো কঠোর,
দারুণ এর যাতনা, মৃত্যুর মতো, আমাদের মৃত্যুর মতোই।
এলেম আমরা ফিরে, আপন আপন দেশে, এই আমাদের রাজত্বগুলোয়।
কিন্তু আর স্বস্তি নেই সেই পুরানো বিধানের মধ্যে
যেখানে আছে সব অনাত্মীয় তাদের দেব-দেবী আঁকড়ে ধ'রে।
আর-একবার মরতে পারলে আমি বাঁচি।

[টি-এস্ এলিয়ট্-এর ইংরেজী কবিতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ]

ধ্রুপদ-খেয়াল

কবি-পাঠকের সম্বন্ধই সাহিত্যের সনাতন সমস্যা। কাব্যবিবেচনার জন্মদিন থেকে প্রত্যেক সমালোচক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে-প্রশ্নের জবাব দিতে চেয়েছেন, তা এই: লেখক অধোগতির ধাপে নেমে পাঠকের পাশে দাঁড়াবে, না পাঠক সিঁড়ি বেয়ে লেখকের স্তরে উঠবে? কিন্তু জিজ্ঞাসা এক হলেও, ভিন্ন যুগের উত্তর ভিন্ন রুচির পরিচায়ক; এবং এই বৈচিত্র্য স্বাভাবিক। কারণ সামাজিক জীবনের প্রতিনিধি হিসাবেই পাঠক কবির কাছে মর্য্যাদা পায়; এবং জীবন যেহেতু পরিবর্ত্তনশীল, তাই সাহিত্যের অবস্থান্তর অবশ্যম্ভাবী। প্লেটো তাঁর আদর্শ গণতন্ত্র থেকে কবিদের নির্ব্বাসনে পাঠালে, আরিস্টটল্ কাব্যকে জীবনের দর্পণ ব'লে আবার তাদের সমাজে ডেকে এনেছিলেন; এবং আজ আর সেই প্রাচীন আদর্শে সাহিত্যিকের নিষ্ঠা নেই বটে, কিন্তু সংসাহিত্যমাত্রেই যখন সুবিধামতো জীবন্ত-আখ্যা চেয়ে বসে, তখন সাহিত্যের সম্পূর্ণ জীবন্মুক্তি নিতান্ত অসম্ভব। তবে বর্ত্তমান সাহিত্যসেবী পাকে-প্রকারে জীবনের বশ্যতা মেনে নিলেও, সাধারণ পাঠক তাঁর অবজ্ঞার পাত্র; এবং সে-অবজ্ঞার অনেকটাই যদিও প্রাপ্য, তবু পাঠকের পক্ষেও কিছু বলবার আছে, কাব্যের বহ্বারম্ভ লঘু ক্রিয়া দেখে তার বঞ্চনাবোধও একেবারে গর্হিত নয়।

এখানে এই কথাটাই স্মরণীয় যে কাব্য অতিমর্ত্ত্যের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলো। কি পূর্ব্বে কি পশ্চিমে বাক্য ঐশিক ও সর্ব্বশক্তিময়—তার থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি; এবং তার প্রাক্তন রূপ ছন্দে। অবশ্য এই অলৌকিকতা চিরদিন টিঁকে নি। পুরোহিতের প্রাধান্য খর্ব্ব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র আর কাব্য একান্নবর্ত্তী পরিবারের মায়া কাটিয়ে আলাদা সংসার পাতলে; এবং তখন থেকে কাব্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার বদ অভ্যাসটা চুকলো বটে, কিন্তু কবিকে ভগবানের প্রিয়পাত্র ব'লে ভাবার ধরণটা ঘুচলো না। মানুষের জ্ঞাত ইতিহাসে ধর্ম্মের প্রভাব যতখানি দুর্ম্মরতা দেখিয়েছে, তা অন্যত্র বিরল; এবং সম্ভবত অত দিন ধ'রে সেই ধর্ম্মের একান্ত অনুগ্রহ পেয়েই কাব্যের আত্মগরিমা কালে প্রায় অসীমে পৌঁছলো; সে স্বভাবতই ভজালে যে পরিশীলনের অন্যান্য বিভাগ তার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। কবিরা ঢাক পিটিয়ে, রটিয়ে দিলেন যে তাঁরা শুধু শিল্পী নন, তাঁরা ভাবিকথক; কেবল

অনুকরণেই তাঁদের মন ওঠে না, তাঁরাই বিশ্ববিধাতাকে সৃষ্টির প্রতিমান জোগান।

সৌভাগ্যবশত তাঁদের ফাঁকি তৎক্ষণাৎ ধরা পড়লো না। সভ্যতার তখন বয়ঃসন্ধি, জীবন সঙ্কীর্ণ, বিজ্ঞান তখনো অপ্রস্তুত। সুতরাং তখনকার পাঠককে সহজেই মায়াকাজল পরানো গেলো। ঐন্দ্রজালিক ছন্দের বশীকরণে সে যে-জাগ্রত স্বপ্নাবস্থায় ডুবলো, তাতে কবিদের অপলাপকে আর্য্যসত্য ব'লে মানা ছাড়া তার গত্যন্তর রইলো না। সম্মোহনের দ্যোতনা-ব্যঞ্জনায় সে ভাবলে তাঁদের অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া বুঝি অদৃশ্যভেদের চেয়েও বিস্ময়কর। কিন্তু মিথ্যার রাজ্যও অবিনশ্বর নয়। ক্রমে সপ্তদশ শতাব্দীর উদয় হলো; গালিলিও-র মন্ত্রণায় বিজ্ঞান ইতিপূর্ব্বেই যে-অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়েছিলো, সারা পৃথিবীর শ্রদ্ধাঞ্জলি কুড়িয়ে সে ফিরে এলো ন্যুটন্-এর জয়-তোরণে; এবং স্বপ্নবিহ্বল কাব্য অচিরে বুঝলে যে প্রবর্দ্ধমান জীবন সত্যই তার শিথিল কবল থেকে পালিয়েছে, তার মুষ্টিতে যা বাকী আছে, তা কেবল জীবনের শৈশবসজ্জার ছিন্ন প্রান্ত। অভিমানে সে পণ করলে যে নিজের নাক কাটতেও তার আপত্তি নেই, কিন্তু পরের যাত্রা সে ভাঙবেই ভাঙবে। গালি-গালাজের বন্যা বইয়ে বাজারে বাজারে সে ঢ্যাঁট্‌রা পিটলে যে জীবনের মতো দুর্বৃত্ত হট্টচারীর সংসর্গ আর তার সইছে না, ভবিষ্যতে সে শুধু শিষ্টতার সঙ্গেই সম্পর্ক রাখবে; মানুষের মধ্যে যা ধ্রুব, যা সম্ভ্রান্ত, যা সুন্দর, কেবল সেই সমস্তই পাবে তার পূজা।

সে-দিনে যে-আত্মহত্যার পালা সুরু হয়েছিলো, আজও তার শেষ দেখা যাচ্ছে না। মধ্যে একবার ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্‌ কাব্যকে গদ্যাত্মক করার ব্যর্থ প্রয়াসে কবির পরে যুগচৈতন্যের ভার চাপাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রীরাফেলাইট্‌দের স্বপ্নপ্রয়াণে ব্যাপারটা আবার যাত্রাস্থলেই ফিরলো; এবং তার পরে যখন আধুনিক কবিদের আমল এলো, তখন ধরা পড়লো যে অন্ধকূপের দরজা ভেজিয়েই তারা থামে নি, সেই দরজায় কে আবার পাথর গেঁথে দিয়েছে। তৎসত্বেও আজ-কালকার বন্দীরা মাঝে মাঝে পথের আওয়াজ শোনে বটে, কিন্তু অর্থ বোঝার সামর্থ্য আর তাদের নেই; বংশপরম্পরায় অন্ধকারে কাটিয়ে আলোকের অস্তিত্ব সুদ্ধ তারা ভুলে গেছে; মিথ্যাভিমানের উত্তরাধিকারে জন্মে স্বাধীন সত্যকে অন্ত্যজ ব'লে ভাবাই তাদের স্বার্থ। সেইজন্যে আজ তারা নিজেদের মধ্যে কথা কয় ব্যাসকূটের সাহায্যে, জিজ্ঞাসুর সাড়া পেলেই জপে "বিশুদ্ধ" কাব্যের নাম, পাছে তাদের কবিতা সাধারণের ভোগে আসে—এই তাদের একমাত্র ভয়। সেইজন্যেই আজ তারা কেবল ছন্দোমুক্তিতে সন্তুষ্ট নয়, ব্যাকরণশুদ্ধিও তাদের কাছে দূষণীয়

ঠেকে। অজ্ঞাতকুলশীল পূর্ব্ববর্ত্তীদের রচনা-উদ্ধার, বিনা প্রয়োজনে বিদেশী শব্দকোষের ঋণস্বীকার, ছেদবর্জ্জন ইত্যাদি সমস্ত উপচারই সাম্প্রতিক কাব্যের দুরূহতাপ্রীতির পরিচায়ক।

এমনকি এতেও অনেকের পরিতৃপ্তি মেলে না। তাঁদের প্রধান প্রতিনিধি ই-ই কামিংস্-এর মতে ঐতিহ্য তো উপহাস্য বটেই, উপরন্তু মুদ্রাকার্য্যের চিরন্তন প্রথাকেও তাঁর অসহ্য লাগে; এবং প্রচলিত রীতিতে ছাপলে, নিম্নলিখিত কবিতাটি পাঠকের মাথায় ঢুকলেও বা ঢুকতে পারে, এই ভেবে তিনি তাকে এ-ভাবে সাজিয়েছেন :

Among
these
red pieces of
day (against which and
quite silently hills
made of blueandgreen paper
scorchbend ingthem
-selves-U
pcurv E, into :
anguish (clim
b)ing
s-p-i-r-a-
l
and, disappear)
Satanic and blasé
a black goat lookingly wanders
There is nothing left of the world but
into this noth
ing il treno per
Roma si-gnori ?
Jerk.
ilyr. ushes

এটা যে কোনো অতিশ্রান্ত মুদ্রাকরের দুঃস্বপ্ন নয়, একটা সহজ ও সুন্দর কবিতা, তা বিভীষিকাটাকে গদ্যের মামুলী সাজ পরালেও, ধরা পড়বে :

Among these red pieces of day—against which, and quite silently, hills made of blue and green paper, scorch-bending themselves, upcurve into anguish, climbing spiral, and disappear—satanic and blasé, a black goat lookingly wanders. There is nothing left of the world, but into this nothing 'il treno per Roma, signori?' jerkily rushes.

এমন সুখপাঠ্য কবিতা-সম্বন্ধে ও-ধরণের পাগলামির কৈফিয়ৎ চাইলেই, সম্প্রতিবেত্তারা সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন যে ওটাতে আসলে নূতনত্বের কোনো দাবিই নেই, বরং গ্রীস্-প্রবর্ত্তিত কাব্যাদর্শের হুবহু নকল আছে। ছোট-বড় অক্ষরের ওই অদ্ভুত সমাবেশ, কমা-সেমিকোলনের ওই ভয়াবহ স্বেচ্ছাচার, শব্দ-বিভাগের ওই উদ্‌ভট প্রকরণ, ও-সমস্তই নাকি পার্ব্বত্য রেলগাড়ির লম্ফ-ঝম্পের যথাযথ অনুবাদ। এতেও যে-অন্ধেরা উক্ত কবিতায় কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার আক্ষরিক প্রতিমূর্ত্তি দেখতে পায় না, তাদের জন্যে তাঁরা গাল-ভরা নজির আওড়ান। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে যত মহারথীর নামই উল্লিখিত হোক না কেন, তবু এটা নিশ্চয় যে সনেট্‌বিশেষে শেক্স্‌পীয়র-এর ছেদ-ব্যবস্থা অন্যমনস্কতাসূচক ব'লেই, সে-দৃষ্টান্ত অনুসরণীয় নয়, এবং কামিংস্-এর বিরামচিহ্নের রীতিবিরুদ্ধতা সত্ত্বেও উদ্ধৃত কবিতা ক্ষণভঙ্গুর। বস্তুত কামিংস্-প্রমুখ আধুনিকেরা শেক্স্‌পীয়র অথবা অন্য কোনো পূর্ব্বগামীর অনুকরণে বদ্ধপরিকর নন; তাঁরা ব্যস্ত তাঁদের স্বকীয়তাপ্রমাণে; এবং ধ্রুপদী ঢং বর্ত্তমান কাব্যের ছদ্মবেশমাত্র, তার তন্মাত্র স্বকীয়তা, উদুগ্র, আত্মজ্ঞ স্বকীয়তা।

এই স্বকীয়তাই আধুনিক অনর্থের মুল; এবং উক্ত মায়ামৃগের অনুধাবন-কালে আমরা কেবলই ভুলে যাই যে সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য লেখকের অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধে পাঠকচৈতন্যের উদ্বোধন। বস্তুত শেক্স্‌পীয়র-এর মতো মহাকবি অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বভাব চিনতেন না, অথবা সাধারণ ছেদপদ্ধতি তাঁর অবিদিত ছিলো, এমন বিশ্বাস আদৌ সঙ্গত নয়। তিনি জানতেন যে ছন্দকে আপাদমস্তক নিয়মের নিগড়ে ঘিরে রাখলে, যথাসময়ে শ্রোতার সাড়া পাওয়া দুষ্কর। তাই হয়তো তাঁর পরমোক্তিগুলোয় অঙ্কের বালাই নেই, অমিত্রাক্ষরের কাঠামোতেও মিলের প্রাচুর্য্য বর্ত্তমান, হঠাৎ হঠাৎ গদ্য আর পদ্য অভিন্নহৃদয়। তাই হয়তো তিনি আলঙ্কারিকের উদ্যত তর্জ্জনীকে ঠেলে ফেলে, উপমাসঙ্করের চূড়ান্তে পৌঁছে বিপদসমুদ্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সঙ্কল্প করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটাও বুঝতেন যে অত্যন্ত স্বকীয়তা নিজের কলে প'ড়ে নিজেই মরে। তিনি দেখেছিলেন যে ঈর্ষ্যা-সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য নূতন নয়; এবং সেইজন্যে সেই সর্ব্ববাদিসম্মত মনোভাবকে তিনি রূপ দিয়েছিলেন ওথেলো আর ইয়াগো-র মতো অসাধারণ চরিত্রদ্বয়ে। কিন্তু হ্যাম্লেট্-এর ট্র্যাজেডি একেবারে অভিনব। ফলত সে-নাটকের আখ্যানভাগ তিনি সমসাময়িক গল্পভাণ্ডার থেকে ধার নিয়েছিলেন।

অথচ এ-তথ্য বর্নার্ড্ শ হৃদয়ঙ্গম করেন নি। অতএব অত দীপ্তি, অত মৌলিকতা, অত শিল্পকৌশল সত্ত্বেও "ম্যান্ এণ্ড্ স্যুপর্ম্যান্" পড়তে পড়তে

ঘুম আসে। কিন্তু বিশিষ্টতার স্থমিত প্রয়োগে ডিফো আর স্থইফ্ট্ শেক্স্‌পীয়র-এর অনুগামী। "রবিন্সন্ ক্রুসো"-র আখ্যায়িকা এমনি অদ্ভুত, এত বাহুল্যময় যে ডিফো-র বোধ হয়েছিলো তার উপরে আর অতিরঞ্জনের বোঝা সইবে না ; এবং তাই তিনি সে-কাহিনী লিখেছিলেন আড়ম্বর এড়িয়ে, বৈচিত্র্য বাঁচিয়ে, প্রাঞ্জলতায় বিজ্ঞানের কোল ঘেঁষে। পক্ষান্তরে গালিভর-এর উপলক্ষ আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক সমাজ। স্থতরাং বামন-দৈত্যের দেশ-বিদেশ না ঘুরে সে-উপাখ্যান গন্তব্যে পৌছতে পারে নি। এ-ধরণের শেষ কবি সম্ভবত ব্রাউনিং। কে জানে, হয়তো নিজের কাব্যের অন্তম দৈন্য তাঁর অগোচর ছিলো না ব'লেই, তিনি তাকে আগা-গোড়াই অসামান্যতায় সাজিয়েছিলেন।

অশেষ স্বকীয়তার সামনে, অফুরন্ত বৈচিত্র্যের মাঝখানে মানবচৈতন্য কেন এমন পঙ্গু, তার কারণ আজ অবধি ধরা যায় নি। এমনকি এখনো স্থির সিদ্ধান্তের উপযোগী তথ্যসংগ্রহেও আমরা অপারগ। তবে নানা দিকে চেষ্টার বিরাম নেই ; এবং অনুমিতির সংখ্যা বাড়ছে বই কমছে না। সেগুলোর মধ্যে আমার পক্ষপাত পাভ্‌লোভ্-প্রমুখ জড়বাদীদের প্রতি। কেননা জগৎ-সম্বন্ধে আজ আমরা যতটুকু আলো পেয়েছি, তাতে মনে হয় জড়তাই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূল কথা। অণু থেকে নীহারিকাপুঞ্জ পর্য্যন্ত সকলেই শান্তিপ্রিয় ; কেউ কাজের নেশায় কাজ করে না, শুধু শান্তির মধ্যে যত ক্ষণ বিঘ্ন থাকে, তত ক্ষণই সংক্ষিপ্ততম পথে সেই বিঘ্নজয়ের ব্যবস্থা চলে ; এবং বিপদ কাটার সঙ্গে সঙ্গে আয়াসেও পড়ে পূর্ণচ্ছেদ। এখানে সমস্ত জোর ওই সংক্ষিপ্ততম পথের উপরে। অর্থাৎ বস্তুমাত্রেই প্রযত্নের পরিমাণকে আবশ্যিকতার অতিসঙ্কীর্ণ কোঠায় আবদ্ধ রাখতে চায়, এবং যেমন সাধারণত অভ্যস্ত অভ্যাঘাতে চোখ খোলে না, তেমনি সাধ্যপক্ষে অজানার অভিসারে পা বাড়ায় না। স্থতরাং নূতন-পুরাতনের স্থচিন্তিত বিকল্পই মনোযোগ-আকর্ষণের শ্রেষ্ঠ উপায়।

বুঝি বা সেইজন্যেই ভালেরি-র বিশ্বাস যে আধুনিক জগতে সৌন্দর্য্য-সন্দর্শন অসম্ভব ; এবং কথাগুলো গোড়ায় দুর্ব্বোধ্য ঠেকলেও, একটু ভাবলেই, ধরা পড়ে যে অভিমতটা ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্-এর বিখ্যাত উক্তিরই প্রতিধ্বনি। অর্থাৎ সংঘর্ষের প্রথম প্রতিক্রিয়া শব্দ ; সেই শব্দকে শ্রুতিমধুর করতে হলে, বেশ খানিকটা স'রে যাওয়া দরকার ; এবং রেল্‌গাড়ির স্থদূরপরাহত বজ্র-নির্ঘোষেও যে স্বরসঙ্গতির অভাব ঘটে না, এ-সিদ্ধান্তে আমরা অনেকেই পৌছেছি। কিন্তু শ্রীমতী ঈডিথ্ সিট্‌ওয়েল্-এর উপরে স্বকীয়তার প্রভাব এত প্রবল যে তিনি জ্ঞানত লোকপ্রসিদ্ধির সার্থকতা মানতে চান না ; এবং

যেহেতু প্রবাদমাত্রেই অন্ধ কুসংস্কারের নিদর্শন নয়, অধিকাংশ প্রবচনই বৈজ্ঞানিক নিয়মের আজ্ঞাবাহী, তাই তাঁর ভূচর কবিতাবলীর ভিতরে উৎকর্ণ পাঠক শুধু সেই রচনার সান্নিধ্যই সইতে পারে, যার প্রবর্তনায় বর্তমানের যন্ত্রঝঞ্ঝনা নেই, আছে অতীতের মন্ত্রমূর্চ্ছনা।

দুঃখের বিষয়, বিগত জীবনের বাসী খাদ্য সাম্প্রতিক কাব্যলক্ষ্মীর পক্ষে দুষ্পাচ্য ; এবং রোগস্বীকার পাশ্চাত্ত্য লোকাচারে বাধে। সুতরাং সিট্‌ওয়েলী মনীষার গুণগ্রাহীরা কখনো অজীর্ণের নাম মুখে আনেন না, অম্লান বদনে রটান যে তাঁর চিৎপ্রকর্ষ বিশ্বব্যাপী ব'লেই, বাল্যস্মৃতির অপরিসর গণ্ডি তাঁকে ঘিরে রাখে নি। কিন্তু সঙ্কীর্ণতার কোনো স্বভাবগত দোষ নেই, অণিমা বরং ঐশী বিভূতির অন্যতম ; এবং আয়তনসংক্ষেপে উপাদান তো সহজে আয়ত্তে আসেই, এমনকি কলাবিচারের প্রধান মানদণ্ড যখন সম্পূর্ণতা, তখন কাব্যের ভূগোলেও চৈনিক অরাজকতার দুঃশাসন দিকপালেরা ততটা ভক্তিভাজন নয়, যতটা শ্রদ্ধাস্পদ সূচ্যগ্র জাপানের চিরাচারী অধিপতি।

চার পাশে অসংখ্য দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও, এই আর্য্যসত্যের প্রতি, কী জানি কেন, শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্‌-এর আস্থা নেই। তাঁর প্রকৃতি যদিও পশ্চান্মুখী, তবু তাঁর প্রতিভা অহঙ্কৃত ও আতিশয্যময় ; এবং সেইজন্যে কূপমণ্ডূকের নির্ব্বিরোধে তাঁর মন সরে না, আপন উৎকর্ষপ্রতিপাদনের চেষ্টায় তিনি বারম্বার পাড়ের প্রচণ্ড প্রতিযোগে লাফিয়ে উঠে, পক্ষপাতীকেও চোখে আঙুল দিয়ে দেখান যে তাঁকে বর্তমান ইংরেজী কাব্যের মুখপাত্রী ভাবা ভুল, তাঁর কবিতা আসলে দিশাহারা উল্লম্ফনে পরিপূর্ণ। এই উল্লম্ফন যে বিশিষ্ট ও বিচিত্র, তাতে তিলার্দ্ধ সন্দেহ নেই ; এই ভঙ্গির অন্তর্নিহিত চালনীশক্তিও প্রশংসনীয়। কিন্তু নীচের রচনা যে কাব্য নয়, তাও নিতান্ত নিশ্চিত :

When
Don
Pasquito arrived at the seaside
Where the donkey's hide tide brayed, he
Saw the banditto Jo in a black cape
Whose slack shape waved liked the sea—
Thetis wrote a treatise noting wheat is silver like the sea ; the lovely cheat is sweet as foam; Erotis notices that she
Will
Steal
The
Wheat-King's luggage, like Babel
Before the League of Nations grew—

So Jo put the luggage and the label
In the pocket of Flo the kangaroo.

অবশ্য এ-লাইন-কটা একেবারে নিরর্থ নয়। এমনকি আমি এত দূর পর্য্যন্ত মানতে প্রস্তুত যে পংক্তিগুলোর অসঙ্গতি ও ছন্দস্বাচ্ছন্দ্যের কল্যাণে য়ুরোপীয় প্রমোদকেন্দ্রগুলির যে-অতিরঞ্জিত ব্যঙ্গচিত্র ফুটে উঠেছে, তাতে মিথ্যার চেয়ে সত্যের অংশই বেশি। কিন্তু পশ্চিম দেশের উৎসবমুখর সামুদ্রিক শহরের উদ্‌ব্যস্ত উদ্‌ভ্রান্তি যে অন্য কোনো উপায়ে বর্ণনীয় নয়, এমন দাবি আমার কাছে অগ্রাহ্য ঠেকে; এবং প্রকাশপদ্ধতিতে প্রকারান্তরের অবকাশ রাখলে, লেখকের ন্যায়বুদ্ধিতে যদিও সংশয় ঘোচে, তবু তার রূপনৈপুণ্যে নিষ্ঠা জাগে না। উপরন্তু যখন একটু আগেই পড়ি:

Said Il Magnifico
Pulling a fico—
With a stoccado
And a gambado,
Making a wry
Face: "This corraceous
Round orchidaceous
Laceous porraceous
Fruit is a lie!
It is my friend King Pharaoh's head
That nodding blew out of the Pyramid..."

তখন সিদ্ধান্ত ক্রমশই দৃঢ় হয় যে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্‌-এর ছন্দ তাঁর হৃদয়াবেগের প্রতিবিম্ব নয়, তাঁর হৃদয়াবেগ এই ছন্দকৌশলের প্রতিধ্বনি। অর্থাৎ প্রসঙ্গটি তাঁর রচনার উপলক্ষ মাত্র, শ্রীমতীর কলম আসলে উধাও আত্মশ্লাঘার তাড়নে; এবং এতাদৃশ মনোভাব লেখকের ঐকান্তিক বৈশিষ্ট্য ফোটাতে পারলেও, তার নির্দ্দেশ স্বভাবতই রূপসৃষ্টির প্রতিকূল। কারণ রূপ রসিকমাত্রের মনেই লুকিয়ে থাকে; কবির কাজ অহমিকা ছেড়ে পাঠকের কল্পনায় সেই নিহিত রূপের উদ্বোধন।

এইখানে বলা ভালো যে আমি যে-পাঠকের কথা বলছি, কাব্যের সঙ্গে সে নাড়ির যোগে বাঁধা, রচনার দুরূহতা তার কাছে বাধা নয়, বরং কঠিন কথার ধাক্কায় তার দরদী কল্পনার জড়তা একেবারে কেটে যায়। কিন্তু পাঠক যতই অনুকম্পায়ী হোক, কবি যদি নিজেকে ছুৎমার্গের আড়ালে রাখেন, তবে তাঁর নাগাল পাওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ অন্তে অমরাবতীর সন্ধান মিললে, পাঠক পর্ব্বতলঙ্ঘনেও কাতর নয়; কিন্তু রামধনুকের গোড়া খুঁজতে পৃথিবীপরিক্রমা তার মতে পণ্ডশ্রম। এমন কবি আজকের দিনে বিরল নয়,

যাদের লেখা সিট্‌ওয়েলী কবিতার চেয়ে লক্ষগুণ শক্ত। ভালেরি অথবা এলিয়ট্‌-এর মর্ম্মগ্রহণ যত বিদ্যা-ব্যুৎপত্তির অপেক্ষা রাখে, তার উপযুক্ত সময় হয়তো অনেকের হাতেই নেই। কিন্তু তাঁদের নিমন্ত্রণ এতই উদার, তাঁদের অন্বেষণ এতই সার্ব্বিক যে 'ল সের্পা'-র কিম্বা 'দি ওয়েস্ট্‌ ল্যাণ্ড্‌'-এর সর্ব্ববাদি-সম্মত দুর্ব্বোধ্যতা ভাবী পাঠককে ভাবিয়ে তোলে না, সে দেখে বুদ্ধির অনুমতি পাবার বহু পূর্ব্বেই তার মুগ্ধ চৈতন্য কবিতা-দুটির মহত্ত্ব নিঃসঙ্কোচে মেনে নিয়েছে।

সে-দু জনের পাশে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্‌ জলবৎ সরল; ভাবের মারপ্যাঁচ নেই, ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, চিত্রকল্প অসাধারণ রকমের প্রাণবন্ত। কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও উদ্ধৃত লাইন-কটার দুরূহতা দুর্জ্ঞেয়:

Roads whose dust seems gilded binding
Made for "Paul et Virginie"
(So flimsy-tough those roads are) see
The panniered donkey pass......

দশ-বিশখানা বিশ্বকোষ উল্‌টে পরিশ্রমী পাঠক যখন আবিষ্কার করে যে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্‌-এর বালিকাবয়সে "পল্‌ এ ভির্জিনি"-নামে একটা ভাববিলাসী শিশুপাঠ্য প্রেমকাহিনী খুব মর্য্যাদা পেতো, তখনও কাব্যোল্লিখিত রাস্তার সঙ্গে উক্ত পুস্তকের মলাট যে কেন তুলনীয়, তা সে বোঝে না; এবং আরো কিছু কাল গভীর গবেষণার পরে হয়তো এটুকুও তার মাথায় ঢোকে যে সকল মামুলী ফরাসী পুঁথির মতো ও-বইখানার কাগজ যদিও সস্তা ও ক্ষণভঙ্গুর ছিলো, তবু ওটার অবিনশ্বর বাঁধাইএ ব্যয়সঙ্কোচের কোনো চেষ্টা দেখা যায় নি, তখনও পাঠকের মনে সমবেদনা জাগে না। তবে এত ক্ষণে সে হয়তো নিষ্কুণ্ঠ চিত্তে মেনে নেয় যে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্‌-এর লেখা শূন্য কলসীর সমান, তার ভিতরে কিছু নেই ব'লেই বাইরে অত আওয়াজ।

এ-মতটি অবশ্য অতিশয়োক্তির কোলঘেঁষা। শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্‌-এর কবিতার সঙ্গে পরিচয় বাড়লে, সকলের কাছেই এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য্য ঠেকবে যে তাঁর দৃষ্টি প্রখর। কিন্তু নীচের কবিতাটি লেখার ক্ষমতা যাঁর আছে—

Across the thick and the pastel snow
Two people go... "And do you remember
When last we wandered this shore?"... "Ah no!
For it is cold-hearted December."
"Dead the leaves that like asses' ears hung on the trees
When last we wandered and squandered joy here;

Now Midas your husband will listen for these
Whispers—these tears for joy's bier."
And as they walk, they seem tall pagodas;
And all the ropes let down from the cloud
Ring the hard cold bell-buds upon the trees—codas
Of overtones, ecstacies, grown for love's shroud.

তিনি নূতনত্বের লোভ সামলাতে না পেরে কেন যে এ-রকম পদরচনায় শক্তি খোয়ান, তা তাঁর ভাগ্যবিধাতাই জানেন :

That hobnailed goblin, the bobtailed Hob,
Said, "It is time I began to rob."
For strawberries bob, hob-nob with the pearls
Of cream (like the curls of the dairy girls),
And flushed with the heat and fruitish ripe
Are the gowns of the maids who dance to the pipe.
Chase a maid?
She is afraid!
"Go gather a bob-cherry kiss from a tree,
But don't I prithee, come bothering me!"
She said—
As she fled.

উল্লিখিত পদ্যের সাহায্যে শ্রীমতী সিটওয়েল্ যদি তাঁর স্বাতন্ত্র্যপ্রমাণ করতে চান, তাহলে না ব'লে উপায় নেই যে আধুনিক কাব্য-সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অতিশয় অল্প। য়ুরোপ ও অ্যামেরিকায় আজকের দিনে অন্তত দশ-বারো জন এমন কবি আছেন যাঁরা ছন্দের তীক্ষ্ণতায় ও উপমার অভিনবত্বে শ্রীমতী সিটওয়েল্-এর জ্যেষ্ঠ না হলেও, তাঁর সমকক্ষ। ককতো, জ্যুল্ স্যুপের্ভিল্, মারিয়ান্ মূর ইত্যাদি সকলেই এই দলের। কিন্তু এঁদের না ধরলেও, শ্রীমতী সিটওয়েল্-এর বিশিষ্টতা আজ আর বিশিষ্ট নয়; অন্য কারো পদাঙ্কে না চললেও, তিনি এখন নিজের অনুকরণে ব্যস্ত। প্রথমে যে-দিন "মরালপৃষ্ঠ" দীঘির কথা পড়েছিলুম, সে-দিন বিশেষণটাকে শুধু নূতন নয়, জাজ্জ্বল্যমানও লেগেছিলো। কিন্তু যখন আগুনমাত্রেই রোমশ, গাছ-পালা, ঘর-বাড়ি, রৌদ্র-বৃষ্টি সকলেই এক জোটে পেরুপাখীর সঙ্গে উপমেয়, তুষার প্রবালশীতল আর ঘাস-পাতা ধাতুনির্ম্মিত, তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর feathered race-কেও অভিনব ঠেকে, তখন বাংলা কবিতার বংশীমুগ্ধ চন্দ্রাবলীর কদমতলা দিয়ে জল আনাও ফিরে ফিরতি মন মজায়।

কারণ বিধিবদ্ধ মৌলিকতা আর প্রথাসিদ্ধ ভাবালুতা, এ-দুইই এক আগাছার গোড়া আর চূড়া; উভয়েই সমান বর্জ্জনীয়; এবং যেখানে

উভয়ের মধ্যে না বাছলেই নয়, সেখানে শেষটার নির্ব্বাচনই বাঞ্ছনীয়; তাতে বয়সের গুণে হয়তো কিছু ভাবানুষঙ্গ জমেছে। অর্থাৎ যুগ-যুগান্তের সংস্কারে চন্দ্রাবলীর নাম আমাদের বুদ্ধিকে না টলালেও, অনুবোধকে বেশ একটু নাড়া দেয়; এবং এই উত্তেজনার ধাক্কা কল্পনার পথে শ্রোতার প্রাণ ছোঁয় না বটে, কিন্তু অভ্যাসের সুড়ঙ্গ বেয়ে তার স্নায়ুমণ্ডলে যায়, আসে। অবশ্য এ-কথা আমিও বুঝি যে সময়বিশেষে, কোনো নাতিসামান্য আবেগের খাতিরে সূর্য্যের পরে "কাফ্রি-কালা"-উপাধির আরোপ শুধু সঙ্গত নয়, সার্থক। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র-নির্ব্বিচারে সূর্য্য যদি ওই পোষাকী কালো কোর্ত্তা ছেড়ে লোকসমক্ষে না বেরোন, তবে অতি বড় ব্রাত্য পাঠকও অগত্যা মানবে যে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্ অপরিহার্য্য বাক্যের খোঁজে ও-উৎপ্রেক্ষায় পৌঁছন নি, ওটাকে অবশ্যম্ভাবী ভেবেছেন আত্মবিজ্ঞাপনের গরজে। কোনো কবির সম্বন্ধে এর চেয়ে মারাত্মক নিন্দা আমার জানা নেই।

শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্-এর উদ্‌ভটতার আসল ব্যাখ্যা ওইটাই; তাঁর লেখার ভঙ্গি নৈর্ব্যক্তিক হলেও, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই তাঁর কাব্যের প্রাণ। অর্থাৎ জগৎ-সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য শুধু মৌখিক; বস্তুত তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের নেশায় এতই বিভোর যে দিঙ্‌মণ্ডলে তাকাবার প্রবৃত্তি বা অবসর, কোনোটাই তাঁর নেই। ফলে তাঁর রচনার মধ্যে একটা স্বপ্নসুলভ অসামঞ্জস্য এসে জোটে, যার হেতু জানতে চাইলে, মনস্তাত্ত্বিক নেবেন আশাভঙ্গের নাম। আমার বিশ্বাস যে শৈশব সুখস্মৃতির সঙ্গে যৌবনের বঞ্চনাব্যথার সংঘাতেই শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্-এর অধিকাংশ কবিতার উৎপত্তি। তাঁর চাকচক্য এই নিষ্ঠুর সংঘর্ষের পরিণাম; এবং কবির পক্ষে অশ্রুমোচন যদি আধুনিকদের কাছে এমন হাস্যকর না ঠেকতো, তবে আমরা হয়তো শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্-কে গ্রাম্য প্রহসনের খোঁজে গোষ্ঠে গোষ্ঠে ঘুরে বেড়াতে দেখতুম না, তাঁর সাক্ষাৎ পেতুম কৈশোরের প্রতিধ্বনিমুখর, শিশিরসিক্ত তেপান্তরের মাঠে, যার গণ্ডি পেরোতে তাঁর ধাত্রীদ্বয় তাঁকে বার বার মানা করেছিলো—

> Our nurses called to us, their faces lovely
> As that dove-soft hour we call good night;
> Africa and Asia spoke, "Oh never
> Must you wander far into the forests,
> Lest you should learn life from the dwarfish dust,
> Or, like Cassandra, your deep lips should learn
> The speech of birds and serpents in that glade
> Where we have spoken with the ultimate Darkness,—
> Or know the secrets that in earth are laid—

The buried jewels whose hearts may never soften
Into sweet flowers to bloom in the spring forests.
For there is one dark forest—one whose name
You know not, haunted by a darker shade,"
Yet as they spoke, the old worlds died like dew—
Life was so beautiful that shadow meant
Not death, but only peace, a lovely lulling.

বলাই বাহুল্য যে অন্যান্য দুরন্ত ছেলে-মেয়ের মতো শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্‌-ও তাঁর অভিভাবিকার সদুপদেশ মনে রাখেন নি ; এবং বোধহয় সেজন্যে তিনি আজ ভিতরে ভিতরে পস্তাচ্ছেন। কিন্তু তিনি যেহেতু অভিমানিনী, তাই তাঁর বুক-ফাটা কান্না কাষ্ঠহাসির তলায় প্রচ্ছন্ন ; এবং এই অসাধু উপায়ে আর্ত্তনাদ ঢাকা গেলেও, যেকালে কৃত্রিমতা লুকনো যায় না, তখন তাঁর অবিশ্রান্ত বৈহাসিকতা আমাদের কানে তিক্ত শোনাতে বাধ্য, তখন সে-অব্যক্ত ট্র্যাজেডি ধরতে না পেরে আমরা শুধোতে বাধ্য 'ফাসাড্'-এর উদ্দাম হাসির ফাটলে ফাটলে অত উচ্চণ্ড ভ্রূকুক্তির আভাস কেন। অর্থাৎ শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্‌-এর অতীত জীবন-সম্বন্ধে সাধারণ পাঠক স্বভাবতই উদাসীন ব'লে, 'গোল্ড্ কোস্ট্ কাস্টাম্‌স্'-এর দরুণ ভৎর্সনায় সে প্রায়ই অবিচলিত থাকে, এবং বিধর্ম্মীরা বলার সুবিধা পায় যে এ-রকম স্বপ্রধান সাহিত্য শেষ পর্য্যন্ত নশ্বর ও নিষ্ফল। কারণ আমার নিজের বাড়ির পরিচারিকাকে নিয়ে কবিতা লিখলে, চক্‌চকে, তক্‌তকে চিত্রাঙ্কনে হয়তো পাঠককে তাক লাগিয়ে দেওয়া সম্ভব ; কিন্তু তার অন্তরতম লোকে প্রবেশপ্রার্থনা করলে, আমার কাব্যের পিছনে সমগ্র পরিচারিকা-জাতির অব্যক্ত সমর্থন অত্যাবশ্যক। এ-কথায় যাঁদের আস্থা নেই, তাঁদের পক্ষে উদ্ধৃত কবিতা-দুটি তুলনীয়। প্রথমটি শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্‌-প্রণীত 'ব্যুকলিক্ কমেডিস্'-এর 'ওবাড্'-শীর্ষক তিন-নম্বর কবিতা, দ্বিতীয়টি এলিয়ট্‌-এর রচনা :

Jane, Jane,
Tall as a crane,
The morning light creaks down again
Comb your cockscomb-ragged hair,
Jane, Jane, come down the stair.
Each dull blunt wooden stalactite
Of rain creaks, hardened by the light,
Sounding like an overtone
From some lonely world unknown.
But the creaking empty light
Will never harden into sight,

Will never penetrate your brain
With overtones like the blunt rain.
The light would show (if it could harden)
Eternities of kitchen garden,
Cockscomb flowers that none will pluck,
And wooden flowers that 'gin to cluck.
In the kitchen you must light
Flames as staring, red and white,
As carrots or as turnips, shining
Where the cold dawn light lies whining.
Cockscomb hair on the cold wind
Hangs limp, turns the milk's weak mind.
Jane, Jane,
Tall as a crane,
The morning light creaks down again!

MORNING AT THE WINDOW

They are rattling breakfast plates in the basement kitchens,
And along the trampled edges of the street
I am aware of the damp souls of housemaids
Sprouting despondently at area gates.
The brown waves of fog toss up to me
Twisted faces from the bottom of the street,
And tear from a passer-by with muddy skirts
An aimless smile that hovers in the air
And vanishes along the level of the roofs.

আমার অভিমতের স্বপক্ষে আরো দৃষ্টান্তের দরকার থাকলে, রবর্ট্ ফ্রস্ট্-এর নাম নিতে পারি ; এবং শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্ আর ফ্রস্ট্-এর বৈসাদৃশ্য এমনি মূলগত যে প্রথমার কাব্যবিচার যদি ঠিক হয়, তবে ফ্রস্ট্ কোনোমতেই কবি নন। তাহলেও আমার বিশ্বাস যে রসিকমাত্রের মন ঝুঁকবে ফ্রস্ট্-এরই দিকে। অথচ তাঁর কবিতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নাম-গন্ধ নেই ; উপমা নূতনত্ব-হীন, প্রসঙ্গনির্ব্বাচন সনাতনপন্থী, ভাষা এতই সরল, শব্দবিন্যাস এতই সহজ যে হয়তো এ-কথা বলাতেও অত্যুক্তি নেই যে ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্-এর দুঃসাধ্য আদর্শকে একা তিনিই কার্য্যে পরিণত করেছেন। এমনকি প্রতিভা মাপলেও, শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্-এর জয় অনিবার্য্য। তবু এই প্রাকৃত রসস্রষ্টার অনুচ্চ আহ্বানে আমাদের কল্পনা যে-রকম আগ্রহসহকারে সাড়া দেয়,

শ্রীমতীর সভ্য, সালঙ্কৃত কবিতাগুলির ছলা-কলায় তার এক চতুর্থাংশ ঔৎসুক্যও জাগে না। ফ্রস্ট্-এর এই ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণীশক্তির কারণ খুঁজলে, দেখা যাবে যে এর মর্মে রয়েছে লেখকের অকপট বিনয়। তিনি ভাবেন না যে তাঁর নিজস্ব জীবনে এমন কোনো গরিমা আছে যেটা ঢাক পিটিয়ে লোক-সভায় বিজ্ঞাপনীয়। ফলে তাঁর আজন্ম সাধনার প্রস্তাবনায় তিনি এইটুকু লিখেই ক্ষান্ত যে—

I'm going out to clean the pasture spring;
I'll only stop to rake the leaves away
(And wait to watch the water clear, I may):
I sha'n't be gone long.—You come too.
I'm going out to fetch the little calf
That's standing by the mother. It's so young,
It totters when she licks it with her tongue.
I sha'n't be gone long.—You come too.

এবং বিশ্বস্ত পাঠক এই প্রচ্ছন্ন দিশারীর পদাঙ্কে চ'লে, কত বৃষ্টি-ঝড়, কত রৌদ্র-হিম, অসংখ্য পর্ব্বত, অগণ্য নদ-নদী, বন-উপবন পেরিয়ে, কখন যে অমৃতলোকের দ্বারে এসে পৌঁছয়, তা সে নিজেও জানে না।

উপরের মুখবন্ধটি প'ড়ে অনেকে হয়তো ভাববেন যে রবর্ট্ ফ্রস্ট্ বুঝি সাবেকী আমলের শুচিগ্রস্ত কবি, যাঁর লেখার একমাত্র উপজীব্য জ্যোৎস্নাস্নাত মাধবীবিতানে প্রকৃতিদেবীর লাস্যলীলা। আসলে কিন্তু সে-বিশ্বাসের কোনো ভিত্তি নেই; এবং ফ্রস্ট্ প্রধানত স্বভাবের কবি হলেও, অর্থাৎ তাঁর কাব্য মুখ্যত নিসর্গের মুখ চাইলেও, তিনি যে কখনোই মানুষকে প্রত্যাখ্যান করেন নি, তার প্রমাণ তাঁর যে-কোনো বড় কবিতাতেই প্রাপ্তব্য। তাহলেও তিনি আপন শক্তির সীমা জানেন; তিনি বোঝেন যে অধুনার বিকৃত বিক্ষোভে ধ্রুবতার স্বর শোনার মতো অলৌকিক কান তাঁর নেই; এবং সেইজন্যে মানুষের সঙ্গে তাঁর বিশ্রম্ভালাপ জমে প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মাঝখানেই।

অবশ্য যারা টেলিফোন্ ছাড়া কথা কয় না, পুল্ম্যান্ ভিন্ন নড়ে না, বিশ তলার নীচে নীড় বাঁধে না, তাদের বিষয়েও ফ্রস্ট্ নিরুৎসুক নন। তবে তাঁর বিবেচনায় বর্ত্তমানের যান্ত্রিক উপসর্গগুলো বাসাবাড়ির অনাত্মীয় আসবাবের মতো; মানুষের সম্পূর্ণ সত্তার পরিচয় খুঁজলে, হয়তো সে-সমস্তের সংস্পর্শ বিনা বাক্যে না সইলেই নয়; কিন্তু সে-আবেষ্টনে আটকে পড়লে, অন্বেষণ অসমাপ্তই থাকে। অতএব তিনি মনের মানুষকে ডাক দেন পাহাড়ের বিজন চূড়ায়, বনের নিভৃত গহনে, গ্রাম্যপথের পুষ্পিত প্রান্তে; এবং তাঁর অনুসারে বিমান অথবা মোটর যেহেতু ঘোড়ার মতো মানুষের প্রকৃত বন্ধু নয়, হয় তার

দাস, নয় তার প্রভু, তাই তিনি এঞ্জিনের দিকে না তাকিয়ে ঘোড়ার সম্বন্ধেই কৌতূহল দেখান। অথচ এমনি তাঁর অনুকম্পা, এত স্বতঃসিদ্ধ তাঁর সারল্য, এ-রকম অতিসাহিত্যিক তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যে আধুনিক কাব্যের কোনো গুণই উদ্ধৃত কবিতায় অনুপস্থিত নয়; বরং দাসখৎ অদৃষ্টলিপির নামান্তর এবং বন্ধুনির্ব্বাচন মননের ইঙ্গিতময় ব'লে, এই অশ্বসম্পর্কিত পংক্তি-কটায় আমরা সাম্প্রতিক মানুষকেও যত অন্তরঙ্গ ভাবে পাই, যুগোচিত কাব্যের আলোক-চিত্রে তত সহজে তার সাক্ষাৎ মেলে না :

Once when the snow of the year was beginning to fall,
We stopped by a mountain pasture to say, 'Whose colt?',
A little Morgan had one forefoot on the wall,
The other curled at his breast. He dipped his head
And snorted at us. And then he had to bolt.
We heard the miniature thunder when he fled,
And we saw him, or thought we saw him, dim and grey,
Like a shadow against the curtain of falling flakes.
'I think the little fellow's afraid of the snow.
He isn't winter-broken. It isn't play
With the little fellow at all. He's running away.
I doubt if even his mother could tell him, "Sakes,
It's only weather." He'd think she didn't know!
Where is his mother? He can't be out alone.'
And now he comes again with clatter of stone,
And mounts the wall again with whited eyes
And all his tail that isn't hair up straight.
He shudders his coat as if to throw off flies.
'Whoever it is that leaves him out so late,
When other creatures have gone to stall and bin,
Ought to be told to come and take him in.'

কবিতাটির সংযত উপসংহার বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য; এবং এতে যদিও অকৃপণ করুণার অভাব নেই, তবু মনুষ্যেতর প্রকৃতির মানুষোচিত তত্ত্বাবধানে ত্রুটি ঘটলে, ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্‌ যে-রকম অমানুষিক অধৈর্য্য দেখাতেন, তাও এখানে একেবারে অবর্ত্তমান। নিম্নলিখিত কবিতা থেকেও বোঝা যাবে যে নিসর্গনিষ্ঠ ফ্রস্ট্‌ আর যাই হোন্‌, ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্‌-এর শিষ্য নন; এবং তাঁর স্বভাববিলাস স্বাভাবিক ব'লেই, তিনি রাত্রে নক্ষত্রপংক্তির পানে চেয়ে লিখতে পারেন :

You will wait a long, long time for anything much
To happen in heaven beyond the floats of cloud

And the Northern Lights that run like tingling nerves.
The sun and moon get crossed, but they never touch,
Nor strike out fire from each other, nor crash out loud.
The planets seem to interfere in their curves,
But nothing ever happens, no harm is done.
We may as well go patiently on with our life,
And look elsewhere than to stars and moon and sun
For the shocks and changes we need to keep us sane.
It is true the longest drouth will end in rain,
The longest peace in China will end in strife.
Still it wouldn't reward the watcher to stay awake
In hopes of seeing the calm of heaven break
On his particular time and personal sight.
That calm seems certainly safe to last to-night.

অতএব ফ্রস্ট্‌-এর মতে প্রকৃতি ফেরার আসামীদের অজ্ঞাতবাসের জায়গা নয়। স্বভাবকে তিনি ব্যবহার করেন আবহমান জীবনের স্থিতিনিরূপক-রূপে ; এবং সেইজন্যে তাঁর কাব্যে নিসর্গ বিশ্ববিধাতার শূন্য সিংহাসন জুড়ে বসে না, অথবা পশু ও শিশু দেবতার ছদ্মবেশ পরে না, তাতে সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎ মেলে মানুষের সাধারণ পরিমণ্ডলে। আসলে ফ্রস্ট্‌ মানুষকেই ভালোবাসেন। তাই তিনি তাকে দেবতা বলতে কুণ্ঠিত। তিনি জানেন সে নশ্বর। তৎসত্ত্বেও মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অপরিমেয়। কেননা মানুষ অস্থায়ী বটে, কিন্তু মানুষের পটভূমি চিরন্তন। স্বভাব ও মানুষের সামঞ্জস্যসাধন আজকের দিনে এতই শক্ত যে শুধু এইটুকু সিদ্ধির জন্যেই ফ্রস্ট্‌ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

উল্লিখিত মন্তব্যের সাহায্যে মানুষের কবি হিসাবে ফ্রস্ট্‌-এর উৎকর্ষপ্রচার আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি জানি যে তিনি স্বভাবের কবি ও স্বভাবকবি ব'লেই আমাদের চিরস্মরণীয়। তবু এ-কথাও কোনোমতে অস্বীকার্য্য নয় যে প্রকৃতির টীকাকার-রূপেই তিনি অদ্বিতীয় হলেও, মনুষ্য-সম্বন্ধে তাঁর প্রক্ষিপ্ত ভাষ্যগুলি বোধির আলোকে উদ্ভাসিত। উদাহরণত নীচের কবিতাটি পাঠ্য ; এবং ও-পটে কবি প্রকাশ্যে দুইটি বনপথের ছবিই এঁকেছেন বটে, কিন্তু সে-ছবির তলায় তলায় আধিদৈবিক অভিজ্ঞতাই লুকিয়ে রয়েছে :

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth ;
Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,

Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,
And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back,
I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

আরো দৃষ্টান্ত-উদ্ধারের লোভ সাম্‌লানো সহজ নয়; এবং সময় ও স্থান-সংক্ষেপের প্রয়োজন না থাকলে, নমুনার পর নমুনা তুলে দশ-বিশ পাতা ভরিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু আমার মতের সমর্থনে ওই কটাই বোধহয় যথেষ্ট। উপরন্তু ফ্রস্ট-এর লেখা প্রবচনচয়নের প্রতিকূল; তাঁর তন্বু কবিতাগুলির তনিমা এত সুসম্বদ্ধ, এমনি প্রাণঘন যে অঙ্গচ্ছেদের পরে তাদের বাঁচিয়ে রাখা দুঃসাধ্য। এইখানে ফ্রস্ট্-এর সঙ্গে অন্য সমসাময়িক কবিদের গভীর পার্থক্য ধরা পড়ে। আজকালকার—না, শুধু আজকালকার নয়, গত দেড় শ বছরের একাধিক বিখ্যাত কবিতা সমষ্টি-রূপে গণ্য নয়, সেগুলো সাধারণত অসংলগ্ন ব্যষ্টির অসংহত গ্রন্থন। তৎসত্ত্বেও আমরা এ-কথা মানতে অতিঅবশ্যই বাধ্য যে উনিশ শতকী কাব্যের অবচ্ছিন্ন কলির অধিকাংশ অনুপম ব'লেই, সে-সমস্ত আজও আদর পায়।

তবে অনুপম ব'লেই মনে খটকা লাগে, সন্দেহ জাগে সেগুলো বুঝি আপতিক ও অনর্থক। বস্তুত সে-রকম বিশ্লিষ্ট বাক্যের সাহায্যে সমগ্র কবিতার রূপ তো পরিপূর্ণতর হয় না বটেই, বরং তাতে অসামঞ্জস্যের স্পর্শদোষ লাগে। অখণ্ড অন্ধকারের মধ্যে একটিমাত্র প্রদীপ যেমন দিশাহারা পান্থের দিকভ্রম বাড়ায়, স্থিরলক্ষ্য পতঙ্গের পথচ্যুতি ঘটায়, তেমনি একটি অলোক-সামান্য পদের ব্যাঘাতে সারা কবিতার রসপ্রতিপত্তি ঘোচে। উদাহরণ-স্বরূপ শেলি-র স্কাইলার্ক্-শীর্ষক কবিতাটি উল্লেখযোগ্য; এবং একটা কবিতার মধ্যে এতগুলো অপূর্ব্ব লাইনের সমাবেশ অন্যত্র খুবই বিরল। তবু অত ঐশ্বর্য্যের মোহ কাটিয়ে পাঠক যখন কবিতাটির সীমান্তে পৌঁছয়, তখন হয়তো শেলি-র অনন্যসাধারণ প্রতিভা-সম্বন্ধে তার সংশয় ঘোচে; কিন্তু 'স্কাইলার্ক্'-এ কবির বক্তব্য যে কী, সে-বিষয়ে তার অজ্ঞানান্ধকার তিলমাত্র কমে না।

বলাই বাহুল্য যে মর্য্যাদাবিচারে ফ্রস্ট্-কে শেলি-র উপরে তোলা আমার

মতেও পাগলামি। এখানে সে-মহাকবির নাম নিলুম শুধু এইটুকু দেখানোর উদ্দেশ্যে যে শেলি-র মতো সাত্ত্বিক কবিও যেখানে বৈশিষ্ট্যবিজ্ঞাপনের লোভ সামলাতে পারেন নি, সেখানে ফ্রস্ট্ অদ্ভুত আত্মসংযমের পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য এই দুর্ব্বলতার জন্যে শেলি সম্পূর্ণ দায়ী নন। গলদ ছিলো তখনকার কাব্যাদর্শে। উনবিংশ শতাব্দীর কবিমাত্রেই ভেবেছিলেন যে অনাত্ম আর অবিশিষ্ট, এ-শব্দদ্বয়ের মধ্যে ধ্বনিবৈচিত্র্য থাকলেও, অর্থবৈষম্য নেই; এবং তাই তাঁরা প্রসঙ্গের দিকে না তাকিয়ে সমস্ত মন-প্রাণ অর্পণ করেছিলেন কবি-প্রধান কাব্যরচনার প্রয়াসে। গত শতাব্দীর কাব্যভাণ্ডারে স্মরণীয় পদের প্রাচুর্য্য সেই প্রাণপণ অধ্যবসায়ের একটিমাত্র শুভ ফল। কিন্তু তার অন্য ফল শোচনীয়; এবং তদানীন্তন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্ররোচনাতেই তখনকার কাব্য কল্পনার কারবার ছেড়ে বিবেকের ব্যবসায়ে নেমেছিলো। আজকের কবিরা হয়তো সর্ব্বনাশের ধাক্কায় চোখ মেলে সবে দেখতে পাচ্ছে যে পৈতৃক পেশার পরিবর্ত্তন অত সহজ বা নিরাপদ নয়।

তাহলেও আত্মরতির মোহ এখনো কাটে নি; এবং আজও শ্রীমতী সিট্ওয়েল্ একটা চমকপ্রদ উপমার জন্যে এক শ লাইন ছড়া লেখেন, অসুস্থ জগৎ অনাক্রমণীয় বুঝে রবর্ট্ গ্রেভ্স্ রোগমুক্তির নামে ঘর-সংসার ছেড়ে পালান, সত্যভাষণকে মাধ্যমিকতার পরাকাষ্ঠা ভেবে হক্স্‌লি সাজেন পাইলেট্-এর বৈহাসিকী পোষাকে। তাঁরা কেউ সত্যকে চান না, শিবকে চান না, সুন্দরকে চান না, চান শুধু স্বতন্ত্রকে; এবং পক্ষপাতেই যেহেতু স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ, তাই তাঁদের কাব্য রসসৃষ্টির অদ্বিতীয় উপায় নয়, স্বমতপ্রচারের নাতিসামান্য বাহন। তাঁরা জানেন না অথবা জেনেও মানেন না যে নৈরাত্ম কাব্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী বটে, কিন্তু ব্যক্তিস্বরূপের পরম সুহৃদ। কারণ নৈর্ব্যক্তিক কাব্যে কবির ক্ষীণপ্রাণ স্বকীয়তা অমৃতের দিকে হাত বাড়িয়ে লোক হাসায় না, ঐকান্তিক অভিজ্ঞা সার্ব্বজনীন অভিজ্ঞতায় মিশে স্বভাবতই দেশ-কালের বাঁধ ভাঙে। আমার বিশ্বাস কবিপ্রতিভার এই বিশ্বমানবিক গুণটা নিম্নলিখিত কবিতায় সুপ্রকট, এবং এতে ফ্রস্ট্ লুক্রিশিয়াস্-এর প্রতিধ্বনি করেন নি, নিজের অজ্ঞাতসারেই দেখিয়েছেন যে তিনিও সেই মহা কবির বংশধর:

Now close the windows and hush all the fields;
If trees must, let them silently toss;
No bird is singing now, and if there is,
Be it my loss.
It will be long ere the marshes resume,
It will be long ere the earliest bird:
So close the windows and hear not the wind,
But see all wind-stirred.

ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ

হর্বর্ট্ স্পেন্সর নাকি গদ্য-পদ্যের প্রভেদ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে ওই দুই রচনারীতির তারতম্য কেবল মুদ্রাকরের মর্জ্জির উপরে প্রতিষ্ঠিত : এক পাতা ছাপা গদ্যের চার দিকে যে-পাড় থাকে, তা সমান্তর, আর পদ্যের কিনারা বন্ধুর। আমি অবৈজ্ঞানিক মানুষ ; হয়তো সেইজন্যেই ওই ধরণের মৌল ব্যাখ্যায় আমার অবিদ্যা না কেটে, মন হাস্যমুখর হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রণালী-দুটির পার্থক্য আমার কাছে যতই সুস্পষ্ট ঠেকুক না কেন, গদ্য-পদ্যের মধ্যে কোনো প্রকৃতিগত বিরোধ আমি আজ অবধি ধরতে পারি নি, বরং অনেক সময়ে ভেবেছি যে ওই দুই ধারার সঙ্গমই সাহিত্যতীর্থ-নামে সুপরিচিত। এ-মতটিকে প্রথমে যদিও অতিরঞ্জিত লাগে, তবু এর সমর্থন শুধু সময়সাপেক্ষ। গদ্যবিলাসীরাও নিশ্চয়ই দেখেছেন যে রচনাবিশেষের আবেদন যখন বুদ্ধি-বিবেচনার পাহারা এড়িয়ে একেবারে তাঁদের অন্দরের দ্বারে ঘা দেয়, তখন তাকে যেন আর কাব্যের থেকে আলাদা ক'রে চেনা যায় না। কাব্যামোদীও অনুরূপ অভিজ্ঞতার ভুক্তভোগী। প্রায়ই এমন কবিতা তাঁর হাতে আসে যার মধ্যে, ছন্দ-মিল-উপমা-অনুপ্রাসের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও, কাব্যের লেশমাত্র মিলে না, যার রাজকীয় অলঙ্করণের ফাঁকে ফাঁকে দৈনন্দিন দাস্যের গদ্যময় দীনতা মুহুর্মুহু উঁকি পাড়ে।

এত কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে রসের নিমন্ত্রণে জাতিভেদ নেই, সেখানে গদ্য-পদ্য, উভয়েরই সমান অধিকার, বিচার্য্য কেবল প্রবেশপ্রার্থীর মহানুভবতা, আবেগের গভীরতা আর কার্য্য-কারণের সুসঙ্গতি ; এবং সাহিত্য যেহেতু মূলত জীবনেরই প্রতিবিম্ব, তাই আমার মতে, গদ্য-পদ্যের যে-সমন্বয় সাহিত্যে দ্রষ্টব্য, তার দৃষ্টান্ত জীবনেও সুলভ। মলিয়ের-এর একজন নায়ক শুনে চমকে গিয়েছিলেন যে তিনি আজীবন না জেনে গদ্য আউড়ে এসেছেন ; এবং আমাদের মতো আষ্টপ্রহরিক মানুষেরাও হৃদয়াবেগের তাগিদে বৎসরে যত বার কবিতায় কথা বলি, তার তালিকাও সত্যই বিস্ময়কর। তবে সেইজন্যেই গদ্য-পদ্যের ঐক্য অবশ্যগ্রাহ্য নয় ; এবং বোধহয় সকল সভ্য মানুষই আবহমান কাল এদের দ্বৈধ স্বীকার ক'রে চলেছে। যত দূর মনে পড়ে, এমন কোনো ভাষা নেই যাতে এই দুই সংজ্ঞার বাহকরূপে কেবল একটিমাত্র শব্দকে দেখা যায় ; এবং আমি যখন শব্দব্রহ্মে আস্থাবান নই, বুঝি যে মানুষের অন্যান্য প্রয়োজনসিদ্ধির উপায়ের মতো ভাষাও আবশ্যিকতার চালনে গ'ড়ে উঠেছে, তখন আমি মানতে বাধ্য যে ও-দুটো অভিধার মধ্যে অর্থের বৈষম্য সহজ ব'লেই, ওদের আক্ষরিক চিহ্ন বিভিন্ন।

(পক্ষান্তরে গদ্য ও পদ্য সাধারণত যতই স্বাবলম্বী হোক, তাদের স্কন্ধে যখন রসসৃষ্টির দায়িত্ব চাপে, তখন আর এই সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ থাকে না, তখন তারা তাদের স্বকীয় মূলধন একত্র ক'রে যে-যৌথ কারবার পাতে, তাই জনসমাজে পায় কাব্য-আখ্যা। কাব্য যে মানবচৈতন্যের শুদ্ধতম অবস্থা, এ-প্রসঙ্গে আজ সম্ভবত মতভেদ নেই। অর্থাৎ কাব্যের মধ্যস্থতায় যে-বস্তুকে চেনা যায়, তার সম্বন্ধে প্রতর্ক নিষিদ্ধ ; এবং নেতি-নেতিই সে-পরিচয়ের বাচনিক অভিব্যক্তি বটে, কিন্তু তার কেন্দ্র নঙর্থক নয়, একটা অতিনিশ্চিত উপলব্ধির উৎস। কাব্যলব্ধ বস্তু অনেক সময়েই অনির্ব্বচনীয়, কোনো কালেই অজ্ঞেয় নয় ; এবং কথাগুলো প্রথমত মরমীদের অতিশয়োক্তির মতো শোনালেও, ব্যাপারটির সঙ্গে কার্য্যত আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর পরিচিত।) এমনকি প্রায় সকল যাতুকরই ভোজ-বাজি দেখায় এই উপায়ে। ব্যাস-বাল্মীকির বংশধরদের মতো ভানুমতির শিষ্যেরাও তাদের চিরাচরিত করকৌশলকে হয় সঙ্গীতের আচ্ছাদনে, নয় অনর্গল বক্তৃতার আড়ালে, এমনি বেমালুম ভাবে লুকয় যে মোহমুগ্ধ দর্শক অগত্যা ভাবে সে অলৌকিক রহস্যের সম্মুখীন। কারণ একটা সুনিয়ন্ত্রিত ধ্বনির সাহায্যে দর্শক বা পাঠকের মনে যে-আবিষ্ট তন্ময়তার সৃষ্টি হয়, তা স্বপ্নাবস্থার অনুরূপ ; এবং সে-অবস্থার বৈশিষ্ট্যই যেহেতু অনিকামতা—আদেশ-উপদেশগ্রহণের অপার ক্ষমতা, তাই সে-ধরণের সংক্রামেই সাপুড়ে সাপকে বশে আনে আর হিপ্নোটিস্ট্ হি স্টিরিয়ারোগীকে স্বাস্থ্যের পথে চালায়।

তবে পালনীয় আদেশমাত্রের যেটা সনাতন লক্ষণ, এখানেও তার ব্যতিক্রম চলে না—অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রেও আজ্ঞাকারীর মনে আত্মপ্রত্যয় এবং আজ্ঞায় সহজবোধ্য নিশ্চয়তা একেবারেই অপরিহার্য্য। কাব্যের গদ্যময় অংশ এই প্রাঞ্জল বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যাপৃত থাকে, এবং পদ্য নেয় পূর্ব্বোক্ত সমাধি-উৎপাদনের ভার। Cover her face, mine eyes dazzle, she died young—এ-রকমের একটা নিরবলম্ব পংক্তি হঠাৎ বাস্তব জীবনে যদি কানে বাজে, তবে সেটাকে পাগলের প্রলাপের মতো শোনালেও শোনাতে পারে। কিন্তু এই লাইনের অহেতুক প্রভাব এড়িয়ে অরসিকেরা যখন হাসেন, তখন তাঁরা ভুলে যান যে ওয়েব্স্টর কেবল ওই কটা কথাকে পর পর সাজিয়েই নিস্তার পান নি, ওই বাণী যাতে দৈববাণীর মতো অমোঘ হয়ে ওঠে, তার ব্যবস্থাও করেছিলেন পূর্ব্বগামী পদ্যের মোহময় কল্লোলে। শেক্স্পীয়র-এর রচনারীতিও অনুরূপ। সেখানেও পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, দৃশ্যের পর দৃশ্য এই প্রস্তুতিতেই কাটে। তার পরে পাঠকের মন সেই উদাত্ত ধ্বনিহিল্লোলে ঝিমিয়ে পড়লে, আসে কবির দুর্নিবার প্রত্যাদেশ—absent thee from

felicity awhile। কিন্তু তত ক্ষণে পাঠক আপত্তি-বিপত্তির ক্ষমতা হারায়। কাজেই তার পর সেই অকিঞ্চিৎকর শব্দ-কটাই তার কাছে ওঙ্কারের মতো প্রাথমিক ঠেকে, সে আর না ভেবে পারে না যে হ্যাম্লেট্‌-এর চিরপ্রয়াণের সঙ্গে তার নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অঙ্কেও, কিছু দিনের জন্যে নয়, চির কালের মতো, যবনিকা নাম্‌লো।

ধ্বনিরচনা মুখ্যত পদ্যের কর্ত্তব্য হ'লেও, গদ্য সে-সম্পদে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, এমন ধারণা অগ্রাহ্য। তবে এ-ক্ষেত্রে উভয়ের তুল্যমূল্য নয়। পদ্যের ধ্বনি সাধারণত সমমাত্রিক ও সুনিয়ন্ত্রিত; কিন্তু গদ্য সর্ব্বত্রই বৈচিত্র্যময়, তার উত্থান-পতন অর্থ ভিন্ন অন্য কোনো বিধি-নিষেধ মানে না। এই স্বাধীনতা সত্ত্বেও গদ্য ক্ষতিগ্রস্ত নয়, এ-কথা নিশ্চয়ই বলা চলে না; কিন্তু এতে ক'রে তার লাভের অঙ্ক যে লোকসানের হিসাবকে বহু পশ্চাতে ছেড়ে যায়, তাও একান্ত নিঃসন্দেহ। কারণ বিজ্ঞানজগতে অনর্থ আজ যতই সম্মান পাক্ না কেন, ললিত কলায় এখনো অর্থ ই অন্বিষ্ট; এবং গদ্য যেহেতু অর্থপ্রধান, তাই পদ্যের পরে জন্মেও শক্তিতে ও সম্ভাবনায় সে আজ জ্যেষ্ঠের উচ্চবর্ত্তী। অবশ্য পদ্যের উপকারিতা এখনো একেবারে ঘোচে নি; ভাবের ছায়াময় রাজ্যে পদ্যই আজও পুরোধা; এবং যৌবনসুলভ চাপল্যের চালনে গদ্যও যখন কালে-ভদ্রে এই রাজত্বের সীমানায় এসে পড়ে, তখন সেও অগত্যা এখানকার হাল-চাল-সম্বন্ধে অগ্রজেরই উপদেশ শোনে। কিন্তু কাম্য যেখানে বর্ণনা, প্রয়োজন যেখানে সংবাদের, সন্দেহভঞ্জনই যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য, যেখানে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে ব্যবধান এত গভীর যে ঘনিষ্ঠতার স্বপ্ন শুদ্ধ বিড়ম্বনা, যেখানে সংক্রমণ অসাধ্য, সম্ভব কেবল জ্ঞাপন, সেখানে গদ্যের প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বাড়াই স্বাভাবিক। বিধাতা জগৎকে এক স্তরে ঢালেন নি। তার মৌলিক তত্ত্ব জানতে চাইলে, হয়তো সমাধিলব্ধ দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন আছে; কিন্তু সেইজন্যেই উপরের স্তরগুলো অবজ্ঞেয় নয়, বরং সংখ্যাভূয়িষ্ঠ। সুতরাং আরিস্টটল্‌-এর মতো কাব্যাদর্শকে জীবনেরই মুকুর ব'লে ভাবলে, সেই প্রতি-বিম্বে স্থূল স্তবকগুলোর স্থান হওয়াও অত্যাবশ্যক।

বলাই বাহুল্য যে গদ্য-পদ্যের স্বভাব যদি সত্যই বিভিন্নধর্ম্মী হয়, তবে বিশুদ্ধ গদ্য অথবা বিশুদ্ধ পদ্য দিয়ে উক্ত জীবননিষ্ঠ কাব্য কোনোমতেই গড়া যাবে না। তার জন্যে প্রয়োজন এমন এক বাহকের যার মধ্যে কোনো বাছ-বিচার নেই, যাতে খুশিমতো গদ্য থেকে পদ্যে এবং পদ্য থেকে গদ্যে যাতায়াতের পথ রয়েছে। কাব্যের এই ধাতুসঙ্করে নির্ম্মিত আধারটির নামই মুক্তচ্ছন্দ—free verse। তাতে নূতন-পুরাতন সকল বয়সের সুরাই ইচ্ছা-মতো মেশানো চলে, অথচ পাত্র ফাটবার কোনো ভয় থাকে না। সে-ছন্দকে

উপলক্ষের তাগিদে পদ্যের নিয়মে দরবেশী নৃত্যে নামানো সম্ভব, আবার অবস্থান্তর ঘট্‌লে, গদ্যের অনিয়মিত গতিও তাতে বেখাপ্পা লাগে না। সে সন্ন্যাসীর ভেক নেয় নি বটে, কিন্তু তাই ব'লেই যে সময়ে সময়ে গৈরিকধারণ করে না, এমন বিশ্বাস ভ্রান্ত। তবে সঙ্গে সঙ্গে এও অনেক দেখেছি যে অলঙ্কারের বাহুল্যে তার অঙ্গে তিলার্দ্ধ স্থান অনাবৃত নেই। তার কণ্ঠে "সাধারণ মেয়ে"-র সুস্থ, সবল উক্তিও যেমন অব্যাহত বেজে ওঠে, "বিশ্বশোক"-এর মহানুভবতাও তেমনি শোভন লাগে। তার প্রশস্ত পথে "ছেলেটা"-ও খেলে বেড়ায়, আবার "শিশুতীর্থ"-এর যাত্রীরাও মিছিল ক'রে এগিয়ে চলে। তার প্রাঙ্গণে "মাঝে মাঝে মরচে-পড়া কালো মাটি"-র সীমান্তেই ভিড় জমায় "রক্তবর্ণ শিখরশ্রেণী রুষ্ট রুদ্রের প্রলয়-ভ্রূকুঞ্চনের মতো"। অল্প কথায় তার "গর্জ্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরল তালে" শোনা যায় "চিরকালের স্তব্ধতা আর চলতিকালের চাঞ্চল্য"। ভাষার সহজ বৈচিত্র্য সে-ছন্দকে শক্তি জোগায়, তাই সহস্র স্বৈরাচরণের মধ্যে সে কেবল এইটুকুর হিসাব রাখে যে ভাষার পদক্ষেপের সঙ্গে তার পা ফেলার তাল যেন না কাটে। হয়তো সেইজন্যেই গদ্যের সঙ্গে তার বেশি মিল, অথচ পদ্যের সঙ্গে অহি-নকুল-সম্বন্ধ নয়। পূর্ব্বেই জানিয়েছি যে আমার বিবেচনায় প্রাত্যহিক জীবনেও পদ্যের স্থান খুব নগণ্য নয়। কাজেই মুক্তচ্ছন্দেও পদ্যের প্রভাব প্রচুর। এমনকি আমরা এত দূর পর্য্যন্ত মানতে বাধ্য যে তাতে যে-গদ্য ব্যবহৃত, তাও একেবারে সাংসারিক গদ্য নয়। কারণ কবিতার প্রসঙ্গ যতই সামান্য হোক, তার তলায় তলায় একটা অসাধারণ আবেগের উৎস থাকেই থাকে; এবং আবেগজাত বাক্য যেহেতু উচ্ছৃত বাক্য, তাই মুক্তচ্ছন্দের ভাষাও গৃহকর্ম্মের ভাষা নয়, মানুষের উন্নীত চৈতন্যের ভাষা।

মুক্তচ্ছন্দের প্রশস্তিপাঠে অনেকেই হয়তো বিরক্তির স্বরে শুধোবেন, এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিটি তো অতি আধুনিক শিল্পের দান, সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তবে কি কাব্য আর কখনো জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে নি? উত্তরে এ-কথা না মেনে উপায় নেই যে আদি কবিরা তাঁদের কাব্যে জীবনকে যে-সম্পূর্ণতা দিয়েছিলেন, অর্ব্বাচীনেরা তার ত্রিসীমানাতেও পৌছতে পারে নি। অবশ্য এই বৈকল্যের জন্যে আধুনিক লেখকদের দায় যৎসামান্য; এমন ভাবাও অনুচিত নয় যে ইতিমধ্যে জীবনের অঙ্গবাহুল্য এত বেড়েছে যে কোনো একটা রচনায়—এমনকি বিভিন্ন শিল্পের সম্মিলিত উদ্যোগেও—তার চিত্রাঙ্কন প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এজন্যে অল্প-বিস্তর দোষ সদ্যস্তন লেখকদেরই অর্শালেও, তাদের পদ্ধতি সত্যসত্যই নিরপরাধ; এবং পুরাতন কবিতার কলাকৌশলের সঙ্গে মুক্তচ্ছন্দের তুলনা করলে, কোনো দ্বন্দ্ব নিশ্চয়ই দেখা যাবে না। তবে

জগৎ কখনো দাঁড়িয়ে থাকে না ; কালক্রমে শৈবাল বনস্পতির আকার ধরে ; এবং অচেতন বিবর্ত্তনেই যখন এই ফল ফলে, তখন এত বৎসরব্যাপী সজ্ঞান অনুসন্ধানের শেষে বর্ত্তমান কাব্যের রূপরেখা যদি অল্পাধিক বদলায়, তবে বিস্ময়প্রকাশ অসঙ্গত। আসলে সাহিত্যের সত্তা আজও অবিকৃতই আছে, এবং এ-যুগের ভাবুকেরা কাব্যের তরফ থেকে যে-স্বাধীনতা চাইছেন, তা ঐতিহ্যর পরিপন্থী নয়।

আচারলুপ্ত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহঘোষণায় সে-কালের কবিরা এ-কালের কবিদের চেয়ে কিছু কম তৎপর ছিলেন না ; এবং সেইজন্যে শেক্স্‌পীয়র-প্রমুখ প্রথম এলিজাবেথীয় নাট্যকারগণ কতখানি লাঞ্ছনা ভুগেছিলেন, তা ইংরেজিনবিসমাত্রেই জানেন। কিন্তু তাতেও তাঁদের আগ্রহ কমে নি, তৎ-সত্ত্বেও তাঁরা বুঝেছিলেন যে স্থান-কাল-ঘটনার গতানুগতিক ঐক্যের চেয়ে জীবন্ত নাটকের আবশ্যকতা অনেক বেশী। এমনকি ছন্দ-সম্বন্ধেও আমাদের মনোভাব তাঁদেরই অনুবর্ত্তী। অবশ্য সে-যুগেও, আজকালকার মতো, একই কবিতায় গদ্য-পদ্যের সংমিশ্রণ চল্‌তো না। কিন্তু একই দৃশ্যে, একই চরিত্রের মুখে সাধুভাষা ও সাধুচ্ছন্দের সঙ্গে অপভাষা ও অপচ্ছন্দের যে-উদার রাখীবন্ধন অনায়াসে সাধিত হতো, এই বিপ্লবের দিনেও তার অনুকরণ অসম্ভব। যদিও তখনকার গীতিকবিতায় সাম্প্রতিক স্বাবলম্বন মিলতো না, তবু ছন্দকে তাঁরা কখনো কারাগার-রূপে দেখেন নি, তাকে চিনেছিলেন কাব্যপ্রেরণার প্রণালী-রূপে। ফলে এলিজাবেথীয় কাব্য কখনো গণিতের শিকল পরে নি ; সর্ব্বপ্রথম সে-শাসনের বশে আসেন মিল্‌টন্‌। তাই যখন যুগসন্ধিক্ষণে তাঁর সাক্ষাৎ পাই, তখন একটা অকারণ বিষাদে মন যেন নুয়ে পড়ে ; একটা অজানা অবরোধের আশঙ্কায় এত বড় মহাকবিকে ছেড়ে প্রাণ চায় হেরিক্‌-এর মতো গ্রাম্য কবির সংসর্গ ; বুদ্ধি নত শিরে মানে বটে যে লুপ্ত স্বর্গের বার্ত্তা মিল্‌টন্‌-এরই আয়ত্তে, কিন্তু অন্তর খোঁজে মার্ভেল্‌-এর ফুলবাগানের খোলা হাওয়া, যেখানে পার্থিবার ছলা-কলা মাটির গন্ধের সঙ্গে মিশে এই ধূলির ধরণীকেই স্বর্গাদপি গরীয়সী ক'রে রেখেছে।

জানি মিল্‌টন্‌-এর মর্য্যাদালাঘব উপহাস্য ও দুঃসাধ্য ; এবং সে-প্রয়াসও আমার নেই। তাঁর প্রদীপ্ত প্রতিভা ও অতুলনীয় সাফল্যের কথা না পাড়লেও, কেবল তাঁর অধমর্ণদের অফুরন্ত তালিকার দিকে চাইলেই, সে-মহত্ত্বের ঠিকানা পাওয়া যাবে। এ-ঋণ এমনি বিশ্বব্যাপী যে বাংলা সাহিত্য সুদ্ধ তার দায় এড়াতে পারে নি। কিন্তু এ-কথা বলা নিশ্চয়ই মার্জ্জনীয় যে তাঁর কাব্যাদর্শের তমুবাত শিখরে আমার মতো জড়বাদীর স্বচ্ছন্দ বিহার স্বতই সংক্ষিপ্ত। মিল্‌টনী কাব্যের নির্ব্বিকার গাম্ভীর্য্যে মানুষী দুর্ব্বলতার স্থান নেই ; তার

মর্ম্মে নীতিকারের নিশ্চিন্ত নির্ব্যূঢ়তা নিত্য বিরাজমান; তার অভিজাত পাত্র-পাত্রীর অন্যতম স্বয়ং ভগবান। কাজেই যে-নাট্যশালা মিল্‌টনী ট্র্যাজেডির রঙ্গভূমি, সেখানে মর্ত্ত্যচারীর প্রবেশ কোনোমতেই সহজসাধ্য নয়। অবশ্য অনেকের বিবেচনায় একটা অলৌকিক গরিমাই মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু আমি এ-মতে সায় দিতে অক্ষম। কথাটা যদি একেবারে মিথ্যা নাও হয়, তবু তার একদেশদর্শিতা নিঃসন্দেহ। আমি অন্তত যে-মহাকাব্য-দুটির সঙ্গে সুপরিচিত—মহাভারত ও ইলিয়ড্‌—তাদের পরিপ্রেক্ষিতে মিল্‌টনী পবিত্রতার ছায়া নেই। সেই কাব্য-দুটির বাণী মুখ্যত অনুবাদের মারফৎ আমার কাছে পৌঁছেছে, তাই তাদের ভাষা ও ছন্দ-সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য আমার মুখে মানাবে না। তাহলেও এ-সম্বন্ধে আজ আর বোধহয় তর্ক নেই যে ওই আদিকবিদ্বয় বর্জ্জনের দিকে ঝোঁকেন নি, অঙ্গীকারের জন্যে উন্মুখ ছিলেন।

অবশ্য তাঁরাও তাঁদের কাব্য থেকে দেব-দেবীদের বাদ দেন নি, বরং এমন এক প্রাক্তন যুগের বৃত্তান্ত লিখেছিলেন যখন সংসারের তুচ্ছতম ব্যাপারও অমর অধিকর্ম্মাদের দৃষ্টি এড়াতো না। তবু অনুবাদের সময়ে দেখা গিয়েছে যে সেই অতিমর্ত্ত্য অতিথিদের উক্তি-প্রত্যুক্তি সাধুভাষা ও পদ্যচ্ছন্দের সংস্পর্শে কেমন যেন মূল্যহীন শোনায়। অথচ চলিত ভাষার অনাড়ষ্ট চরণ যেই পাষাণীর অঙ্গস্পর্শ করে, অমনি তার অত দিনের জড়তা কাটে, অমনি বুঝি চিরন্তনী মাঝে মাঝে ঘুমলেও, কখনোই মরে না। এ-সত্য কেবল ইলিয়ড্‌-অনুবাদক-দেরই উপলব্ধি নয়, যিনি প্রাচীন কাব্যকে ভাষান্তরে আনতে চেয়েছেন, তাঁরই অভিজ্ঞতা অনুরূপ। ষোড়শ শতকে ইংরেজী ভাষা যখন সংহত ও সংস্কৃত হয়ে ওঠে নি, তখন সে-দেশের অনুবাদশিল্প উৎকর্ষের যে-স্তরে পৌঁছে-ছিলো, আজকের পরিবর্দ্ধিত ভাষাজ্ঞান সত্ত্বেও ইংরেজেরা তার অনেক নীচে প'ড়ে আছে। সুতরাং এমন সিদ্ধান্ত নিশ্চয় অনুচিত নয় যে অর্থমর্য্যাদার আধিক্যবশত যে-সকল শব্দ আজ আর নিত্যব্যবহার্য্য নয়, আভিধানিক যাদুঘরে সংস্কৃতির নিদর্শন-রূপে সযত্নে রাখা রয়েছে, কর্ম্মজীবনে তাদের অত ঘটা ছিলো না। দূরত্ব চির দিনই গৌরবপ্রসূ, কাজেই মহাভারতাদির ভাষাকে যদি কোনো আধুনিক অনবদ্য ব'লেও ভাবেন, তবু সমসাময়িকদের চোখে সে-ভাষা যে অতিশুদ্ধির বোঝা বইতো, এমন বিশ্বাস খুব সম্ভব বর্জ্জনীয়।

সে যাই হোক, এত দিন অনাচারে বেড়ে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে কাব্য হঠাৎ অবৈধতা ছাড়লে; এবং তার মতিপরিবর্ত্তনের জন্যে মিল্‌টন্‌-র উপরে দোষারোপ উচিত নয়, আসলে তিনি উপলক্ষমাত্র। এলিজাবেথীয় যুগের আতিশয্যের পরে তথাকথিত ধ্রুপদী আদর্শের প্রাদুর্ভাব শুধু স্বাভাবিক নয়,

অবশ্যম্ভাবীও বটে। উপরন্তু ইতিমধ্যে সাহিত্যের "শ্রমবিভাগ"-ও অনেক দূর এগিয়েছিলো। ড্রাইডেন্-এর অধ্যবসায়ে আড়ষ্ট ইংরেজী গদ্যে যে-অপূর্ব্ব সংবেদনশীলতার সাক্ষাৎ মিললো, তার পরে পদ্যকে সর্ব্বশক্তিমান ভাবার সার্থকতা রইলো না, দেখা গেলো গল্প বলা, তর্ক করা, শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি অনেক কর্ত্তব্য, যা এত দিন অগত্যা আমরা পদ্যের সাহায্যে কায়ক্লেশে সেরেছি, তা গদ্যের দ্বারা অতি সহজে ও শোভন উপায়ে সম্পন্ন হয়। তাছাড়া ঠিক এই সময়েই জীবনের স্থূল দিকটারও আগল ভাঙলো। রিনেসেন্স্-এর পর থেকে কৌতূহলী মানুষ যে-সকল নূতন ক্ষেত্রে লাঙল চালিয়েছিলো, তাতে অভাবনীয় ফল ফল্‌লো, এবং ধরা পড়লো যে ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্কার পদ্যের মারফতে কোনোমতেই লোকসমক্ষে আনা যাবে না। এ-অবস্থায় গদ্যের পদবৃদ্ধি অনিবার্য্য। তখনকার সাহিত্যিকেরা যদি সত্যই কঠোরহৃদয় ব্যাবহারিক মানুষ হতেন, তবে অকারী মন্ত্র-তন্ত্রের সঙ্গে অব্যবহার্য্য পদ্যকেও তাঁরা নিঃসঙ্কোচে বিস্মৃতির পিঁজরাপোলে পাঠাতে পারতেন। অতখানি অকৃতজ্ঞতা তাঁদের সাধ্যে কুললো না, তাঁরা ঠিক করলেন যে সভ্যতার এই অতিজীবিত সেবকটিকে অজ্ঞাতবাসে তাড়িয়ে তাকে দৈনিক জীবনযাত্রা থেকে ছুটি দেওয়া হবে; কিন্তু যখন উৎসব-অনুষ্ঠানের সময় আসবে, তখন মিছিলের শীর্ষস্থানে থাকবে সেই।

আমার বিশ্বাস মুদ্রাযন্ত্রের বহুল প্রচলন এই সঙ্কল্পের অন্যতম কারণ। যত দিন অলি-গলিতে ছাপাখানার আবির্ভাব হয় নি, যত দিন সাহিত্যের পাণ্ডুলিপি কেবল গ্রন্থাগারে বিরাজ করতো, তত দিন কাব্যের ইচ্ছাবিহার বিপদ ঘটায় নি। কারণ তত দিন যাদের সঙ্গে সে ঘুরে বেড়াতো, তারা অধিকাংশই বিশেষজ্ঞ, কাব্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে সুপরিচিত, তার দুর্ব্বলতার সম্বন্ধে সচেতন, কাব্যপাঠে সুদক্ষ। কিন্তু এখন থেকে যারা তার চার দিকে ভিড় জমালে, পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার ধৈর্য্য তাদের ছিলো না। সাহিত্য তাদের অবসরবিনোদনে লাগলো; এবং যেহেতু সে-যুগের প্রলোভন যে-মাত্রায় বেড়েছিলো, অবসর সে-অনুপাতে বাড়ে নি, তাই লেখকের প্রচ্ছন্ন অভিপ্রায়কে প্রত্যক্ষ করার মতো সময় তারা পেতো না, ভাবতো আভরণের পারিপাট্যই বুঝি প্রকর্ষতার চিহ্ন। এই শ্রেণীর পাঠক, বিশেষত এই শ্রেণীর অনুকারকের কুসঙ্গে স্বাধীনতা সহজেই স্বেচ্ছাচারে বদলায়। অতএব সন্ত্রস্ত কবিরা কাব্যকে বিধান মানানোর চেষ্টায় কোমর বাঁধলেন। ফলে হিরোয়িক্ কাপ্লেট্-এর শৃঙ্খলনির্ম্মাণ হলো, স্থান-কাল-ঘটনার নির্ব্বাসিত সঙ্গতি রঙ্গালয়ে পুনঃপ্রবেশ করলে, বিবেচকেরা জানালেন যে ট্র্যাজেডির পক্ষে জাতিরক্ষার একমাত্র উপায় রাজসিক আড়ম্বরের আড়ালে নায়ক-নায়িকার আত্মবিলোপ।

সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের ভাষাও গাম্ভীর্য্যের ভেক নিলে, যাতে জনসাধারণ শ্রুতি-মাত্রেই বোঝে যে রুচিসমাহিত সমাজে শৈথিল্যের উপক্রম স্বদ্ধ দণ্ডনীয়।

দুর্ভাগ্যবশত এত ক'রেও অভীষ্টসিদ্ধি হলো না, ফল দাঁড়ালো ঠিক উল্‌টো। হয়তো সংস্কৃতি কাব্যের প্রকৃতিবিরোধী। অন্ততপক্ষে এটা নিশ্চয় যে ড্রাইডেন্-পোপ্-এর পরে ইংরেজী কাব্যের অতিউর্ব্বর ভূমিও বহু দিন পর্য্যন্ত উষর রয়ে গেল; এবং আত্মপ্রকাশের প্রণোদনায় যাদের অনীহা ঘুচলো, তারা বরণমালা দিলে গদ্যের গলায়। অবশ্য তখনও ব্লেক্-এর মতো দু-এক জন হঠকারী গোল বাধাতে ছাড়লে না বটে, কিন্তু সমসাময়িক সুধিমণ্ডলী তাতে টললেন না, সে-ঔদ্ধত্যকে উন্মত্ততা ভেবে তাদের ক্ষমা করলেন; এবং অতিবড় খেয়ালীও আজ এ-কথা মানবে যে তাদের কবিত্ব-সম্বন্ধে সহধুরীদের মত যদিও ভ্রান্ত, তবু তাদের চিত্তবিকার-সম্বন্ধে সে-কালের সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নয়। তাহলেও শেষ পর্য্যন্ত পাগলেরাই জিতলো; এবং আঠারো শতকের শেষ দশায় ফরাসীদেশে যে-রক্তগঙ্গা বইলো, তার ধাক্কা রুচিবাগীশেরা সামলাতে পারলেন না, ডোববার মুখে জানলেন যে উপেক্ষিত বর্ব্বরেরা সত্যসত্যই ক্ষেপে উঠলে, শুধু তাঁদের কেন, স্বয়ং বিশ্ববিধাতারও নিস্তার নেই। ফলে কলিন্স্-এর গৌরব পোপ্-এর প্রতিপত্তিকে ছাড়ালো, ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্ চলিত ভাষাকে কাব্যের ভূষণ ব'লে রটালেন, অভিজাত বাইরন্ দিগ্বিজয়ে বেরোলেন রথপতাকায় বর্ন্স্-এর কৃষকী প্রবচন লিখে।

দেখতে দেখতে গদ্যের চাহিদা ক'মে পদ্যের প্রসার বাড়লো; শুভবাদীরা জোর গলায় হাঁকলেন যে কাব্যসম্ভারে উনিশ শতক এলিজাবেথীয় যুগকেও হার মানাবে; এবং যেন তাঁদের আত্মশ্লাঘার শাস্তি-স্বরূপ, মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে এমন এক কবির দেহান্তর ঘটলো যিনি শেক্স্‌পীয়র-এর সমকক্ষ না হলেও, পদমর্য্যাদায় ঠিক তাঁর নীচেই আসন পেলেন। এর পরে কাব্যকে ঠেকিয়ে রাখা গেলো না। নিরবচ্ছিন্ন সুসময়ের ফলে কবিরা আবার উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলেন। গদ্য-পদ্যের পুনর্ব্বিবাহে পৌরোহিত্য ক'রেও ব্রাউনিং জাত খোয়ালেন না, টেনিসন্ গ্রাম্য ভাষায় কাব্যরচনার প্রয়াস পেলেন, এবং স্বয়ং সুইন্‌বর্ন্ বিদ্রোহী হুইট্‌ম্যান্-কে কাব্যের ত্রাণকর্ত্তা ব'লে উপাধি দিলেন। অবশ্য মুক্তচ্ছন্দের এই আদিপুরুষটির যথার্থ মূল্য ইংলণ্ড সে-দিনেও বোঝে নি, আজও ঠিক বোঝে না; এবং অল্প দিন যেতে না যেতেই সুইন্‌বর্ন্ সেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপত্র ফিরিয়ে নিয়ে, নিজের ভুল শুধ্‌রোলেন। কিন্তু সুইন্‌বর্ন্-এর পরে যে-কবিরা আসরে নামলেন, তাঁদের কাব্যাদর্শে একটা অভাবনীয় অভিনবত্ব ফুটে উঠলো। য়েট্‌স্-প্রতিষ্ঠিত "রাইমর্স্ ক্লাব্"-এর সভ্যেরা যে-কবিতা লিখতে বসলেন, তার অঙ্গে গদ্যের পাপস্পর্শ হয়তো লাগলো না,

কিন্তু তাতে স্থইন্‌বর্ন্-এর রসালু বহুলতাও ধরা পড়লো না। রক্ষণশীলেদের উপহাস কুড়িয়ে, তাঁরা ঘোষণা করলেন যে কাব্য ততটা পাঠ্য নয়, যতটা শ্রাব্য।

এই অনভ্যস্ত আদর্শে কাব্যের সঙ্গে জনগণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ তো স্বীকৃত হলোই, উপরন্তু লিখিত সাহিত্যের যেটা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—অচলায়তন পারিভাষিকতা—তা কেটে গিয়ে সঞ্জীবিত কাব্য আবার ঋজু, স্বচ্ছ ও স্বাবলম্বী রূপে দেখা দিলে। বোঝা গেলো যে আবৃত্তির যোগ্য কাব্যে অলঙ্কারের ভার সয় না। স্থতরাং ছন্দের গ্রন্থি খুলে ভাষার স্বাভাবিক ধ্বনিবৈচিত্র্য ছাড়া পেলে, রূপকের পালা চুকিয়ে প্রত্যক্ষের অনুসন্ধান চললো, অপরিচয়ের অসীম বিস্ময় পরিচয়ের পরিতৃপ্তির কাছে হার মানলে। তৎসত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কবিরা অবশ্য ছন্দোমুক্তিতে পৌঁছতে পারলেন না; তার জন্যে আরো পনেরো-বিশ বছরের দেরি ছিলো। তবু এই বিদ্রোহী নেতাদের অকাল মৃত্যুর পরেও, সাইমন্স্ ফরাসীদেশ থেকে নমুনা এনে যে-নববিধান ইংরেজী কাব্যে ঢোকালেন, তা প'ড়ে আর কারো সন্দেহ রইলো না যে পরিবর্ত্তন আসন্ন। এর পরের ঘটনা আর ইতিহাসের অঙ্কারূঢ় নয়, সমসাময়িক পক্ষপাতের অন্তর্গত। আধুনিক কাব্যপ্রচেষ্টা এখনো পরীক্ষা পেরোয় নি, এবং তার ভবিতব্য-সম্বন্ধে নির্ভাবনা নিশ্চয়ই মূঢ়তা। তবে একটা কথা বোধহয় ইতি-মধ্যেই ধরা পড়েছে; এবং তা এই যে কাব্য আর মুক্তি, এ-দুয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, বরং এরা পরমাত্মীয়; যদি নিরাসক্ত ভাবে সাধনা করা যায়, তবে অরাজকতার মধ্যে দিয়ে কাব্যের নির্দ্বন্দ্ব লোকে উপনীত হওয়া যাবে।

কাব্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে আমার উদ্ভট অনুমান যে কেবল ইংরেজী সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণেই প্রমাণিত হবে না, তা আমি বুঝি। অপরাপর সাহিত্যকে সাক্ষ্য ডাকা আমার সাধ্যের অতীত। কিন্তু একটা অন্ধ ধারণা আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারি না যে সমস্ত পাশ্চাত্ত্য কাব্যই আমার সমর্থন করবে। প্রাচ্যের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র; এবং এ-অঞ্চলে মানুষের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তি অধ্যাত্ম চিন্তাতেই নিমগ্ন। ফলে এ-দেশের কাব্য হয় চিত্তবিনোদনের নিঃসার উপাদান, নয় তত্ত্বদর্শনের আধার। কাজেই যেখানে অচিন নূতনের আগমন-আশঙ্কায় আমাদের আমোদ-প্রমোদে বিঘ্ন ঘটেছে, সেখানে কবি এতটুকুও আমল পায় নি; আবার যখন উপদেশকে সারগর্ভ লেগেছে, তখন উপদেশবাহকের সম্বন্ধে আমরা তিলমাত্র ঔৎসুক্য দেখাই নি। এতাদৃশ আবেষ্টন উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টির প্রতিকূল। কারণ জীবনের সকল হিসাবনিকাশের মতো ললিত কলার খতিয়ানেও দেনা-পাওনার যোগবিয়োগে কেবল শূন্যই অবশিষ্ট থাকে। তবু যত দূর জানি ও শুনেছি, তাতে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে যে পূর্ব্বের উদাসীনতাও হয়তো আর অটল নেই। প্রথাপসারণ চৈনিক জীবনের সর্ব্বত্র

আজ যে-সর্ব্বনাশ এনেছে, সে-অভ্যাঘাতে চীনা কবিতা মরে নি, বরং বেঁচেছে; এবং জাপানী সাহিত্যের অভিজ্ঞতাও অন্য রূপ নয় ব'লেই আমার বিশ্বাস। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের সঙ্গে আমি পরোক্ষ ভাবেও পরিচিত নই; তাই সে-বিষয়ে কোনো রকম মতপোষণ আমার পক্ষে অশোভন। তাহলেও বাংলা সাময়িকীতে বাদ-বিতণ্ডার বহর ও ঝাঁঝ দেখে স্বভাবতই মনে হয় যে এ-দেশ পাণ্ডববর্জ্জিত বটে, কিন্তু কালাতিরিক্ত নয়।

অবশ্য বাংলা কাব্যে খুব বেশি ভাঙা-চোরার দরকার হয় নি; কারণ তার গতানুগতিক সঙ্কীর্ণতা কোনো দিনই অত্যধিক ছিল না। কিন্তু এই ব্রাত্যতার কতখানি স্বেচ্ছাকৃত আর কতটা আবশ্যিক, তা বলা কঠিন। আমার বিবেচনায় উনিশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বাংলা গদ্যের নাম-গন্ধ না থাকায় এখানকার ছান্দসিকেরা অগত্যা পদ্যকে অবারিত গতির আদেশ দিয়েছিলেন। নচেৎ যারা সমাজের শ্রদ্ধা হারাবার ভয়ে নিজেদের কামাগ্নিকে দেবতার আড়ালে লুকতে দ্বিধা করে নি, তারা যে কেবল ছন্দের বেলায় স্বায়ত্তশাসনের নির্দ্দেশ মানবে, এমন ভাবা সহজ নয়। প্রাচ্যের অন্যান্য সাহিত্যের মতো বঙ্গসাহিত্যেও জীবনের প্রভাব অত্যল্প; কিন্তু যখন তার বংশকারিকার কথা মনে পড়ে, তখন এই অনধিক সংস্পর্শই যথেষ্ট বিস্ময়কর। কেননা বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি সংস্কৃত সাহিত্যের ছায়ায়, এবং সে-সাহিত্যের গর্ব্বই হচ্ছে এই যে তার ভাষা দেবভাষা, অর্থাৎ মানুষের অকথ্য ভাষা। নৃতত্ত্ববিদ্যার বিবেচনায় কাব্য বিবর্ত্তিত মন্ত্রমাত্র; এবং এক সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের বিধিবদ্ধ আচারনিষ্ঠা দেখেই এ-সিদ্ধান্তে আস্থা জাগে। তবে আর্য্যাজাতীয় দু-একটা ছন্দ শুনে এমন ভুল হয়তো মাঝে মাঝে হয় যে সংস্কৃত কবিদের সহিষ্ণুতাও বুঝি অসীম ছিলো না। কিন্তু সে-মরীচিকার আয়ু সামান্য, ঈষদ্ মনোযোগেই জানা যায় যে আর্য্যার আপাতস্বাচ্ছন্দ্যও একটা অকাট্য পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। ব্যায়ামকুশলী সৈন্য-দলের কুচ-কাওয়াজে যেমন থেকে থেকে এক একটা সুনিয়ন্ত্রিত ও আয়াসসাধ্য শৈথিল্যের ফাঁক আসে, এও ঠিক তেমনি। নেপথ্যে প্রযোজক ইঙ্গিত করছেন, তাই অনুগত নর্ত্তকের দল পূর্ব্বাভিনীত ভঙ্গিতে সার ভেঙে শিক্ষানুরূপ উপায়ে বৈচিত্র্য-উৎপাদনের প্রয়াস পাচ্ছে।

বিধাতা বাঙালীর অদৃষ্টে এতখানি দুর্দ্দশা লেখেন নি বটে, কিন্তু পয়ারের পদ্মমধু খেয়ে বঙ্গভারতীও কম বিপদে পড়েন নি। তবে দেবীর পুণ্যবল বোধহয় অশেষ; তাই পরদেশী প্রচারকদের প্ররোচনায় এক দিন হঠাৎ এক নূতন কালাপাহাড় সদর্পে মন্দিরে ঢুকে সরস্বতীকে বনেট পরিয়ে দিলেন; এবং পোষাকের এমনি গুণ যে সঙ্গে সঙ্গে পাষাণীর নিঃসাড় দেহে যাবনিক চাপল্যের হিল্লোল উঠলো। দুর্ভাগ্যক্রমে মাইকেলের উপরে মিল্‌টন্‌-এর প্রভাব নাতিতুচ্ছ

ছিলো না; এবং অসুস্থ কাব্যের রোগ সারানোর পক্ষে সেই কবিরাজের চিকিৎসা যেহেতু শ্রেষ্ঠ উপায় নয়, তাই মাইকেল ছন্দকে অমিত্রাক্ষর ক'রেই থামলেন, বুঝলেন না যে ভাষা প্রাকৃত না হলে, প্রকৃত কাব্যরচনা অসম্ভব। তবু মাইকেলের সমর্থনে এ-কথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য যে ভাষা-সম্বন্ধে তিনি কোনো কালেই ঔদাসীন্য দেখান নি। তৎকালীন পুঁথিগত বাংলা তাঁর চোখে অচল ঠেকেছিলো; এবং সজীব ভাষার সন্ধানে তিনি যদি শেষ পর্য্যন্ত সংস্কৃত শব্দকোষেরই শরণ নিয়ে থাকেন, তাহলে শুধু তাঁকেই একদেশদর্শী বললে চলবে না, অসংস্কৃত বাংলার ঐকান্তিক দৈন্যও মানতে হবে। অবশ্য এই দারিদ্র্যের জন্যে লজ্জা বা অনুশোচনা নিষ্প্রয়োজন; কারণ অত শতাব্দীর অবজ্ঞা যাকে অপাংক্তেয় করেছিলো, সেই কাঠবিড়ালীই যখন লঙ্কাবিজয়ের দিনে গায়ের ধূলা ঝেড়ে সেতুবন্ধের ছিদ্র ভরাতে পারলে, তখন তার অকিঞ্চনতা উল্লেখযোগ্য নয়, তার প্রচ্ছন্ন জীবনীশক্তিই বিস্ময়কর।

উপরন্তু মাইকেল-সম্পর্কে এ-কথাও মনে রাখা কর্ত্তব্য যে তিনি ইংরেজি-শিক্ষার প্রথম যুগের মানুষ; এবং নিজ বাসভূমে পরবাসী হওয়াই ছিলো তদানীন্তন চিৎপ্রকর্ষের পরাকাষ্ঠা। সুতরাং এমন সন্দেহ হয়তো অনুচিত নয় যে মাইকেল বাংলা ভাষাকে ভালোবাসতেন বটে, কিন্তু তার প্রকৃতি বুঝতেন না; তাই তিনি বঙ্গভারতীর সেবকমাত্র, তার ত্রাণকর্ত্তা নন। এ-অনুমান মিথ্যা হলেও, অন্তত এটা সত্য যে বাংলা আক্ষরিক ছন্দকে স্বভাবত ত্রৈমাত্রিক ভাবায় যতখানি বৈদেশিকতার আভাস আছে, বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের গোত্রজ বলায় সে-পরিমাণের বিধর্ম্মিতা নেই। কিন্তু এখানে এ-আলোচনা অবান্তর; এবং মাইকেলের ছিদ্রান্বেষণ আমার অনভিপ্রেত। আমি জানি যে তিনি শুধু নিয়ামক হিসাবে অদ্বিতীয় নন, চারিত্র্যগুণের অনটনে তাঁর বিরাট কবিপ্রতিভার অনেকখানি অপ্রকাশিত থাকলেও, তিনি একজন মহাকবি; এবং যত দিন বাংলা কাব্যের অনুকম্পায়ী জুটবে, তত দিন তাঁর নামকীর্ত্তনে লোকাভাব ঘটবে না। কারণ মাইকেল শুধু ম্রিয়মাণ বাংলা কাব্যকে জাগিয়ে তুলেই, ঝিমিয়ে পড়েন নি, বাঙালী কবিকে তরজাওয়ালার দল থেকে প্রথম অব্যাহতি দিয়েছিলেন তিনিই। তাঁর অব্যবহিত পরেই বঙ্গাকাশে যতগুলি জ্যোতিষ্ক উঠেছিলো, তারা যদিও নিতান্তই আকাশপ্রদীপ, তবু বাঙালী মনীষীরা সেই নগণ্যদের জন্যে যে-অকৃপণ সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা বোধহয় মৃন্ময় দ্রোণের চরণে একলব্যের অর্ঘ্যনিবেদন।

মাইকেলকে পথপরিচায়ক হিসাবে না পেলে, বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হতো না, এমন অনুমান পাগলামি। কারণ তাঁর সমান কবি হয়তো শত বর্ষে একবার জন্মায়; এবং তাদের আগমন ধূমকেতুর মতোই স্বয়ম্বশ ও

স্বতঃসিদ্ধ। তৎসত্ত্বেও এ-কথা অতি সত্য যে মাইকেল ও বিহারীলালের বৈফল্য তাঁর সামনে জাজ্বল্যমান না থাকলে, অনেক অকিঞ্চিৎকর পরিশ্রমেই তাঁর অধিকাংশ শক্তি ফুরতো। ভুললে চলবে না যে শুধু আবেগাতিশয্য বা অফুরন্ত কল্পনা দিয়ে কবিতা লেখা অসম্ভব, সেজন্যে রূপায়ণও আদ্যকৃত্য। অন্তত আমার মতে রূপই কবিতার প্রধান উপকরণ ; এবং এ-রূপ যদি যথার্থ‌ই উপযোগী রূপ হয়, তবে কল্পনার ন্যূনত্বেও বিশেষ কিছু আসে যায় না। অবশ্য ঐশ্বর্য্যমাত্রেই বর্জ্জনীয় নয়। কিন্তু যেমন ধনবিজ্ঞানের অনুসারে প্রভূত সঞ্চয়ের চেয়ে যথেচ্ছ অপচয়ও ভালো, তেমনি মস্তকে সুমেরুপ্রমাণ কল্পনা বয়ে বেড়ানো ততটা প্রয়োজন নয়, যতটা প্রয়োজন নিজের কল্পনাকে পরের কাজে লাগানো। এ-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কাছে চির দিনই সুস্পষ্ট ; এবং তাঁর সাহিত্যে প্রসঙ্গ-প্রকরণের যে-নিবিড় সহযোগ দেখি, তা অন্যত্র দুর্লভ। বলাই বাহুল্য এই সামঞ্জস্যবিধানের অধিকাংশ ভারই প্রকরণের বহনীয় ; কেননা প্রসঙ্গ দৈবের দান, তার ক্ষেত্রে পরিগ্রহণ ও পরিবর্জ্জন ছাড়া কোনো মধ্য পন্থার অবকাশ নেই। অতএব তার বহিরাশ্রয়ে, অর্থাৎ ছন্দে, ভাষায় ও প্রতীকে, স্থিতিস্থাপকতা চাই। এইখানেই পূর্ব্ববর্ত্তীদ্বয়ের পরীক্ষার—হয়তো ভ্রান্ত পরীক্ষার—ফল রবীন্দ্রনাথের শ্রমলাঘবের সহায়তা করেছিলো।

সত্যে পৌছনোর পথ যদিও একটি, তবু সে-পথ গোলকধাঁধার মতো, তাতে বারম্বার পথচ্যুতি অনিবার্য্য। কাজেই বিপথগুলোয় লক্ষ্যদ্রষ্টাদের পদচিহ্ন না থাকলে, ঠিক পথটা চিনে নেওয়া নিতান্ত দুষ্কর। অবশ্য প্রথম চেষ্টাতেও কেউ কেউ অদৃষ্টক্রমে নান্য পন্থায় পদার্পণ করেন। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের মতো সদাসচেতন শিল্পীর সম্বন্ধে এই দৈবানুগ্রহ কেমন যেন নিষ্প্রয়োজন ঠেকে। তাই যখন দেখি যে রবীন্দ্রনাথ হাতড়ে বেড়ালেন না, অতি অল্প বয়সেই "চিত্রাঙ্গদা"-র মতো অনবদ্য কাব্যের সাহায্যে বঙ্গসাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের কোঠায় তুলে দিলেন, তখন কেবল "চিত্রাঙ্গদা"-লেখককে ধন্যবাদ জানিয়েই ছুটি পাই না, সেই প্রাক্‌রৈবিক কবিদেরও প্রণাম করি, যাঁদের গবেষণায় বাংলা ভাষা ও ছন্দের স্বরূপ অত অনায়াসে রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা পড়লো। তবে কাব্যের ধনিক তন্ত্রে জন্মে রবীন্দ্রনাথ অনুপার্জ্জিত সম্পত্তির আয়ে বিত্তশালী ব'লে খ্যাত, এমন উদ্‌ভ্রান্ত ধারণা আমার নেই। তাঁর কর্ম্মযোগের সঙ্গে যাঁরাই পরিচিত, তাঁরাই বোঝেন রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য কী অক্লান্ত চেষ্টা ও অবিরত আত্মত্যাগের ফল। নিজের স্বাচ্ছন্দ্য কতখানি ছাড়তে পারলে, তাঁর মতো ছন্দস্বচ্ছন্দ হওয়া যায়, তা হয়তো অকবিদেরও অবিদিত নেই ; এবং প্রকৃতি ও পুরুষকারের পরিণয় ব্যতীত প্রতিভার উদ্ভব যে অভাবনীয়, এ-প্রসঙ্গে প্রায় সকলেই আজ একমত।

কিন্তু সে-সমস্ত মানলেও, হয়তো এমন বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত যে রবীন্দ্রনাথ কালের আনুকূল্যে একেবারে বঞ্চিত নন ; এবং যাঁরা জ্যোতিষশাস্ত্রে আস্থা রাখেন না, তাঁরাও জানেন যে মহাকবির আবির্ভাব লগ্নসাপেক্ষ। অর্থাৎ সকল প্রকারের মহত্ত্বই সুযোগ খোঁজে ; এবং সাহিত্যিক মহত্ত্বপ্রকাশের সুসময় ভাষার শৈশবাবস্থা। সম্প্রতিবিৎরা মুখে যাই বলুন না কেন, মনে মনে তাঁরাও জনসাধারণের সঙ্গে একমত যে প্রগতির পথে মহাকবির সংখ্যা ক্রমেই ক'মে আসছে ; এবং মানুষের বুদ্ধি ও সামর্থ্য যখন অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিবর্দ্ধমান, তখন শুধু তার কাব্যানুভূতিতেই ঘুণ ধরেছে, এমন বিশ্বাস টিঁকবে না। তাই আমরা ভাবতে বাধ্য যে কাব্যের উপাদানে এখন আর সে-নমনীয়তা নেই, যাতে মহাকাব্যের মহানুপ্রেরণা মূর্ত্তিমান হ'য়ে উঠতে পারে ; এবং এই সিদ্ধান্ত যাঁদের কাছে অলীক লাগবে, তাঁদের পক্ষে অতীতের ইতিহাস স্মরণীয়। সফোক্লিস্, লুক্রিশিয়াস্, শেক্স্পীয়র, গোয়েটে এবং সম্ভবত কালিদাস, এতগুলি মহাকবির মধ্যে কেউই যে পরিপুষ্ট ভাষার পরিচর্য্যা করেন নি, তা নিশ্চয়ই নিছক দৈব-যোগ নয়। তাঁরা প্রত্যেকেই যখন আসরে নেমেছিলেন, তখন তাঁদের স্ব স্ব ভাষার বয়ঃসন্ধিকাল, গতানুগতিকের শাসন তখনো সুরু হয় নি, বার্দ্ধক্যের স্থবিরতা তখনো কল্পনাতীত, সম্মুখে শুধু সম্ভাবনার অবাধ প্রান্তর। অথচ অতীত তখন আর নিতান্ত নগণ্য নেই, তার পরিণতির পূর্ব্বাভাস ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে, অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে সে প্রত্যূষের অনিশ্চয়তা ছেড়ে সবে মাত্র প্রভাতের আত্মস্থ আলোকে এসে পৌঁছেছে। এ-অবস্থায় মহাকবির আগমন যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনি স্বাভাবিক ; এবং রবীন্দ্রনাথের জন্মলগ্নেও আমি এই ঘটনাচক্রের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই।

উপরে যা বললুম, তার থেকে যদি কেউ ভাবেন যে আমি আধুনিক কবিদের সুযোগের প্রতীক্ষায় হাত গুটিয়ে ব'সে থাকতে উপদেশ দিচ্ছি, তবে তিনি ভুল করবেন। সে তো দূরের কথা, আমি বরং মানি যে অত্যধিক কালনিষ্ঠাই আধুনিক কাব্যের প্রধান শত্রু। এমন লেখক কোনো দিনই বিরল নয় রচনাশক্তির প্রাখর্য্যে যাঁরা প্রথম শ্রেণীতে স্থান পেতে পারেন। কিন্তু তাঁদের অহমিকার মাত্রা শ্রেষ্ঠ কবিদেরও ছাড়িয়ে যায় ; এবং যদি কখনো সুযোগের সাহায্যে তাঁরা সমকালীন পাঠকের শ্রদ্ধা জাগান, তাহলে সেই শ্রদ্ধা খোয়াবার ভয়ে তাঁদের রূপকারী বিবেক পঙ্গু হয়ে পড়ে। ফলে যে-উপায়ে এক দিন পাঠকের মন মজিয়েছিলেন, তাকে জরাজীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য জেনেও তাঁরা উপায়ান্তর-উদ্ভাবনে অক্ষম হন ; এবং এই অক্ষমতার জন্যেই অকৃতজ্ঞ পাঠকের পক্ষপাত হারান। কাব্যের রূপ কী, তা নিয়ে অনেকেই তর্ক করেছেন, কেউ মীমাংসায় পৌঁছন নি। কাজেই সে-প্রসঙ্গে বৃথা বাক্য না বাড়িয়ে শুধু এইটুকু বলাই নিরাপদ যে

কল্পনামূলক সাহিত্যমাত্রেই যখন বৈচিত্র্য-ব্যতিরেকে বাঁচে না, তখন বৈচিত্র্যের উপেক্ষা কাব্যের পক্ষেও অকল্যাণকর। অর্থাৎ প্রত্যেক উৎকৃষ্ট কবিতাই কালোপযোগী; কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতার আরও একটা বাড়তি গুণ আছে, যেটা কালাতিরিক্ত।

সুযোগ যেমন আসে, তেমনি যায়, সুতরাং তার সহযোগ ভিন্ন যদি শ্রেষ্ঠ কাব্য অলিখিতই থাকে, তবে মহাকবিকে এমন কোনো মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্তে আনতে হবে, যাতে অতীত সুযোগ প্রয়োজনমতো পুনর্জ্জীবন পায়। মহৎ কাব্যের এই ঐন্দ্রজালিক লক্ষণটিকেই আমি উপরে বৈচিত্র্য নাম দিয়েছি। এই বৈচিত্র্য পশ্চিম দেশের ঐকতান সঙ্গীতের মতো; একটা সমষ্টিগত রূপ তার নিশ্চয়ই আছে, এবং সেটাই সর্ব্বপ্রথমে শ্রোতাকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে। কিন্তু এইখানেই তার আবেদনে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে না; বহু বার শুনে যখন তার সমগ্র রূপরেখা শ্রোতার স্মৃতিপটে ফুটে ওঠে, তখন সুরু হয় তার বিশ্লেষণ, প্রত্যেক অঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার, প্রত্যেক যন্ত্রের স্বরসঙ্গতির বিবরণ, প্রত্যেক সুরের সার্থকতার পরিমাপ। যে-শিল্পসৃষ্টি এই দ্বিজত্বে পৌঁছতে পারে, তাতে হয়তো সাময়িক শিল্পের আপাতরমণীয়তা মিলে না, কিন্তু একটা আত্মসমাহিত উৎকর্ষ তাকে অতিপরিচয়ের অবজ্ঞা থেকে চির কাল বাঁচিয়ে রাখে। অবশ্য এ ছাড়া অন্য উপায়েও বৈচিত্র্যসৃজন চলে। হিন্দু সঙ্গীতের নির্দ্দেশে সমগ্র কাব্যজীবনকে নানাবিধ রাগরাগিণীর মধ্যে চারিয়ে দিলে, কবির ব্যয়কুণ্ঠা সূচিত হয় বটে, তবু সে-রীতি ইতিহাস-অনুমোদিত। কিন্তু ভৈরবী গেয়ে খ্যাতি জুটেছিলো ব'লে, যে-সুগায়ক সারাদিন কেবল ভৈরবী ভাঁজবেন, তাঁর আসরে শ্রোতার সংখ্যা যে অবিলম্বে শূন্যে এসে ঠেকবে, তা নিঃসন্দেহ!

দুঃখের বিষয় কথাগুলো লেখায় যতটা সঙ্গত শোনাচ্ছে, কার্য্যত ততটা সুস্পষ্ট নয়। এমনকি ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্, শেলি, টেনিসন্ ইত্যাদির মতো প্রথম শ্রেণীর কবিরাও কাব্যে বিচিত্রতার মূল্য বোঝেন নি; তাঁরা কাব্যকে তাঁদের নির্ব্বিকার ব্যক্তিত্বের ভারবাহী-রূপে ব্যবহার করেছিলেন। ফলত উদ্দেশ্যে, আদর্শে ও অভিপ্রায়ে শেক্স্‌পীয়র-প্রমুখ নৈর্ব্যক্তিক কবিদের সমকক্ষ হয়েও তাঁরা সম্ভবত অমৃতলোকের বহিঃপ্রান্তেই থেমে আছেন, লোকোত্তরে পৌঁছতে পারেন নি। কিন্তু শিল্প-সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক-বিশেষণ নিয়ে অনেক বিবাদ বেধেছে। তাই এইখানেই জানিয়ে রাখা ভালো যে ওই শব্দের দ্বারা আমি কোনো অমানুষিক লক্ষণের আভাস দিচ্ছি না, শুধু সেই ধরণের শিল্প-সামগ্রীর কথা বলছি, যাতে লোকশিক্ষার চেয়ে লোকরঞ্জনের চেষ্টাই বেশি পরিস্ফুট। উদুগ্র ব্যক্তিবাদীদের সঙ্গে আমিও মানি যে কবি যখন মানুষ, সেকালে অন্যান্য মানুষের মতো কবির ভাবনা-বেদনাও তাঁর ক্রিয়াকলাপে

প্রকাশ পায়। তাহলেও এমন কাব্য আমি অনেক দেখেছি যার প্রবর্ত্তনা কবিপরিচিতি নয়, কেবল সৃষ্টি; এবং উদাহরণত "টেম্পেস্ট্"-নাটিকাটি উল্লেখযোগ্য। আমার বিবেচনায় সেখানি মুখ্যত নাটক হিসাবেই লিখিত; এবং তৎসত্ত্বেও শেক্স্পীয়র-এর তৎকালীন অভিজ্ঞতা যে সেই রচনায় জায়গা জোড়ে নি, এমন নিরুক্তি যদিও অবিশ্বাস্য, তবু এটা নিশ্চিত যে জ্ঞানত টেনিসন্-জীবনের প্রভাব কাটিয়েও "আইডিল্স্ অফ্ দি কিং" যে-ভাবে টেনিসন্-কে ধরিয়ে দেয়, প্রস্পেরো কখনো ঠিক ততখানি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। সে যাই হোক, অনুরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্তের কল্যাণে আজ এই ধারণা আমার মধ্যে বদ্ধমূল যে নৈরাত্ম্য আর বৈচিত্র্য অন্যোন্যনির্ভর; এবং যে-কবিতা নৈর্ব্যক্তিক নয়, তা অনেক সময়েই উপাদেয় বটে, কিন্তু তাতে অমৃতের আস্বাদ নেই।

অর্থাৎ ব্যক্তি সব সময়েই সীমাবদ্ধ, তার মজ্জায় মজ্জায় যত বিদ্রোহই থাকুক না কেন, স্থান-কালের দাসত্ব তার অবশ্যকর্ত্তব্য। উপরন্তু মনস্তাত্ত্বিক-দের কাছে শোনা যায় যে একটা ঐকান্তিক একাগ্রতা ছাড়া ব্যক্তিত্বের আর কোনো মানে নেই। ফলে নিজের ভিতর থেকে সাহিত্যিক বৈচিত্র্যের পথ্য-সংগ্রহ কবির সাধ্যাতীত; কাব্যকে সে যদি চিরন্তনের প্রকোষ্ঠে ওঠাতে চায়, তবে কেন্দ্রাপসারণ ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। অবশ্য বিশ্বও অমিত নয়; কিন্তু মানুষের শক্তির পরিমাণ এত নগণ্য যে এই সঙ্কীর্ণ জগৎই তার কাছে অনন্ত ঠেকে; ঘটনার ঘুরন্ত চাকার দিকে তাকালে, তার এমনি ঘোর লাগে যে একই ঘটনা বহু বার ফিরে আসছে কিনা, তা বোঝবার সামর্থ্য থাকে না। কাজেই যে-কবির বক্তব্য ব্যক্তিকে ছেড়ে বিশ্বের আশ্রয় নেয়, তার সাহিত্যে বৈচিত্র্যের পরিমাপ অপেক্ষাকৃত অধিক; এবং শ্রেষ্ঠ কাব্যের ব্যঞ্জনা যেহেতু বিষয়ের সঙ্গে দুশ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ, তাই এই জাতীয় বিশ্ববান্ধব মহাকবিদের রচনায় শিল্পপ্রকরণের কোনো গতানুগতিক আকার ধরা পড়ে না। যাঁরা মমত্ববোধকে কাব্যের যজ্ঞানলে আহুতি দিতে পেরেছেন, নিরর্থ প্রথাকে তুচ্ছ মনে করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। মহতের এতাদৃশ নিয়মঃজ্ঘনই রসিকসমাজে আর্ষপ্রয়োগ-নামে পরিচিত; এবং প্রাচীন গ্রীস্ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাচীন ভারত পর্য্যন্ত এই প্রয়োগ এক দিন যেমন প্রশ্রয় পেয়েছিলো, আধুনিক পশ্চিম থেকে সুরু ক'রে আধুনিক প্রাচ্য পর্য্যন্ত আজও তার তেমনি সমাদর।

আমার মতে রবীন্দ্রনাথও আর্ষপ্রয়োগক্ষম কবি; সেইজন্যেই তিনি আবাল্য কাব্যকে মুক্তির বিজন পথে তাড়িয়ে বেড়িয়েছেন। রবীন্দ্রকাব্যে প্রসঙ্গ-পদ্ধতির যে-অপূর্ব্ব সমন্বয় ধরা পড়ে, সেটা হয়তো খুব বড় কথা নয়; কারণ প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য কবিই তাঁদের প্রসঙ্গকে যে-পরিমাণে বিস্তৃত

করেন, পদ্ধতিকেও বদলান সেই অনুপাতে। রবীন্দ্রপ্রতিভার অত্যাশ্চর্য্য গুণ হচ্ছে তাঁর প্রণালীর অদ্ভুত অস্থৈর্য্য, তাঁর অশেষ পরিবর্ত্তন ও অনবতুল বৃদ্ধি। অপর প্রথম শ্রেণীর কবিদের রচনায় একটা সুনির্দ্দিষ্ট ধারা দেখা যায়; একটা সীমাবদ্ধ সরণী বেয়ে তাঁরা উৎকর্ষে ওঠেন; এবং একবার গন্তব্যে পৌছলে, তাঁদের আর কোনো দ্বিধা, দ্বন্দ্ব বা চাঞ্চল্য থাকে না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এই কঠিন সন্তোষ অবর্ত্তমান; তাঁর কাব্যের ক্ষিপ্র স্বভাব পূর্ণতা তথা কৈবল্যের পরিপন্থী। "মানসী"-র কৃতিত্ব অসামান্য; এবং শুধু সেই পুস্তকের জোরেই তিনি বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী সিংহাসন পেতেন। কিন্তু সে-প্রকরণ যখন "কল্পনা"-য় এসে ঠেকলো, তখন কবি হঠাৎ তাতে আগ্রহ হারালেন। তার পরের বই "ক্ষণিকা" যে-পরীক্ষার ফল, তাতে কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক কেন স্বেচ্ছায় হাত দেন, তা বোঝা শক্ত।

অবশ্য পিছনে চাইলে, আজ মনে হয় রবীন্দ্রসাহিত্যের রত্নাকরেও এই মধ্যমণিটির জোড়া নেই। কিন্তু যে-দিন তাঁর কলম দিয়ে "ক্ষণিকা"-র প্রথম কবিতা বেরিয়েছিলো, সে-দিন এমন প্রত্যয়ের কোনো কারণ ছিলো না, বরং বিপদের আশঙ্কা ছিলো সমূহ। তত দিন রবীন্দ্রনাথ কাব্যরচনার চিরাচরিত পথেই চলেছিলেন; এবং "কল্পনা" বন্ধ করার পরে পাঠকের কানে যে-ঝঙ্কার প্রতিধ্বনি তোলে, তা সংস্কৃতির ধ্রুপদ। এতাদৃশ কবির পক্ষে কৃষ্ণকলির কাঁকণের আওয়াজকে ছন্দে বাঁধার চেষ্টা শুধু দুঃসাহসিকতা। এই অগ্নি-পরীক্ষায় কেবল তিনিই এগোতে পারেন, যাঁর মনে অহমিকার পাপ নেই, যাঁর কাছে কাব্যের মঙ্গল আত্মকল্যাণের চেয়ে কাম্যতর। কিন্তু "ক্ষণিকা"-প্রণেতার মনোবিকলন এখানে অবান্তর। "ক্ষণিকা" যে-চিত্তবৃত্তি থেকেই জন্মাক না কেন, ওই পুস্তকপ্রকাশের পরে আর কোনো সন্দেহ রইলো না যে কাব্যের সঙ্গে ভাষাশুদ্ধির কোনো সহজ যোগ নাই। কিন্তু ছন্দ-সম্বন্ধে তখনো সংশয় ঘুচলো না। এ-কথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ছন্দ কখনো নিগড় হয়ে ওঠে নি, বেজেছে নূপুরের তালে। তাঁর কৈশোরিক কবিতার ছন্দশৈথিল্য যদিও অনবধানতাপ্রসূত, তবু "মানসী"-র "নিষ্ফল-ক্রন্দন"-এ কবি যে সজ্ঞানেই ছান্দসিকদের উপেক্ষা করেছিলেন, তা নিশ্চয়ই সর্ব্ববাদিসম্মত। অবশ্য তার পর বহু দিন পর্য্যন্ত তিনি এই স্বচ্ছন্দ ছন্দকে ভুলেছিলেন। তাহলেও ছন্দের গাণিতিক রূপ তাঁর কাছে কত তুচ্ছ, তার দৃষ্টান্ত হিসাবে "বর্ষশেষ"-এর মতো ঘনসম্বদ্ধ ধ্রুপদী কবিতার উপান্ত্য স্তবকটি উল্লেখযোগ্য।

এই স্বাধীনতা আর মুক্তচ্ছন্দের মধ্যে আকাশ-পাতালের ব্যবধান আছে, এবং এ-কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। তাই "গীতাঞ্জলি"-তে ভাষার প্রকৃতি-সম্বন্ধে গবেষণা চুকিয়ে "বলাকা"-য় তিনি ছন্দের স্বরূপ সন্ধানে নামলেন। "বলাকা"-য়

ছন্দ একেবারে বাঁধন ছিঁড়লো না বটে, কিন্তু সেখানে পুরোপুরি সংস্কারমুক্তি হয়তো বিপদই বাধাতো। কেননা "বলাকা"-র বিচরণ মর্ত্ত্যসীমার বাইরে, সেই নিরালম্ব লোকে অন্তত দূরাগত মহাকর্ষও না থাকলে, কবির জয়যাত্রা সহজেই মহাপ্রস্থানে থামতে পারতো। কিন্তু মিলের টান এবং পদক্ষেপের সমতা মেনেও, এ-ছন্দ এমন একটা ওজসের পরিচয় দিলে যার পরে আর সন্দেহ রইলো না যে স্বর্গবিজয়ের দিনে বাঙালী কবিকে আর অস্ত্রের জন্যে ভাবতে হবে না; এবং মানুষের যেগুলো উর্দ্ধগ আবেগ, সেগুলোর অভিব্যক্তিতে এই ছন্দ যে-রকম যোগ্যতা দেখিয়েছে, অন্যত্র, এমনকি ইংরেজী অমিত্রাক্ষর ছন্দেও, তার তুলনা নেই। গদ্যকে তফাতে রেখেও এ-ছন্দ স্বকীয় গতিভঙ্গিতে ও ধ্বনিগৌরবে এতই সংযত যে আবেগের হিল্লোল এর তলায় কখনো হারিয়ে যায় না। তাই ভাবপ্রধান কাব্যরচনায় এর ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী।

দুর্ভাগ্যবশত জগৎ কেবল ভাবের উপাদানে নির্ম্মিত নয়, তাতে বস্তুর দৌরাত্ম্যই সর্ব্বব্যাপী। এই রুক্ষ, অভব্য বস্তুতন্ত্রের পটভূমিতে "বলাকা"-র গম্ভীর শালীনতা কেমন যেন ব্যর্থ ঠেকে; মনে হয় এ-ইতরের সঙ্গে ঘর করার জন্যে দরকার এমন এক মুখরাকে যে অমর্য্যাদায় নুইবে না, অপমানের সুদ সুদ্ধ ফিরিয়ে দিতে পারবে। "পলাতকা"-য় রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় ছন্দ গড়লেন। এতে ছন্দের শেষ আড়ষ্টতাও ঘুচলো, ছন্দসম্পর্কিত কোনো পূর্ব্ব-সংস্কারই আর টিঁকলো না; সকল কৃত্রিমতা কাটিয়ে যতিস্থাপনা প্রায় অর্থানুসারেই চলতে লাগলো। মিল এখনো পরিত্যক্ত হলো না বটে, কিন্তু আভরণের বহর এতটা কমিয়ে আনা গেলো যে নিছক গদ্যের সহায়তা ছাড়া আর সংক্ষেপের সম্ভাবনা রইলো না। সে-পর্ব্বেরও আর দেরি ছিলো না। "পলাতকা" লেখার সময়ে সময়েই বিশুদ্ধ গদ্যে কবিতারচনা রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে বসেছিলো। সেগুলি বেরোলো "লিপিকা"-র প্রথমাংশে। তবে সে-পুস্তকপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়লো যে হর্বর্ট্ স্পেন্সর একেবারে মিথ্যা বলেন নি; অনেকেই যদিও ভুলক্রমে ভাবেন যে শিখিপুচ্ছধারী দাঁড়কাক আর ময়ূর এক, তবু গদ্যবেশী কাব্যকে তার যথার্থ উপাধি দিতে সকলেই নারাজ। কবির নিজের মনেও হয়তো এই বই-সম্বন্ধে দ্বিধা চোকে নি; কারণ তাঁর গ্রন্থাবলীর তালিকায় এর নাম গদ্যেরই পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু আকারে এবং জাতিবিচারে তাদের স্থান যেখানেই হোক, "পায়ে চলার পথ", "রাত্রি ও প্রভাত" ইত্যাদি লেখাগুলি যে-মুহূর্ত্তে চেঁচিয়ে পড়া যায়, তখনি তাদের কাব্যরূপ ফুটে ওঠে, রবীন্দ্রনাথের অপরাপর গদ্য-রচনার সঙ্গে তাদের প্রভেদ কত গভীর, তা আর ঢাকা থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ চির দিনই সব্যসাচী; এবং তাঁর গদ্য তাঁর পদ্যের কাছে যে-

হিসাবে ঋণী, তাঁর পদ্যও তাঁর গদ্যের কাছে সেই অনুপাতেই কৃতজ্ঞ। তাহলেও অন্যত্র, যেমন "ক্ষুধিত পাষাণ"-এ, কাব্যের অধিকাংশ উপকরণ ধার নিয়েও তাঁর গদ্য কাব্য-নামের যোগ্য নয়, খুব জোর শুধু কাব্যধর্মী; অথচ "লিপিকা" সজ্ঞানে সরলতার দিকে চ'লেও কাব্যগুণের অংশভাক; এবং এই অসাধ্যসাধন কী ক'রে সম্ভব, তা যদিও আমার জানা নেই, তবু "লিপিকা"-র একটা সুবিদিত বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবলে, হয়তো এই রহস্যের খানিকটা উদ্‌ঘাটিত হবে। সকলেই দেখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের গদ্য তাঁর পদ্যের মতোই উপমাবহুল, কিন্তু তাঁর গদ্যোপমার সঙ্গে তাঁর পদ্যোপমার কোনো মিল নেই। গদ্যে তিনি উপমাপ্রয়োগ করেন সাধারণত অর্থের খাতিরে, সেখানে উপমার সাহায্যে তাঁর বক্তব্য স্পষ্টতর। কিন্তু তাঁর কাব্যে উপমার উৎপত্তি ভাবসঙ্গতির প্রয়োজনে অথবা ধ্বনিমাধুর্যের তাগিদে। এ-জাতীয় উপমা তো অর্থাগমের সহায় নয় বটেই, এমনকি অনেক সময়ে প্রাঞ্জলতারও পরিপন্থী। তৎসত্ত্বেও এতে কাব্যের অনিষ্ট ঘটে না: কারণ কবিতাপাঠে যুক্তি হয়তো অনাবশ্যক, অপরিহার্য শুধু নিষ্ঠা। কাব্যে উপমার একমাত্র কর্তব্য পাঠকের নিষ্ঠাকে ডাক দেওয়া; এবং নিষ্ঠা যুক্তির আদেশে আসে না, আসে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের আকর্ষণে। তাই ব্রহ্মের নির্গুণতা-সম্বন্ধে শঙ্করভাষ্যই লিখিত হয়, পূজা পায় মনসা, শীতলা, তারকেশ্বরের মতো জাগ্রত দেবতা।

এই সনাতন সত্যের নির্দ্দেশেই আধুনিক বিজ্ঞাপন-বিশেষজ্ঞেরা বিজ্ঞাপন-চিত্রে বিজ্ঞাপিত বস্তুর স্থান ক্রমশই সংক্ষেপ ক'রে আনছেন। দেখা গেছে ছবিটি যদি দ্যোতনাপূর্ণ হয়, তবে পণ্যসামগ্রীর গুণকীর্ত্তন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন; কেননা সে-অবস্থায় তর্কের সুযোগ হারিয়ে দর্শকের মন কল্পনার দিকে ঝোঁকে; এবং তখন সে যে-দ্রব্যের নাম শোনে, তাকে আর সহজে ভুলতে পারে না। কবির উপমাব্যবহারও এই রকম; এবং "বলাকা"-র পক্ষধ্বনি শব্দময়ী অপ্সররমণীর অনুষঙ্গে বেশি পরিস্ফুট হওয়া দূরে থাকুক, বরং একেবারে লোপ পায়। কিন্তু ওই কথা-কটার যাদুতে পাঠক এমন তদ্‌গত চিত্তে ছবি আঁকতে বসে যে সঙ্গতি-অসঙ্গতির খোঁজ-খবর নেওয়া আর তার সাধ্যে কুলয় না। তখন হয় সে সমস্ত কবিতাটিকে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে, নচেৎ সজোরে আবেশ কাটিয়ে, মাথা নেড়ে বলে—একেবারে প্রলাপ। "লিপিকা"-র উপমা এই জাতীয় স্বপ্নময় উপমা; তার সার্থকতা অর্থগত নয়, চিত্রগত; এবং সাধারণ কবিতায় ছন্দ যেমন ধ্বনিসাম্য বজায় রেখে পাঠকের কাণ্ডজ্ঞানকে মোহজালে ঘিরে ফেলে, "লিপিকা"-য় তেমনি উপমা আলেখ্যের মায়াকাজল পরিয়ে তার তর্কপ্রবৃত্তিকে ঘুম পাড়ায়। সেইজন্যেই "লিপিকা"-র রূপ যাই হোক, কাব্যই তার স্বরূপ।

আমার বিচারে "লিপিকা" অমূল্য পুস্তক। তার কারণ শুধু এ নয় যে এত দিন পর্য্যন্ত বাংলা মুক্তচ্ছন্দের একমাত্র নিদর্শন কেবল এই গ্রন্থেই পাওয়া যেতো; অধিকন্তু প্রাকৃত বাংলার প্রভূত শক্তি ও যথার্থ সৌন্দর্য্য প্রথম এইখানেই আত্মপ্রকাশ করেছিলো। তৎসত্ত্বেও "লিপিকা"-র দুর্ব্বলতা নিতান্ত নগণ্য নয়; এবং সে-কবিতাগুলির প্রসঙ্গনির্ব্বাচনে কবি বেশ একটু শুচিবায়ুর পরিচয় দিয়েছিলেন। আমি জানি বিষয়ের উপরে প্রভূত্ব চলে না; সে আসে তার নিজের খেয়ালমতো; সময়ে সময়ে পৃথিবীপর্য্যটনেও তার সাক্ষাৎ মিলে না, আবার মাঝে মাঝে তার উৎপাতে স্নানাহারের অবকাশ সুদ্ধ ঘোচে। তাছাড়া রূপকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতন হলেও, তাঁর কাব্য মুখ্যত প্রেরণাপ্রসূত। কিন্তু এ-সমস্ত মনে রেখেও "লিপিকা"-র সম্বন্ধে নালিশ চোকে না, প্রশ্ন ওঠে—বিষয়ই যদি প্রথার গণ্ডি ছাড়াতে পারলে না, তবে ছন্দের জীবন্মুক্তি কি অসার্থক নয়? এবং এ-কথা না মেনে উপায় নেই যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের দিক থেকে ছন্দোবদ্ধ "পলাতকা" যে-উদারতা দেখিয়েছে, তার পাশে ছন্দোমুক্ত "লিপিকা" কেমন যেন সঙ্কীর্ণ। সুতরাং এই সিদ্ধান্তই অবশ্যগ্রাহ্য ঠেকে যে এই বইয়ের সাফল্য-সম্বন্ধে কবির নিজের মনেও দ্বিধা ছিলো; বাংলা কবিতার ছন্দোমুক্তি এত দূর পর্য্যন্ত সইবে কিনা, তা তিনি জানতেন না ব'লেই, "লিপিকা"-র কবিতাগুলিকে গদ্যাকারে ছেপেছিলেন, তার জন্যে এমন প্রসঙ্গ বেছেছিলেন যা সকল রকমে নির্গুণ হয়েও কেবল কৌলিন্যের জোরেই রসোত্তীর্ণ।

"লিপিকা"-র পরবর্ত্তী পুঁথি-কখানিতে এ-সন্দেহ বাড়ে। "শিশু ভোলানাথ", "প্রবাহিণী", "পূরবী", "মহুয়া" প্রভৃতিতে দেখি যে রসের দিক দিয়ে রবীন্দ্রপ্রতিভা যদিও শুধু এগিয়েই চলেছে, তবু প্রকরণ ও পরীক্ষার প্রতি কবির যেন আর দৃক্‌পাত নেই। তার মানে এ নয় যে বইগুলির কাব্যসম্ভার তুচ্ছ বা কলাকৌশল শিথিল, তার মানে শুধু এই যে সেগুলির রচনারীতি নবাবিষ্কৃত নয়, পুরাতন রীতিরই পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে-পথেই এগোন, তাঁর অব্যর্থ প্রয়াণ প্রায়ই অমৃতলোকের কাছে থামে; এবং উপরোক্ত পুস্তকগুলিতেও সে-নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ঘটে নি। তবে এই আভিজাতিক নন্দনে যাদের সন্দর্শন মিলে, তারা সকলেই উর্ব্বশীর গোত্রসম্ভূত, তাদের মুখে নিশ্চয়ই অনন্তযৌবনের অবিকার সৌন্দর্য্য বিদ্যমান, কিন্তু তাদের চোখে নেই অজানার অপার বিস্ময়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতো নিরুদ্দেশযাত্রী এই অচলায়তনের স্বপ্নস্বচ্ছ উৎকর্ষ বেশি দিন সইতে পারলেন না; তিনি আবার স্বেচ্ছায় স্বর্গ হতে বিদায় নিলেন। কিন্তু এ-বারে বোধহয় অমরাবতীর চক্ষু নিরশ্রু রইলো না, নিঃসঙ্গ হলো না কবির প্রত্যাবর্ত্তন;

স্বয়ং কবিতালক্ষ্মী তাঁর আকর্ষণে এই ধূলির ধরণীতে নেমে এলেন। অবশ্য দেবীর কণ্ঠে অভ্যস্ত মন্দারমাল্য নেই, মৃন্ময় দেহ নিঃসঙ্কোচে অদিব্য ছায়াপাত ক'রে চলেছে ; কিন্তু আমাদের মতো মোহান্ধেরাও তাঁর দিকে চেয়েই বুঝি যে বহিরঙ্গে সনাতন আড়ম্বর না থাকলেও, তাঁর অন্তরে আছে কাব্যের তন্মাত্র।

আমি এমন কথা বলছি না যে "পরিশেষ" ও "পুনশ্চ" রবীন্দ্রকাব্যের চূড়ান্ত। শুনেছি কবি পার্ব্বত্য প্রদেশ পছন্দ করেন না, তাঁর ভালো লাগে সমভূমির সার্ব্বত্রিক উর্ব্বরতা। এ-কথা যদি তাঁর রুচি-সম্বন্ধে নাও খাটে, তবু তাঁর সাহিত্যের সম্পর্কে উপমাটি খুব প্রযোজ্য ; সেখানে যে-উচ্চাবচতা দেখা যায়, তা অধিত্যকার বন্ধুরতা, শিখর-গহ্বরের উত্থান-পতন তাতে নেই। কিন্তু এ-সমস্ত স্বীকার ক'রেও এমন বিশ্বাসপোষণ অন্যায় নয় যে এই গ্রন্থ-দুখানিতে রবীন্দ্রনাথ ভাষা, ধ্বনি ও প্রসঙ্গের দিক দিয়ে যেখানে পৌঁছেছেন, তার পরে আর এগোনো অসম্ভব। সাত্ত্বিক কবিমাত্রেই গদ্য-পদ্যের বিবাদ মেটাতে চেয়েছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নি। এত দিন পরে রবীন্দ্রনাথের অধ্যবসায়ে হয়তো সে-বিরোধ ঘুচলো। যে-বিচিত্রতার প্রয়োজনে মহাকাব্য গীতিকবিতার কাছে হার মেনেছিলো, তার সিদ্ধি হয়তো এইখানে। কারণ এই প্রকাশভঙ্গি জীবনের মতোই পরিবর্ত্তনশীল, এর বিশ্বব্যাপ্তি বায়ুর অনুকারী, ক্ষুধায় এ সর্ব্বভুক অগ্নির তুল্য। কিন্তু সেইজন্যেই তার আসঙ্গ নিরাপদ নয় : চিত্রল পতঙ্গেরা তার দাহময় পরীক্ষায় পুড়ে মরে, যিনি অম্লান থাকেন, তিনি বসুধার দুহিতা সীতা ; এবং স্বরাজ্য মজ্জায় মজ্জায় না ছড়ালে, নৈরাজ্য অমঙ্গলপ্রসূ ; তাই ভয় পাই, তপস্যাকঠিন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেটা মোক্ষ, আমাদের ক্ষেত্রে তা হয়তো সর্ব্বনাশের সূত্রপাত।

ডি-এইচ্ লরেন্স্ ও ভর্জিনিয়া উল্ফ্

লরেন্স্-এর অকাল মৃত্যুর পরে তাঁর যে-উপাখ্যান-দুখানি বেরিয়েছে, তা প'ড়ে ভাবুকমাত্রেই শোক-অনুভব করবেন। লরেন্স্-এর মতো প্রতিভা সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব কালেই দুর্লভ ; অধিকন্তু সংস্কারপ্রধান ইংলণ্ডে ও-রকমের অনুসন্ধিৎসা গত দু শ বছরের মধ্যে দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। লরেন্স্-এর পিতা ছিলেন কয়লাখনির মজুর ; তাঁর মা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়ে ; এবং এমন দুটি বিসংবাদী প্রাণীর দাম্পত্যজীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলার অভাব অবশ্যম্ভাবী। এই অন্তর্বিরোধের মধ্যে জন্মে লরেন্স্ স্বভাবতই সমাজের প্রচলিত মূল্যগুলোকে সংশয়ের চক্ষে দেখেছিলেন। কিন্তু আজীবন অস্বাস্থ্যের ফলে তাঁর সংস্কারক-বৃত্তি কর্ম্মস্রোতে যোগ দিতে পারলে না, সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ প্রণালীতেই আটকে পড়লো। এই কারণে তাঁর সাহিত্যসাধনায় বিলাসিতার নাম-গন্ধ খুঁজে পাওয়া শক্ত ; এমনকি আসলে হয়তো তিনি সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস পান নি, একটা নূতন তত্ত্বদর্শন, একটা অভিনব মুক্তিমার্গই খুঁজেছেন। আজকের দিনে সাহিত্যিকেরা যখন সাহিত্যের স্বায়ত্তশাসন, সাহিত্যের নির্নিমিত্ত বিশুদ্ধতা-প্রমাণে বদ্ধপরিকর, তখন সাহিত্যের লৌকিক আদর্শ মনে রাখাই হয়তো যথেষ্ট কৃতিত্ব। তার উপরে যিনি কবিপ্রতিভায় ও লিপিচাতুর্য্যে লরেন্স্-এর সমকক্ষ হয়েও আপাতখ্যাতির পথ ছেড়ে তাঁর মতো সত্যের অপ্রিয় অন্বেষণে নামেন, তিনি অবশ্যই আমাদের নমস্য।

উপরন্তু তাঁর দার্শনিক মতামত নেহাৎ নগণ্য নয়। জীবনপ্রত্যূষেই লরেন্স্ বুঝতে পারেন যে তাঁর পিতা-মাতার মধ্যে কোনো দেহাতীত আকর্ষণ তো নেইই, এমনকি প্রণয়ব্যাপারে তাঁর নিজের বিতৃষ্ণা ও বৈফল্যের ইতিহাস জেনে মনে হয় যে-স্নেহবন্ধনে তিনি ও তাঁর মা অত নিবিড় ভাবে বিজড়িত ছিলেন, আধুনিক মনস্তত্ত্বে তারই নাম জননীগ্রন্থি। অতএব নিজের জীবনের শোকাবহ দুর্গতি দেখে লরেন্স্ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে মানবীয় সম্বন্ধের আসল ভিত্তি দেহ ; এবং সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহের অস্তিত্ব ভুলে মানুষ জগৎকে দুঃস্থ ও দুর্নীতিময় ক'রে তুলেছে। এ-বিশ্বাসের উপরে দাঁড়িয়ে ক্রিস্ট্যানিটি-র মতো আত্মাপ্রবণ ধর্ম্মের ও ক্রাইস্ট্-এর মতো অতনু দেবতার প্রত্যাখ্যান ছাড়া তাঁর উপায় ছিলো না ; এবং পাশ্চাত্ত্য সমাজ প্রকাশত বিষয়াসক্ত হলেও, তার অন্তরাত্মা যেহেতু এই বৈদেহী ভাবে আবিষ্ট, তাই কালে লরেন্স্-এর বৈনাশিক দিকটাই ফুটে ওঠে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যাঁদের আস্থা আছে, তাঁরাই লরেন্স্-এর সমর্থন

করবেন। কিন্তু ওয়টসন্, পাভ্লোভ্ ইত্যাদিকে উদ্‌ভ্রান্ত লাগলেও, লরেন্স্ আমাদের প্রণম্য। সংসার দেহপ্রধানই হোক আর আত্মাপ্রধানই হোক, দুই নৌকোয় পা দিয়ে জীবননদী পেরোনো সকলের মতেই অসম্ভব; এবং এ-সত্যকে আমরা যদিও বুদ্ধি দিয়ে মানি, তবু কার্য্যত একাগ্র নিষ্ঠা আজ আমাদের উপহাস জাগায়; শতমুখী, সহস্রাক্ষ হয়ে ওঠাই বর্ত্তমানের আদর্শ। এই নৈরাজ্যের যুগে, এই বিক্ষোভের মধ্যে অখণ্ডতা ও অবৈকল্য-সম্বন্ধে সতর্ক থাকাই এত বড় কথা যে লরেন্স্-এর দেহবাদে কান না পাতলেও, তাঁর দিব্যদৃষ্টির গুণ গাইতে আমরা বাধ্য। তবে অবৈকল্যের আদর্শ শুধু জীবনেই অবশ্যগ্রাহ্য নয়, সাহিত্যও সেই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত; এবং বক্তব্য ও উক্তির মধ্যে দ্বৈধ ধরা পড়লে, সাহিত্যসৃষ্টি তো অসম্পূর্ণ বটেই, এমনকি বক্তৃতাও অচল।

যুদ্ধের পর লরেন্স্-এর যে-বইগুলি বেরোয়, তার অধিকাংশ প'ড়ে স্বতই সন্দেহ জাগে যে তিনি বুঝি সাহিত্যের প্রাক্তন সংস্কার ভুলে গেছেন। তাঁর ইদানীন্তন পুস্তকে আবেগের অভাব নেই, ভাবুকতার প্রমাণও তাতে প্রচুর। কিন্তু উক্ত বইগুলির রূপপরিকল্পনার কোনো সার্থকতা পাঠকের কাছে ধরা দেয় না ব'লেই আমার বিশ্বাস। কাজেই যিনি নিছক আখ্যানবস্তুর লোভে লরেন্স্-এর বই খুলে বসেন, তর্কের বাহুল্যে তাঁর শ্বাসরোধ হয়ে আসে; এবং পবিত্র হিতৈষণার প্রত্যাশায় যিনি লরেন্স্-এর শরণ নেন, গল্পের অলি-গলিতে ঘুরে, তাঁর শিক্ষানুরাগ অচিরেই তর্কসূত্র হারিয়ে ফেলে। তৎ-সত্ত্বেও লরেন্স্-কে যে অপাঠ্য ঠেকে না, সেজন্যে তাঁর অত্যদ্ভুত লিপিদক্ষতা ও কবিপ্রতিভাই দায়ী। তাঁর উপন্যাস, এমনকি কবিতা-নামধেয় উচ্চণ্ড ভর্ৎসনার মাঝে মাঝে এই অনিকাম কাব্যানুপ্রেরণা গোবি-সাহারার বক্ষে অবচ্ছিন্ন মরুদ্যানের মতো; একবার সেখানে পৌঁছলে, পথকষ্ট তো মন থেকে মোছেই, উপরন্তু এগোলে আবার তেমন ভূস্বর্গের সাক্ষাৎ মিলতে পারে, এই মরীচিকার মোহে সেইখানে যাত্রাশেষ করাও দুঃসাধ্য।

তাহলেও সম্প্রতি লরেন্স্-প্রসঙ্গে আমার একটা ক্লান্তি জেগেছিলো। তাঁর লেখা থেকে আমার রূপপিপাসা মেটাবার আশা যখন প্রায় ছেড়ে দিয়ে-ছিলুম, এমন সময় হঠাৎ "দি ভর্জিন্ এণ্ড্ দি জিপ্সী"-র* আবির্ভাব হলো; এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলুম যে লরেন্স্-এর আর যাই অধঃপতন ঘটে থাকুক, রসসৃষ্টির শক্তিতে ভাঁটা লাগে নি। সে তো দূরের কথা, বরং মৃত্যুকে সন্নিকট জেনে তাঁর প্রাথমিক প্রতিভা এই ছোট বইখানির পাতায় পাতায় অমৃতের স্বাক্ষর রেখে গেছে। "দি ম্যান্ হু ডাইড্"† আরো পরের বই; কিন্তু এতেও

---

* The Virgin and the Gypsy—by D. H. Lawrence (Martin Secker).

† The Man Who Died—by D. H. Lawrence (Martin Secker).

পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতার অণুমাত্র হ্রাস দেখা যায় না। ফলে লরেন্স্-সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা আবার অসীমের কাছাকাছি পৌছেছে।

লরেন্স্ এই বই-দুখানিকে কোনো কষ্টে লিখে ফেলেছিলেন, ও-দুইটিকে ঘ'ষে, মেজে প্রকাশোপযোগী করার অবসর পান নি। তাই থেকে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে তিনি স্বভাবত মহাকবি; কিন্তু মানবের মঙ্গল তাঁর কাছে এত মূল্যবান ঠেকতো যে জনহিতার্থে সেই প্রাক্তন উৎকর্ষ ছাড়তে তাঁর বিন্দু-মাত্র আপত্তি ছিলো না। আমার বিশ্বাস স্বাভাবিক পথে চললে, লরেন্স্ ইংরেজী কাব্যের নবগ্রহের অন্যতম হতে পারতেন। তা না হয়ে আমাদের স্মৃতিপটে তিনি যে আজ কেবল উদ্দীপ্ত উল্কা-রূপে বিরাজমান, তার কারণ তিনি মৌল প্রেরণাকে দাবিয়ে আপনাকে সামাজিক কল্যাণের যূপে বলি দিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে সেই আত্মোৎসর্গের ফলে সংসারে আবার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য ফিরে আসবে। সে-আশা দুরাশা কিনা, তার বিচার এখনো সম্ভব নয়; কিন্তু এত বড় স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখে মিড্‌ল্‌টন্ মারি যদি তাঁকে ক্রাইস্ট্-এর সঙ্গে তুলনা ক'রে থাকেন, তবে সে-তুলনা নিশ্চয়ই সার্থক, তাতে অতিরঞ্জনের নাম-গন্ধ নেই।

লরেন্স্-এর শেষ বই-দুখানিকে রূপসৃষ্টি হিসাবে আমি তাঁর অন্যান্য বইয়ের উপরে স্থান দিচ্ছি ব'লে, এ-দুটি কেবল গল্প, এ-কথা ভাবা ভুল। গল্প বাস্তবপন্থী হওয়া দরকার কিনা, সে-প্রসঙ্গ এখনো তর্কাধীন; কিন্তু রূপসৃষ্টি আর রূপকথা যে এক নয়, তাও বোধহয় নিঃসন্দেহ। বিশুদ্ধ আর্ট হয়তো বিশুদ্ধ চৈতন্যের মতোই দুর্লভ। অন্ততপক্ষে প্রত্যেক প্রকৃত আর্টিস্ট্‌ই চেষ্টা করেছেন যাতে তাঁর সৃষ্টিতে একটা শিল্পোত্তর অর্থ, একটা রূপাতীত সঙ্গতি, একটা অনির্ব্বচনীয় সত্য ফুটে ওঠে; এবং কেবল মোনালিজা-র মুখভঙ্গিই রহস্যময় নয়, অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরীর হাসিও সমস্যামূলক। "দি ভর্জিন্ এণ্ড্ দি জিপ্‌সী" ও "দি ম্যান্ হু ডাইড্" বই-দুখানিতেও কথকতাই লরেন্স্-এর প্রকাশ্য উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু তাঁর আসল অভিপ্রায় সমস্যার সমাধান; এবং এ-মত যে আমার কপোলকল্পিত নয়, তার প্রমাণ মিলবে কাহিনী-দুটির বিশ্লেষণে। তবে বই-দুখানির অখ্যানবস্তু অত্যন্ত নির্ভার, এত বাহুল্যবর্জ্জিত, এত স্বচ্ছ যে তার সংক্ষেপসাধন প্রায় অসাধ্য।

প্রথমটি এক পরিমার্জ্জিত কুমারীর ইতিহাস। সভ্যতা-শিষ্টতার চাপে তার উদ্ভিন্ন জীবন যখন শুকিয়ে ঝ'রে যাবার দাখিল, এমন সময় এক অনাহূত জিপ্‌সীর আরণ্যিক আকর্ষণ তাকে মুক্তির খবর এনে দিলে। কিন্তু এমনি সঙ্কীর্ণ আমাদের সমাজ, এত বদ্ধমূল আমাদের কুসংস্কার যে মোক্ষের পথ উদ্‌ঘাট দেখেও আমরা পালাতে পারি না। সে-মেয়েটিও আমাদের সকলের

মতো তার মনের সঙ্কোচকে মূর্ত্ত ক'রে নিজের গারদ নিজেই আগলে বসলো। তবে তার অদৃষ্ট ছিলো ভালো। তাই আমাদের কপালে যা জোটে না, তার কপালে তাই ঘটলো। স্বয়ং প্রকৃতিদেবী এক দিন সংহারমূর্ত্তি ধ'রে তার কারাগারের খিল খুললেন; শীতের বরফ গ'লে, তাদের গ্রামের গোষ্পদ নদীতে এক দিন প্রলয়বন্যা ডাকলো। ভেসে গেলো তার পৈত্রিক ভিটা, তলিয়ে গেলো তার কাকভূষণ্ডি পিতামহী, হারিয়ে গেলো তার বাপের ফাঁকা হিতোপদেশ; সেই উদ্দাম বসন্তবন্যার মুক্তিস্নানে সনাতন মানবধর্ম্মে তার দীক্ষা শেষ হলো। চতুর্দ্দিক ডুবলো; জেগে রইলো তাঁর শয়নকক্ষ; সেখানে আয়োজনহীন বাসরে জিপ্‌সীর আলিঙ্গনে আপনাকে সঁপে, সে তার দেহকে চরম পরম ব'লে চিনলে।

"দি ম্যান্ হু ডাইড্"-বইখানির প্রতিপাদ্যও সমান। তবে এ-বারে জোর পড়েছে পুরুষের দিকটায়। লরেন্স্-এর শেষ বইখানির নায়ক স্বয়ং ক্রাইস্ট্, যিনি দেহকে সহজে মেনে নিলে, সত্যসত্যই স্বর্গের সিঁড়ি গড়তেন, কিন্তু দেহের দাবি না মিটিয়ে আমাদের নরকের পথ পরিষ্কার করেছেন। এই আখ্যায়িকায় ক্রাইস্ট্ কেবল উজ্জীবিত হয়ে জগতে ফিরলেন না, আত্মপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-মতের ভ্রান্তি-সম্বন্ধে পরিপূর্ণ চেতনাও সঙ্গে আনলেন। কিন্তু তখন পৃথিবী-পরিত্রাণের অমৃতযোগ অতীত; তখন তিনি তাঁর ধনপিপাসু আশ্রয়দাতার গলগ্রহ, মেরি মড্‌লিন্-এর সন্দেহভাজন, শিষ্যদের কাছে অনর্থের উপসর্গ-মাত্র; তখন তাঁর সামনে আশা নেই, এবং পশ্চাতে কেবল সুমেরু-প্রমাণ ভুল। ক্রাইস্ট্ বুঝলেন যে স্বদেশে তাঁর স্থান নেই; তাই তিনি মিসরে পাড়ি দিলেন, যেখানে মানুষ তার দেহকে অসম্মান দেখায় নি, যেখানে মানুষ প্রাক্‌পৌরাণিক প্রকৃতিকে ভক্তির রহস্যে ঢেকে রেখেছে। বেবোবার আগে মেরি মড্‌লিন্-দত্ত স্বর্ণ মুদ্রার বাকী কটার বিনিময়ে তাঁর আশ্রয়দাতার কাছ থেকে শৃঙ্খলিত মোদগটির মুক্তি কিনে তিনি অজ্ঞাতবাসে গেলেন। তাঁর তীর্থযাত্রা অপুরস্কৃত রইলো না; মিসরের এক অখ্যাত জনপদে আইসিস্-এর হোত্রীর কাছে বিতাড়িত নরনারায়ণ তাঁর স্বাধিকার ফিরে পেলেন; এবং যিনি সারা পশ্চিমে মরুর উষরতা ছড়িয়েছিলেন, সেই কুমারীর দেহস্পর্শে তিনি হয়ে উঠলেন উর্ব্বরতার দেবতা, কৃষির অধিষ্ঠাতা, আইসিস্-এর স্বামী ওসাইরিস্।

এ-রকম ক'রে বাদ-সাদ দিয়ে দেখলে, গল্প-দুটিকে নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যমূলক রূপক ব'লে লাগবে। এখানেও লরেন্স্ পূর্ব্বোক্ত অভিমতেরই প্রতিধ্বনি করেছেন যে বিদেহ জীবন নিরর্থ বিড়ম্বনা। কিন্তু সম্পূর্ণ বই-দুখানির শিল্প-কৌশল এমনি চতুর, আখ্যানভাগ এমনি মর্ম্মস্পর্শী, চরিত্রচিত্রণ এত সজীব, এত

অসন্দিগ্ধ, আবেগ এরূপ গভীর, এরূপ অখল যে প্রচারপ্রবৃত্তি অনায়াসেই কাব্যে পর্য্যবসিত হয়েছে। কথকতার স্বচ্ছ প্রাঞ্জলতা তর্কের আলোড়নে কোথাও আবিল নয়, লেখার মধ্যে পাঠককে ধর্ম্মান্তরে টানবার কোনো চেষ্টাই নেই; এবং সেইজন্যেই বোধহয় বই-দুখানি উপসংহারে পৌঁছবার অনেক আগেই বুঝতে পারি যে লেখক আমাদের কায়মনোবাক্য জুড়ে বসেছেন। একটি লাইনেও গুরুগিরির চোখরাঙানি ধরা পড়ে না; প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক শব্দ অনুকম্পায়ীর আবেদনে মুখর। তাই আমাদের বুদ্ধি লরেন্স্-কে মানুক বা না মানুক, আমাদের নিষ্ঠা নিশ্চয়ই তাঁর প্রাপ্য। এমনি ক'রে অনুমোদনের অপেক্ষা না রেখে অন্তরের তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলে এক কাব্য; এবং এই মন্ত্রসিদ্ধির পরিচয় লরেন্স্-এর রচনায় আমরা বার বার পাই। আজকের দিনে উক্ত প্রতিভা অত্যন্ত দুর্লভ; এবং গদ্য তো দূরের কথা, এমনকি কবিতাও আজ বিচারপন্থী। অতএব ঠিক এই দুর্দ্দিনে লরেন্স্-কে হারানো শুধু ইংলণ্ডের দুর্ভাগ্য নয়, তাতে সারা জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত।

তত্রাচ লরেন্স্ য়ুরোপের প্রতিভূ নন; এ-কালের ইংলণ্ডে জন্মালেও, তিনি প্রগতিবিদ্বেষী। যে-প্রতর্ক বর্ত্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য, সে-বৈনাশিকতায় তাঁর মন কখনো বিষিয়ে ওঠে নি, বিশ্বমানবের চিরকালীন সত্তাই তাঁকে পৃথিবী-প্রদক্ষিণে ডেকেছিলো। অর্থাৎ বুদ্ধির উপরে লরেন্স্-এর অভক্তি ছিলো বের্গ্সঁ-র চেয়েও গভীর; মহাসমরে বিধ্বস্ত হয়েও প্রবৃত্তি-সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ জাগে নি; তিনি আমরণ বিশ্বাস করেছিলেন যে পরীক্ষার মধ্যস্থতায় সত্যের সন্ধান মিলবে না, সেজন্যে স্বজ্ঞার অন্তঃপ্রেরণাই নান্যপন্থা। ফলত তাঁর রচনায় কল্পনা পরিকল্পনাকে ছাপিয়ে গেছে, উপাখ্যান উপদেশের কাছে হার মেনেছে, তাঁর অসামান্য কবিপ্রতিভাও তাঁকে অসংযম ও লিপিশৈথিল্য থেকে বাঁচাতে পারে নি। অবশ্য তাঁর অকপটতা তর্কাতীত; তিনি যুগরোগের যে-নিদান দিয়েছেন, তাও সম্ভবত নির্ভুল। তাহলেও, আমি যত দূর জানি, লরেন্স্ বস্তুবাদের জন্যে বিখ্যাত নন; এবং তাই বর্ত্তমান য়ুরোপ তাঁর পদলালিত্যেই মুগ্ধ, তাঁর অর্থগৌরবের মর্য্যাদা বোঝেন একমাত্র মিড্ল্টন্ মারি।

অতএব এ-দেশের বস্তুবিলাসীদের কাছে লরেন্স্-এর সাম্প্রতিক প্রতিপত্তি দুর্ব্বোধ্য। তবে কি জাতিগত চৈতন্য শুধু কথার কথা নয়? আমরা আসলে প্রকৃতিপরাংমুখ ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ ব'লেই কি প্যাট্মোর-এর চেয়ে রসেটি আমাদের বেশি টানে, ওয়েন্-কে ছেড়ে আমরা ব্রুক্-এর তর্জ্জমা করি, ফর্স্ট্-র বেঁচে থাকতে গল্স্ওয়র্দি-র জন্যে শোকাশ্রু মুছি? যদি আত্মসমাহিতিই আমাদের কাম্য, তবে বাংলা দেশে য়েট্স্-এর আলোচনা নেই কেন? যদি আমরা যাথার্থ্যই চাই, তবে জয়েস্-সম্বন্ধে নিরুৎসাহের কারণ কি? যন্ত্র-

সভ্যতার সাক্ষাৎ পরিচয়ে যদি আমাদের ভয় না থাকে, তবে আমরা অল্‌ডাস্‌ হক্স্‌লি-কে বাড়াই কোন্‌ অছিলায়? আমি যুগধর্ম্মের ভক্ত, প্রত্যেক সৎকবির রচনাই তাঁর পারিপার্শ্বিক দেশ ও কালের মুকুর, এই আমার বদ্ধ ধারণা; তাই আমাদের নব বিধানে আমি লরেন্স্‌-এর অনুকরণ দেখতে চাই না, আন্তরিক অনিবার্য্যতার সঙ্গে বুদ্ধির মহামিলনই আমার কাছে বেশি লোভনীয় ঠেকে। আমার বিবেচনায় এইটাই পাশ্চাত্ত্য ঐতিহ্যের সার কথা; এবং এই সংযোজনাশক্তির অভাবেই লরেন্স্‌ যেমন ইংরেজী সংস্কৃতির বহির্ভূক্ত, তেমনি এরই জোরে ভর্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ পশ্চিমী চিৎপ্রকর্ষের অন্যতম প্রতিনিধি।

অন্ততপক্ষে তাই জি-এম্‌ য়াং-এর মতো প্রাচীনপন্থী সমালোচকেরও মত; এবং যাঁরা শ্রীমতী উল্‌ফ্‌-এর "অর্লাণ্ডো"-নামক নৈর্ব্যক্তিক আত্মজীবনী পড়েছেন, তাঁরা ওই অদ্ভুত সিদ্ধান্তে সায় না দিয়ে পারবেন না। কিন্তু যে-কারণে লরেন্স্‌-এর অধিকাংশ উপাখ্যান আমার কাছে উপন্যাস হিসাবে অসহ্য ঠেকে, ঠিক সেই কারণেই শ্রীমতী উল্‌ফ্‌-এর শেষ পুস্তক "দি ওয়েভ্‌স্‌" * আমার শ্রদ্ধা জাগাতে পারে নি। অর্থাৎ এখানির রূপায়ণের সার্থকতা আমার বুদ্ধির অতীত; এবং প্রসঙ্গ ও পদ্ধতির এমনতর পার্থক্য শ্রীমতী উল্‌ফ্‌-এর লেখায় আর কখনো দেখি নি। অবশ্য সুরু থেকেই শ্রীমতী উল্‌ফ্‌ উপন্যাস-রচনায় বিধর্ম্মী; কিন্তু তাই ব'লেই তিনি রূপকারী বিবেকে বঞ্চিত নন। কথকতার ধ্রুপদী প্রণালী ছিলো একটা সুনির্দ্দিষ্ট, একটা পূর্ব্বকল্পিত চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে কতকগুলি পার্শ্বচরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা। উদাহরণত "ভ্যানিটি ফেয়ার"-এর নায়িকার নাম নেওয়া যায়; এবং বেকি শার্প্‌-এর জীবনে যদিও ঘটনাবৈচিত্র্যের অভাব নেই, তবু সে-সকল ঘটনা ঘটবার বহু আগেই পাঠক নিঃসন্দেহে জানে বেকি-র উপরে সেগুলির প্রতিক্রিয়া কী রকম হবে। সে-সব দৃশ্য নায়িকার সঙ্গে পাঠকের প্রাক্তন পরিচয় বাড়ায় না; বেকি স্কুল ছাড়ার পরে তার সম্বন্ধে আমাদের আর কোনো সংশয়ই থাকে না। পটভূমির সাহায্য ব্যতীত এমনি একটা জীবন্ত ছবি আঁকা অতি বড় কলাকৌশলের পরিচায়ক। কিন্তু শ্রীমতী উল্‌ফ্‌-এর চিত্রপদ্ধতিতেও নেহাৎ কম প্রতিভা নেই।

তাঁর শিল্প পোয়ঁ্যাতিলিস্‌ৎ-দের মত। তার মধ্যে রেখার নিশ্চয়তা নেই, আংশিক ভাবে দেখলে মনে হয়, তাতে বর্ণের অপচয়ও অমার্জ্জনীয়; কিন্তু শেষ বিন্দুটি যেই পড়ে অমনি একটা নবতর একটা পরিপূর্ণতর সঙ্গতি দর্শকের তাক লাগায়। হয়তো এর ফলেই শ্রীমতী উল্‌ফ্‌ আজও ঔপন্যাসিক আকাদেমিতে আসন পান নি; কিন্তু বেপরোয়া তরুণদের মজলিসে মর্য্যাদায় তিনিই সর্ব্বপ্রথম;

---

* The Waves—by Virginia Woolf (Hogarth Press).

এবং আধুনিক পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসে শ্রীমতী উল্ফ্-এর অপ্রতিহত প্রভাবকে তরুণিমার আতিশয্য ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যদিও সহজ, তবু এটা ভুললে চলবে না যে নিছক ফাঁকির উপরে সার্ব্বভৌম গুরুগিরির প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আসলে মানুষ পরিবর্ত্তনশীল ; ঘটনাকে আয়ত্তে আনা তার সাধ্যে তো কুলোয় না বটেই, এমনকি সমপর্য্যায়ের দুটো ঘটনার প্রতিঘাতও তার অন্তরে সমান নয়। অতএব নভেলকে যদি এই বিস্ময়ময় মনোজগতেই আটকে থাকতে হয়, তবে পাত্র-পাত্রীর পরিকল্পনায় স্থিতিস্থাপকতার অবকাশ রাখা বাঞ্ছনীয়, তবে মানা ভালো যে তারাও স্বায়ত্তশাসনে অধিকারী। এই মহামূল্য আবিষ্কারের জন্যে শ্রীমতী উল্ফ্ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন, এবং এরই কল্যাণে আজকে তাঁর আশ-পাশে চেলা-চামুণ্ডার এত ভিড়।

বলাই বাহুল্য অন্যান্য পন্থার মতো, এ-পন্থার পথিকেরাও কিছু সকলে গন্তব্যে পৌঁছয় না। অনেকেই মাঝ রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে, কেউ কেউ ঘন বনে পথ হারিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে, অপরে হয়তো স্বর্গের এলাকায় এসেও পেটুকতার পাপে প্রাণে মরে। কিন্তু নরক ঘুরেই হোক আর যেমন ক'রেই হোক, যে শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্যে উপনীত, তার অনুসরণে শুধু পুণ্য নেই, প্রসাদও মিলে প্রচুর। "মিসেস্ ডালোয়ে" প'ড়ে একটা এমনি পরিতৃপ্তি পেয়েছিলুম ; এবং নায়িকা আপনা থেকে সমাপ্তির সীমায় না দাঁড়ালে, তাকে ধরতে ছুঁতে পারি নি বটে ; কিন্তু বই বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাতে আমাতে যে-নিবিড় সৌহৃদ্য গ'ড়ে উঠেছিলো, তা কেবল তাদের মধ্যেই সম্ভব, যারা জন্মাবধি পাশাপাশি বেড়ে, শেষ কালে একদিন বার্দ্ধক্যের আরামকেদারায় গা ছড়িয়ে বসে। তখন জমে তাদের বিশ্রম্ভালাপ, জীবনের যে-ঘটনা এক সময়ে দুরূহ লেগেছিলো, যে-আচরণ এক সময়ে ব্যথা দিয়েছিলো, তখন সে-সব সরল, সহজ, কৌতুকপ্রদ ঠেকে। শুধু তাই নয়, এই যে-পরিণাম, এটাও সার্থক হয়ে ওঠে। তখন বুঝি এই যে-আরামকেদারায় উপবেশন, তা ক্লান্তিজনক নয় ; দিনের অবসানই এই বিরামের কারণ ; আর যাওয়ার পথ নেই ব'লেই থামা, আর বৃদ্ধির অবকাশ নেই ব'লেই ক্ষান্তি।

কিন্তু এই পদ্ধতির একটা অপরিহার্য্য লক্ষণ এর সঙ্কীর্ণতা। চৈতন্যধারাকে আতলস্বচ্ছ রাখতে হলে, তাতে খাল কেটে বাইরের জল আনা চলে না। উদ্বেল প্লাবনে তার ঊষর উপকূলের কাদাই বাড়ে, দু পাশে উর্ব্বরতা আসে না ; এবং এই প্রণালী দিয়ে লেখক যদি পাঠকের সমুদ্রসঙ্গমে ছুটতে চান, তবে তাঁর পক্ষে অবৈকল্য ও একনিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। এ-ধরণের উপন্যাসে চরিত্রের বাহুল্যও যেমন ভয়াবহ, দৃশ্যের অপর্য্যাপ্তিও তদ্রূপ। জয়েস্ এ-কথা বোঝেন নি ব'লেই, তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান "য়ুলিসিস্" সিদ্ধির সন্নিকর্ষে পৌঁছেও কেবল

ঔৎসুক্যময় পরীক্ষাতেই আবদ্ধ থেকে গেছে ; এবং এই ধ্রুবতারার নাম নিয়ে প্রুস্ৎ নিরুদ্দেশযাত্রায় বেরিয়েছিলেন ব'লেই, পাতাল ছুঁয়ে তিনি অবশেষে অমরাবতীতে পদার্পণ করেছেন। "মিসেস্ ডালোয়ে"-পাঠে আমার বিশ্বাস জন্মেছিলো যে শ্রীমতী উল্ফ্ একাগ্রতার আবশ্যিকতা-সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। "দি ওয়েভ্স্" প'ড়ে জেনেছি যে সে-ধারণা ভ্রান্ত। শ্রীমতী উল্ফ্-এর সকল বইয়ের মতো এখানির ভাষান্তর অসাধ্য। তবে "দি ওয়েভস্"-এর প্রসঙ্গ মোটের উপরে তিন জোড়া স্ত্রী-পুরুষের ইতিহাস।

তারা বেড়ে উঠেছিলো এক সঙ্গে, ভালোবেসেছিলো এক লোককে, এবং জীবনের মজ্জিতে তাদের এক যাত্রার ফল সম্পূর্ণ পৃথক হ'লেও, তারা তাদের স্ব স্ব মণ্ডলাকার অয়নে আমরণ আটকেছিলো কেবল পরস্পরের মহাকর্ষে। কিন্তু এই পর্য্যন্তই ; এই সওয়া-তিন-শ পাতার বইখানি তাদের সম্বন্ধে আর কোনো খবরসংগ্রহের পক্ষে অনুপযোগী। অথচ আত্মপ্রকাশই তাদের কাজ ; কারণ এই বিরাট্ বইখানির আগাগোড়ায় কোনো ঘটনা নেই, কোনো পরিবর্ত্তন নেই, ছয়টি বাধাবিহীন স্বগতোক্তির ধারা সমান বেগে পাশাপাশি ছুটে চলেছে। এই অনিবার, অবিকার, অনন্ত বাক্যস্রোতের মধ্যে বৈচিত্র্যের একমাত্র আভাস পাওয়া যায় পাত্র-পাত্রীদের পটভূমি থেকে। এই পটভূমি হচ্ছে উন্মুক্ত সমুদ্র এবং ঊষা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দিনের হ্রাস-বৃদ্ধিশীল আলোক। মানবচৈতন্যের ও মানবজীবনের প্রতীক হিসাবে পট-ভূমি খুবই সার্থক। কিন্তু এই অবিরাম শব্দতরঙ্গের ফলে পাঠকের মানসকর্ণে যে-প্রতিক্রিয়া ঘটে, সেটা প্রথমত যদিও সমুদ্রগর্জ্জনের মতোই শ্রবণসুভগ, তবু অল্প পরেই নিরর্থ অনুলাপের সামিল। বইখানিতে স্বরবৈচিত্র্যের এতই অভাব যে বক্তৃতাগুলির শিরনামায় বক্তার উপাধি লেখা না থাকলে, তাদের আলাদা ক'রে চেনা যেতো না, মনে হতো সমুদ্রই তাদের যথার্থ উপমান ; জলের মতো, এই চৈতন্যসিন্ধুতেও এক বিন্দুর সঙ্গে আরেক বিন্দুর কোনো প্রভেদ নেই।

সমালোচনার বহর দেখেই বোঝা যাবে যে পুস্তকটিকে অসুন্দর বা অপাঠ্য বলা আমার অভিপ্রেত নয়। বইখানির স্থানে স্থানে এমন বাক্যবিন্যাস, এমন বর্ণনাচাতুর্য্য, এমন অন্তর্দৃষ্টির ইসারা আছে, যা শ্রীমতী উল্ফ্-এর শ্রেষ্ঠ রচনায় তো অনায়াসে স্থান পেতে পারেই, এমনকি যা লিখে অতিবড় কবিও গৌরব বোধ করবেন। কিন্তু বইটির প্রেরণা এপিক্ নয়, লিরিক্ ; অর্থাৎ এই প্রসঙ্গে অসংখ্য প্রথম শ্রেণীর কবিতারচনা হয়তো সম্ভব, কিন্তু কোনো উৎকৃষ্ট উপন্যাস অভাবনীয়—বিশেষ ক'রে এমন উপন্যাস যার উদ্দেশ্য মানবীয় সম্বন্ধবন্ধনের বিশ্লেষণ। এই ধরণের উপন্যাসে বিষয়ীর চেয়ে বিষয়েরই

প্রধান্য বেশি, কর্ত্তার চেয়ে কর্ম্মই বড়, অব্যয় ছেড়ে নির্ভুল অন্বয় খোঁজাই প্রথম প্রয়োজন। কারণ প্রবর্ত্তনার বিচার যদি বা কোনো লোকোত্তর জগতে সার্থক হয়, তবু সংসারে মনুষ্যত্বের একমাত্র মাপকাঠি আমাদের আচরণ বা কর্ম্ম। বিড়ালতপস্বী কেবল সাহিত্যে নয়, ভূভারতেও নিন্দনীয়; এবং যিনি মনে মনে চুরির মৎলব এঁটেও কার্য্যত পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ ভাবেন, সমাজের কাছে তিনি চির দিনই সাধু। সুতরাং এক জনকে দশের পরিবেষ্টনে চিনতে চাইলে, তার চুলচেরা মনোবিকলন নিতান্ত বৃথা, তখন দ্রষ্টব্য তার ব্যবহার; এবং ব্যবহারকে বাদ দিয়ে কেবল মুখের কথায় একটা মানবসমষ্টির আভ্যন্তরিক সহযোগ ফুটিয়ে তোলা ভর্জিনিয়া উল্ফ্-এরও অসাধ্য।

অবশ্য আচরণবর্ণনা সাবেকী পন্থা; কিন্তু গন্তব্যই যেখানে একমাত্র কাম্য সেখানে পথ পুরাতন ব'লে আপত্তি তোলা চলে না, বরং সে-ক্ষেত্রে প্রাচীনেরই আদর বেশি। কেননা সেটাতেই আমরা অভ্যস্ত, এবং দিশারীর দেখাও সেটাতেই মিলে। এমন বিশ্বাসও পোষণীয় নয় যে পৃথিবীর বিখ্যাত ঔপন্যাসিকেরা উদ্ভাবনাশক্তির অভাবেই বাঁধা পথ ধরেছিলেন। নূতন আঙ্গিকের আবিষ্কার টল্স্টয়-এর পক্ষে নিশ্চয়ই সহজ ছিলো। তবুও যে তিনি সনাতন উপায়কেই মেনে নিয়েছিলেন, তার কারণ সম্ভবত এই যে তাঁর কাছে উপায়ন্তর বিপজ্জনক লেগেছিলো, তিনি বুঝেছিলেন যে পূর্ব্ব-গামীদের পদানুসরণ ভিন্ন অমৃতনিকেতনে পৌছনো যাবে না। কিন্তু "এ রুম্ অফ্ ওয়ন্স্ ওন্" যিনি লিখেছেন, তাঁকে এ-উপদেশ দেওয়া ধৃষ্টতা। হয়তো ছয়টি প্রাণীর সম্বন্ধসূত্রের গ্রন্থিমোচন "দি ওয়েভ্স্"-এর উদ্দেশ্যই নয়, তাব লক্ষ্য ছয়টি বিভিন্ন চৈতন্যের অন্তর্গূঢ় ঐকানির্দ্দেশ। তাহলেও বইখানিকে অবশ্যম্ভাবী বলা শক্ত; এবং যিনি নিছক পরস্মৈপদের সাহায্যে "দি ওয়েভ্স্"-এর একমাত্র জীবন্ত চরিত্র, পর্সিভ্যাল্-এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন, চৈতন্য-রূপ সূক্ষ্ম ব্যাপারে এই রকম অফুরন্ত বক্তৃতা তাঁর মুখে কেমন যেন বিসদৃশ শোনায়। আসলে শ্রীমতী ভর্জিনিয়া উল্ফ্ এত বড় আর্টিস্ট্ যে তাঁর কাছ থেকে কেবল সৌখিনী শিল্প পেয়ে আমরা খুশী নই।

ফরাসীর হার্দ্দ্য পরিবর্ত্তন

দেখছি ইংরেজের কাছে কাঞ্চন কামিনীর মতোই অস্পৃশ্য লাগছে। শোনা যাচ্ছে অ্যামেরিকা অবিলম্বেই যুদ্ধঋণের মায়া কাটাবে। অবশ্য ফরাসীরা এখনো ক্ষতিপূরণের আবদার ছাড়তে পারে নি; কিন্তু তাদের সাহিত্যে সম্প্রতি যে-বদল লক্ষ্য করেছি, তাকে, মহাত্মার পরিভাষায়, হার্দ্দ্য পরিবর্ত্তন বলাই উচিত। উত্তরসামরিক যুগ তবে কি সত্যই শেষ হলো? জানি এ-প্রশ্নের জবাবে রাজনীতিজ্ঞ আর ধনবিজ্ঞানীর মধ্যে তুমুল তর্ক বাধবে; এবং দুঃখবাদীরা হয়তো রুষের নবতন পঞ্চবার্ষিক উদ্যোগের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়বেন, আর বৈনাশিকেরা ব্যঙ্গভরে নেবেন মাঞ্চুকুয়োর নাম। তাহলেও আমার বিশ্বাস মন্বন্তরের পালা ফুরিয়েছে। কারণ স্কুলপাঠ্য ইতিহাস যাই লিখুক, কালের স্বরূপ কেবল যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষেই অভিব্যক্ত নয়; তার যথার্থ পরিচয় হয়তো আমাদের শিল্পে-সাহিত্যে, আমাদের বিজ্ঞানে-দর্শনে, আমাদের স্বপ্নে-সঙ্কল্পে।

যুগরূপের চিত্রাঙ্কনে ফরাসীরাই সম্ভবত সর্ব্বাপেক্ষা কৃতবিদ্য। অন্ততপক্ষে ফরাসীদেশে শিল্পবিষয়ক যত অভিজ্ঞানপত্রের উৎপাদন হয়েছে, অন্যত্র তার তুলনা নেই। উনিশ শতকের মৃত্যুঘোষণা করেছিলো ফরাসী প্রতীকী কবিরা, এবং বিংশ শতাব্দীর আগমনী গেয়েছিলো ভবিষ্যপ্রেমিক ফরাসী ফিউট্যুরিস্ট্। আজকালকার হিংস্র জাতীয়তার উদ্বোধন "লাক্‌সিয়ঁ ফ্রাঁসেজ্"-এর মধ্যস্থতায়; এবং সমরান্তরের প্রস্তাবনা ওই দেশেরই 'অতিবাস্তব' লেখকদের বিজ্ঞাপনে। এই স্যুর-রেয়ালিস্ং-নামক নব সম্প্রদায়ের পুরোধা ছিলেন পল্ মোরাঁ; এবং তাঁর "উভের লা ন্যুই" ও "ফের্মে লা ন্যুই"-উপাধি-ধারী দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্পপুস্তক-দুটি প্রসাদগুণের পরাকাষ্ঠা না দেখালেও, ঐতিহাসিক বিবরণ হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান। এই কাহিনীগুলির অভূত-পূর্ব্বতার সঠিক সমাচার দেওয়া শক্ত; কারণ সে-অসামঞ্জস্য কোনো মুদ্রাদোষ থেকে উদ্ভূত নয়, সে কেবল পারিপার্শ্বিক বিশৃঙ্খলারই প্রতিভাস। অবশ্য সেই প্রতিবিম্বনপ্রকরণে কতকটা স্বকীয়তা ছিলো; কিন্তু মোটের উপর তাও সিনেমাচিত্রপদ্ধতির অনুগামী। অর্থাৎ মোরাঁ-র চরিত্রচিত্রণে সুসঙ্গতির কোনো বালাই থাকতো না, উপাখ্যান রচিত হতো গোটাকয়েক বিশ্লিষ্ট ঘটনার পরম্পরায়। গল্পগুলির অন্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ভাষাগত: সে-ভাষা অনেকটা আধুনিক বাঙালী লেখকদের রচনারীতির মতো—স্বদেশী ব্যাকরণের প্রকৃতিবিরোধী এবং ইংরাজী শব্দকোষের অধমর্ণ।

এটা সম্ভবত তাঁর অক্সফোর্ড্-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষানবিসির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

তার পরে মোরাঁ তাঁর পুরানো বন্ধুদের ভাসিয়ে দিয়ে অসংখ্য গল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছেন। তাতে হয়তো তাঁর ধন-সম্পদ বেড়ে থাকবে; কিন্তু "ল বুদ্ধ ভিভাঁ"-র মতো এক-আধখানা রসোত্তীর্ণ উপন্যাস সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রাথমিক প্রসিদ্ধিকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি। প্রারম্ভে তাঁর রচনায় যে-ঔজ্জ্বল্যকে উপলব্ধির উদ্দীপ্তি ব'লে মনে হতো, ক্রমে অভ্যাস-দোষে তাকে ঝুটো জহরতের চাকচক্যের মতো লাগতে লাগলো; তাঁর নিরাসক্ত সমালোচনাশক্তি বহু ব্যবহারে হঠকারিতায় গিয়ে ঠেকলো; অতি-পরিচয়ের ফলে সেই বিশ্বব্যাপ্ত মনে কূপমণ্ডূকের লক্ষণ দেখা দিলো। এই অবস্থায় হঠাৎ এক দিন তাঁর "ফ্লেশ্ দোরিয়াঁ" * বেরোলো; এবং চমৎকৃত পাঠক উৎফুল্ল চিত্তে আবার স্বীকার করলে যে মোরাঁ-র আর যাই অধঃপতন ঘটুক না কেন, পশ্চিমের দিক্‌নিরূপকদের মধ্যে তিনি এখনো অগ্রগণ্য। স্বদেশী সমালোচকদের মতে বইখানি মোরাঁ-র শ্রেষ্ঠ রচনা; এবং এই অভি-মতকে নত শিরে মেনে নেওয়াই বিদেশীর পক্ষে নিরাপদ। তবু আমার মনে হয় কেবল সাহিত্য হিসাবে এর চেয়ে অনেক ভালো গল্প মোরাঁ ইতিপূর্ব্বে বানিয়েছেন। আসলে জাগ্রত কালজ্ঞানই বোধহয় পুস্তকখানির প্রধান গুণ।

"ফ্লেশ্ দোরিয়াঁ"-র আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এই: এক প্যারিস্‌প্রবাসী, পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন রুষ যুবক বন্ধুর সঙ্গে বাজি রেখে, বিমানযোগে বুদাপেস্তে কাভিয়ারে আনতে ছুটলো। ঘটনাক্রমে সে ফিরতি এয়ারোপ্লেন্ ধরতে পারলে না, এবং স্থানীয় বন্ধুদের উপরোধ এড়াতে না পেরে কয়েক দিনের জন্যে নৌকাবিহারে বেরোলো। শেষ রাত্রে এক জিপ্‌সীর মুখে স্বদেশের গান শুনে হঠাৎ তার মনে জাগলো মানসযাত্রী হংসের চাঞ্চল্য; এবং বন্ধুদের ফাঁকি দিয়ে, পত্নী-পরিবারের, বিষয়-সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে সেই শান্ত, শিষ্ট, সোভিয়েট্-বিদ্বেষী যুবকটি উধাও হয়ে গেলো তার মাতৃভূমির ভয়ঙ্কর নিরুদ্দেশে।

যাঁরা মোরাঁ-র পূর্ব্বতন রচনার সঙ্গে সুপরিচিত, তাঁরা হয়তো গল্পের সংক্ষেপে কোনো যুগান্তরকারী পরিবর্ত্তন দেখবেন না; এবং এটা নিশ্চয় যে কাহিনীর কাঠামোটি মোরাঁ-সাহিত্যে বার বার মেলে। "ল বুদ্ধ ভিভাঁ"-র রাজসিক নায়ক পৃথিবী ঘুরে অবশেষে কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্বদেশের স্বৈর সিংহাসনে নির্ব্বিবাদে চ'ড়ে বসলো; "লা মাজি নোয়ার"-এর নিগ্রো কুশী-লবেরা পাশ্চাত্ত্য

---

* Flèche d'Orient—par Paul Morand (Nouvelle Revue Française)

সভ্যতার চূড়ান্তে উঠে নিয়তির ঈষদ্ ইঙ্গিতেই স্বধর্মে প্রত্যাবর্ত্তন করলে; এবং "ফ্লেশ্ দোরিয়াঁ"-র দিমিত্রি-ও দেশের আকর্ষণে সমাজ-স্বজন জলাঞ্জলি দিলে। এর মধ্যে বৈচিত্র্য কোথায়? কিন্তু "ফ্লেশ্ দোরিয়াঁ"-র সঙ্গে তার পূর্ব্ববর্ত্তীদের একটা বংশানুক্রমিক যোগ থাকলেও, আলোচ্য পুস্তকখানি যে-মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আজ অবধি মোরাঁ-র সকল নায়ক-নায়িকারই পা পিছ্‌লেছে শুধু বাহ্য প্রবর্ত্তনায়। হয় প্রবঞ্চনার দুঃসহ ধাক্কা, নয় পরিবেষ্টনের দুর্নিবার বিকার, এই ছিলো প্রকৃতির প্রতিহিংসাতর্পণের দুটিমাত্র উপায়।

কিন্তু দিমিত্রি-র ক্ষেত্রে তেমন কিছুই ঘটলো না। তার স্ত্রীর, তার স্বাচ্ছন্দ্যের, তার সম্পত্তির সম্মোহন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অপ্রতিহত রইলো। কেবল মাহেন্দ্র লগ্নে সে বুঝলে যে শুচিগ্রস্ত সঙ্কীর্ণতার মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ অসম্ভব; তার জন্যে চাই মুক্তি, দিগন্তবিস্তৃত মুক্তি; তার জন্যে চাই গ্রহণ, বিঘ্ন-বিপদ, মালিন্য-কুশ্রীতা, দৈন্য-দুঃস্বপ্ন, সকলকে সাদরে গ্রহণ। আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের সজ্ঞান কৃত্রিমতার মধ্যে এই উপলব্ধি এমনি অপ্রত্যাশিত, এতই রোমাঞ্চকর যে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর পুস্তকও আমাদের অভিনন্দনের যোগ্য। রূপস্রষ্টা হিসাবে মোরাঁ-র কীর্ত্তি এখনো হয়তো মহার্ঘ্য নয়; তাহলেও তাঁকে যেহেতু আমি পশ্চিমাকাশের বায়ুবিদ যন্ত্র ব'লে মানি, তাই তাঁর পূর্ব্বমুখী তীরের নির্দ্দেশ দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সে-অঞ্চলের হাওয়া বদলেছে।

আঁদ্রে মোরোয়া একজন ইংরেজ লেখককে য়ুরোপের জরের কাঠি ব'লে আখ্যা দিয়েছেন। উপরন্তু তিনি নিজে জু, এবং এরা আন্তর্জ্জাতিক ধরণ-ধারণের জন্যেই বিখ্যাত। সেই কারণেই তার শেষ উপন্যাস "ল সের্ক্ল্ দ ফামি"-র* মতো নিখুঁৎ বইয়ের নাম নিয়ে এই প্রবন্ধ সুরু করি নি। কিন্তু সাম্প্রতিক য়ুরোপীয় সভ্যতার মোরাঁ-প্রমুখ প্রতিনিধিদের থেকে শিক্ষা-সংস্কারে পৃথক হ'লেও, মোরোয়া এ-কালের আধি-ব্যাধির সংক্রমণ এড়াতে পারেন নি। তাঁর হীরকতুল্য রচনারীতির মধ্যেও বৈদেশিকতার দোষ বিদ্যমান; এবং ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রবল পক্ষপাতে আধুনিক উদ্বাস্তুদের নিরুদ্দিষ্ট চঙ্ক্রমণই প্রতিবিম্বিত। তাঁর কল্পনাপ্রবণ চরিতাবলীর নায়কনির্ব্বাচন আমাদের বিপরীত খেয়ালের পরিচায়ক; এবং নিজের সম্বন্ধে তাঁর বাগ্মিতা বর্ত্তমান আত্মশ্লাঘার অভিজ্ঞান। তিনি শেলি-কে বাঁচিয়ে তোলেন তার প্রচ্ছন্ন সামান্যতা ফোটানোর জন্যে, এবং ডিজ্রেলি-র ছবি

---

* Le Cercle de Famille—par André Maurois (Grasset).

আঁকেন তার অভাবনীয় উন্নতিতে রমণীদের করকৌশল দেখাবার উদ্দেশ্যে। তবে মসিচিত্র-ত্বটোর মধ্যে তফাৎ এই যে আলেখ্যকার শেলির-চরিত্রে মহত্ত্বের লেশমাত্র খুঁজে পান না, কিন্তু ডিজ্রেলি-র নাটকী দিকটা তাঁর শ্রদ্ধাকর্ষণে সমর্থ।

তথাপি নিছক ধ্বংসোন্মাদনায় মোরোয়া সমসাময়িকদের সমকক্ষ নন; এবং তার কারণ হয়তো এই যে আজকে স্বজাতির ঐতিহ্য লুপ্তপ্রায় ব'লে, তিনি ঐতিহ্যশূন্যতার সমূহ বিপদ অন্তরে অন্তরে বুঝেছেন; কিম্বা বিশ্বব্যাপী প্রলয়কে আলোকিত করতে চাইলে, যে-পরিমাণ আতসবাজি দরকার, তা তাঁর ঘরে নেই। কিন্তু কারণ যাই হোক, অন্তত উপন্যাসরচনায় মোরোয়া বরাবরই ফরাসীদের মহান আদর্শের অনুগত। অবশ্য এত দিন ধ'রে তিনি যত বই ছাপিয়েছেন, তাতে উক্ত আদর্শের অস্তিত্ব শুধু অভাবের দ্বারাই বিজ্ঞাপিত; কিন্তু "ল সের্ক্ল্ দ ফামি" পড়লে, আমরা মানতে বাধ্য যে সত্যই সবুরে মেওয়া ফলে। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বই মোরোয়া নিজে তো পূর্ব্বে লেখেন নিই, এমনকি অপরেও সম্প্রতি লিখেছেন কিনা সন্দেহ।

বইখানির মধ্যমণি নায়িকা দেনিস্। কিন্তু তার ছবিটি রেখার এমন খুঁটি-নাটিতে প্রাণবন্ত যে গল্পের চুম্বক দেওয়াও তুরূহ ব্যাপার। তবু আখ্যায়িকার সূত্র এইরূপ: দেনিস্ অল্প বয়সেই জানতে পারে যে তার মায়ের কাছে উদ্বাহবন্ধন নেহাৎ নগণ্য। এই অভিজ্ঞতা, মায়ের স্বার্থপর ঔদাস্য, পিতার তুঃখ ও পারিবারিক কলঙ্ক রটার দরুন সামাজিক নিগ্রহ, এই কটা কারণে সে মাকে শত্রু-রূপে দেখতে শেখে, এবং পণ করে যে তার নিজের জীবনে এই জঘন্য ইতিহাসের পুনরভিনয় ঘটবে না। কিন্তু যুদ্ধকালীন ভাববিলাসের যূপে সে দেহকে বলিদান দেয়; অথচ যে-অপাত্রের হাতে সে আপনাকে সঁপে, সে-ক্ষুদ্রমনা তার প্রেমের চেয়ে গুরুজনদের আজ্ঞাপালনকেই শ্রেয়স্কর ভাবে। তার পরে দয়াবতী দেনিস্ এক প্রসিদ্ধ ধনিকপুত্রের পাণিগ্রহণ করে, এবং অবিলম্বেই বোঝে যে প্রেমের অভাব করুণায় মেটে না। অতএব সেও অবৈধ প্রণয়ের কুহকে মজে; এবং প্রথম পদচ্যুতির চিত্তবিক্ষোভে তার বুদ্ধি-ভ্রংশের উপক্রম হয় বটে, কিন্তু ক্রমে তার উচ্ছৃঙ্খলতার খবর চার দিকে এমনি ছড়িয়ে পড়ে যে তার মা সুদ্ধ তাকে কথা শোনাতে আসেন। মায়ের এই অমার্জ্জনীয় প্রগল্ভতা সুরুতে তার অসহ্য লাগলেও, দেনিস্ অচিরে প্রমাণ পায় যে তার মেয়েরাও তার সম্বন্ধে অনুকারী বৈরিভাব পুষছে। ফলে তার অভিসার অর্দ্ধ পথে থামে; এবং পিতার মৃত্যুর পরে তার মা পূর্ব্বপ্রেমিকের সঙ্গে যে-নূতন সংসার পেতেছিলেন, সেই সংসারে দেনিস্ প্রায় ষোলো বৎসর বাদে প্রথম ঢোকে।

বলা বাহুল্য এই ধরণের উপন্যাস আজ আর বড় একটা দেখা যায় না।

এর বিপুল আকার, এর মন্থর গতি, এর চরিত্রচিত্রণের ব্যাপকতা, এর সাবেকী বস্তুনিষ্ঠা, এ-সমস্তের মধ্যেই একটা বাল্‌জাকী ভাব আছে। এমনকি উপন্যাসটি হয়তো নীতিমূলক। অবশ্য সাহিত্যের ওই গুণটি আজ আমাদের সন্দেহ জাগায়; এবং সেইজন্যে বিশুদ্ধ আর্ট্‌সেবীদের জানিয়ে রাখা ভালো যে মোরোয়া-র নীতি মোহমুদ্গর-জাতীয় নয়, পরিপূর্ণ শিল্পদৃষ্টিতেই তার জন্ম। প্রকৃত শিল্পী নিজের অভিজ্ঞার প্রতিকৃতি গ'ড়েই খুশী নয়, সে চায় ওই অভিজ্ঞতার রূপায়ণ। কারণ রূপই প্রকাশের একমাত্র প্রণালী, তার ঘটকালি-ব্যতিরেকে একের অনুভূতি দশের কাছে, দশের উপলব্ধি দেশের কাছে পৌঁছয় না। কাজেই স্বকীয় ভাবকে রূপ দেওয়ার মানেই হচ্ছে তাকে রসে উত্তীর্ণ করা, অর্থাৎ তার মধ্যে যেটুকু সার্বিক তাই ছেঁটে নিয়ে, বাকীটুকুর পরিবর্জ্জন। এইখানেই নীতির সঙ্গে রূপের যোগ; এবং রূপের মতো নীতিরও কর্ত্তব্য এককে ছেড়ে বহুর বরণ, ব্যক্তির উপরে সংঘের উপস্থাপন, বিশেষ থেকে সাধারণে গমন।

মোরোয়া এই নিরীহ রকমের নীতিকার। তাঁর মধ্যে গুরুগিরির অপ্রমাণ অহঙ্কার তো নেইই, এমনকি কতকগুলো দৃশ্যে,—বিশেষত প্রণয়ঘটিত ব্যাপারের বিবরণে, তাঁর নির্লিপ্ত নৈর্ব্যক্তিক স্তাঁদাল্‌-কে স্মরণে আনে; এবং এই রক্ষাকবচের গুণেই তিনি ফরাসী দেশের আধুনিক মন্ত্রদাতা জীদ্‌-এর প্রভাবমুক্ত। জীদ্‌-এর নায়ক-নায়িকারা সংসারবিরত, সমাজাতিরিক্ত; আত্মার গূঢ় বৈশিষ্ট্যকে পরিব্যক্ত করার জন্যে তারা হয়তো নরহত্যায় সুদ্ধ পশ্চাৎপদ নয়; তাদের ধ্রুব বিশ্বাস মুক্তির পরাকাষ্ঠা সকলকে ছেড়ে নিঃসহায়, নিরুপায় ভাবে আত্মস্থ হওয়া, তারা ভাবে যে ব্রহ্মসাযুজ্যও মূলে একটা অনুভূতিমাত্র, একটা বেদনা, একটা সম্ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়; এবং সেইজন্যে তারা বিকার-বিক্ষোভকেও বাদ দেয় না, তাদের লুব্ধ ব্যক্তিতা জীবনের প্রত্যেক স্তরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গবেষণা করে। কয়েক বিষয়ে জীদ্‌-এর সঙ্গে পুরানো গ্রীক্‌দের ঐক্য দেখা গেলেও, এই মনোভাব যে ধ্রুপদী আদর্শের পরিপন্থী, তা বলা অনাবশ্যক। গ্রীকদের কাছে ব্যক্তিত্বের বাড়াবাড়ি বিপজ্জনক ঠেকতো; এবং বিশ্বাত্মিক উপলব্ধিকে আধ্যাত্মিকের উপরে বসানোই ছিলো তাদের ধ্যান-ধারণার সূত্র-সিদ্ধান্ত। হয়তো পশ্চিমে আবার সেই উদাত্ত মন্ত্রের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। অন্ততপক্ষে দেনিস্‌-এর পারিবারিক চক্রে পুনরাগমনের প্রবর্ত্তনা যে তাই, সে-বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।

এ-প্রসঙ্গে ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক্‌-এর "ল ন্যু দ ভিপের"-কে* প্রামাণ্য মনে

---

* Le Nœud de Vipères—par François Mauriac (Grasset).

করা সঙ্গত কিনা সন্দেহ। মোরিয়াক্ প্রথম থেকেই ক্যাথলিক্ লেখকদের অন্যতম ; এবং তাই আমি তাঁর সঙ্গে সুপরিচিত নই। যত দূর জানি, তিনিও পল্ ক্লোদেল্-এর মতো সাহিত্যসৃষ্টিকে ভগবৎসেবার উপলক্ষ্য ব'লে ভাবেন ; এবং তাঁর মতেও খৃষ্টোক্ত সদাচারপদ্ধতিই মোক্ষলাভের অনন্য পন্থা। শুনেছি তৎসত্ত্বেও তিনি পোপ্-এর অনুমোদন পান নি। কারণ মোরিয়াক্-এর বিশ্বাস যে যাজকের আশীর্ব্বাদ-ব্যতিরেকেও সদ্‌গতি সম্ভব ; সেজন্যে খৃষ্টের প্রতি অচলা ভক্তি যথেষ্ট, এবং তাও যদি দুঃসাধ্য হয়, তবে বাইবেল্-বর্ণিত একটা যে-কোনো গুণ আশ্রয় করলেই, আমরা অজ্ঞান-সজ্ঞান সমস্ত পাপ ত'রে যাবো।

খৃষ্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তর্ক-বিতর্কে বিধর্ম্মীর মন স্বতই উদাসীন, স্বভাবতই নির্ব্বাক। অতএব ওই প্রসঙ্গই আলোচ্য উপন্যাসের ভিত্তি কিনা, তার বিচার স্থগিত রেখে বইখানি থেকে বরং আমার নিজের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপকরণ জোগাই। কিন্তু উপক্রমণিকাতেই বলা বিধেয় যে লেখকের ধর্ম্ম যাই হোক, তার ফলে আখ্যানস্রোতে কোনো আবিলতা আসে নি। একদেশদর্শিতা তো দূরের কথা, "ল ন্য দ ভিপের"-এর ঘনসন্নদ্ধ সৌন্দর্য্যব্যূহে মোটের উপরে কোনো অবান্তর মতামত ঢোকে নি। মোটের উপরে বললুম এই কারণে যে পুস্তকখানির শেষ ত্রিশ পাতা-সম্বন্ধে আপত্তি উঠতে পারে ; হয়তো এই পরিশিষ্টটা নিখাদ সাহিত্যের তাগিদে পরিকল্পিত নয়। কিন্তু এ নিয়ে বাক্যব্যয় অশোভন ; কেননা উক্ত ক্রোড়পত্রের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও, গ্রন্থখানিতে যে-রস, যে-পরিপূর্ণতা আছে, তাতে, অন্তত আমার বিবেচনায়, "ল ন্য দ ভিপের" অমর-জাতীয়।

এ-প্রশংসা হয়তো অতিরঞ্জিত ; এবং সেইজন্যেই কাহিনীটির পুনরাবৃত্তি করতে ভয় পাচ্ছি। চুম্বকে তার উৎকর্ষ ধরা পড়বে না ; কারণ অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর শিল্পসম্পদের মতো এ-গল্পেও বাহুল্য একেবারেই নেই। এর রূপান্তর তো অভাবনীয় বটেই, এমনকি ভাষান্তরও বোধহয় অসাধ্য। তাছাড়া বইখানি ঘটনাভূয়িষ্ঠ নয়, নিটোল, নিবিড় গীতিকবিতার মতো আবেগপ্রধান। তবু তার আখ্যানভাগ এইরূপ : এক ধনাঢ্য কৃষকপুত্র সঙ্কীর্ণ পল্লীসমাজের ঈর্ধ্যা-অবজ্ঞায় বিষিয়ে হঠাৎ এক অভিজাত খাতকের মেয়েকে পত্নী-রূপে পেলে। এই প্রতিলোম কুটুম্বিতায় তার নিজের মায়ের সম্মতি ছিলো না। কিন্তু তিনি পুত্রের উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটাবেন না ব'লে স'রে দাঁড়ালেন ; এবং সত্যই দেখা গেলো এই বর্ব্বর, হিংস্রস্বভাব যুবকটির অন্তরাত্মা প্রেমের আরতিদীপে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠেছে। এক মাধবী পূর্ণিমার রাত্রে সে স্ত্রীকে প্রাগ্‌বৈবাহিক জীবনের কথা শুধিয়ে জানলে যে একটি সম্রান্ত, সুদর্শন যুবকের সঙ্গে ইজা-র (অর্থাৎ তার স্ত্রীর) বিয়ের কথা চলছিলো, কিন্তু ইজা-র দুই ভাই যক্ষ্মারোগে

মারা যাওয়াতে, পাত্র-পাত্রীর একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও, বরপক্ষের অনুমতি মেলে নি।

ইজা অবশ্য মুখে বললে যে সে-সম্বন্ধ ভাঙাতে সে মোটেই দুঃখিত নয়, নচেৎ এমন স্বামী সে পেতো কী ক'রে? কিন্তু সে-কথা নায়কের কাছে বিশ্বাস্য ঠেকলো না, তার মনে পড়লো যে সে যে-দিন প্রথমে ইজা-র অধরস্পর্শ করে, সে-দিন ইজা-র কান্না সহজে থামে নি। আত্মগরিমায় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে সে-দিন সে ভেবেছিলো সে-অশ্রু বুঝি প্রেমাশ্রু; কিন্তু আজ আর তার সন্দেহ রইলো না যে সে-ক্রন্দন প্রাকৃত অনুরাগের স্মৃতিতর্পণ। চৈতী জ্যোৎস্না তার চোখে অমাবস্যার চেয়েও কালো লাগলো; পার্শ্ববর্ত্তিনী আর তার মাঝে সহসা জাগলো অনন্ত ব্যবধান; যুগ-যুগান্তরের যত বিসংবাদ, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যত ট্র্যাজেডি নিমেষমধ্যে তার বক্ষে নেমে এলো জগদ্দলের মতো। সে পণ করলে এই প্রবঞ্চনার দাদ তুলবে। তাই ইজা আস্তিক ব'লে, সে নাস্তিক হলো; ইজা শিষ্টাচারী ব'লে, সে অত্যাচারের আশ্রয় নিলে; ইজা সন্তান-বৎসল ব'লে, সে পুত্র-কন্যাদের তফাতে রাখলে। সমস্ত সংযম ঘুচতে তার কৃষকী কৃপণতা বীভৎস ও বিভীষণ মূর্ত্তিতে দেখা দিলে।

অদৃষ্টও তার সঙ্গে শত্রুতাচরণ করতে ছাড়লে না। অতি পরিশ্রমে তার স্বাস্থ্য ভাঙলো। সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যে-মেয়েটি পিতাকে নির্ভয়ে ভালোবেসেছিলো, গ্রাম্য চিকিৎসকের অজ্ঞতায় তার ঘটলো অকাল মৃত্যু। এক ক্ষণিকার সংস্পর্শে তার আন্তর জীবনে কিছু দিনের জন্যে মাধুর্য্য এলো; কিন্তু সন্তানসম্ভবা হওয়াতে তাকেও আর কাছে রাখা গেলো না। ইজা-র স্বর্গগত বিদ্রোহী ভগ্নীর একমাত্র পুত্রকে অবলম্বন ক'রে সে তার অসীম ক্ষুধা মিটাতে চাইলে; কিন্তু যুদ্ধ এ-ছেলেটিকেও বাদ দিলে না। বার্দ্ধক্য তাকে পেড়ে ফেল্‌লে; মৃত্যুর অগ্রদূত বারে বারে প্রভুর আগমনবার্ত্তা জানিয়ে গেলো। যে-অর্থের লোভে ইজা তার পাণিগ্রহণ করেছিলো, সেই উত্তরাধিকার থেকে ইজা ও ইজা-র সন্তানদের সে বঞ্চিত করবে, এই ছিলো তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাই মুমূর্ষু অবস্থাতেও, তার প্রণয়িণীর কনীনপুত্রের সন্ধানে সে ছুটলো প্যারিসে। কিন্তু এখানেও বিধি বাদ সাধলেন। বৃদ্ধের পরিবারবর্গের তর্জ্জন-গর্জ্জনে সে-অপদার্থ ভয় পেয়ে তাদের চক্রান্তের উপলক্ষ জোগালে; এবং ইজা-র জন্যে অন্য শাস্তি উদ্ভাবিত হবার পূর্ব্বেই, বৃদ্ধের সমস্ত জল্পনা-কল্পনাকে উড়িয়ে পুড়িয়ে, ইজা গেলো মারা।

বৃদ্ধের অসমাপ্ত জীবনের ভারকেন্দ্র পলকে ভেঙে পড়লো; অভিব্যাপ্ত সর্ব্বনাশের মধ্যে সে বুঝলে যে সে সঞ্চয়ের লোভে কার্পণ্য দেখায় নি, উৎপীড়নের লালসায় ইজা-কে পথে বসাতে যায় নি, বিদ্বেষের তাড়নায় সংসার-

বিমুখ হয় নি। সে চেয়েছিলো ইজা-র অখণ্ড হৃদয়, ইজা-র পরিপূর্ণ অনুকম্পা; ইজা-কে সহকর্ম্মী-রূপে চিনেই তার আকাঙ্ক্ষা মেটে নি, সে দাবি করেছিলো ইজা-র সর্ব্বমুখী সহধর্ম্মিতা। কিন্তু তার সহজ প্রত্যাশার দিকে ইজা ফিরেও তাকায় নি; তাই যত দ্বন্দ্ব, তাই তার সঙ্কল্প যে তার মৃত্যুর পরে ইজা যখন দলিল-দস্তখৎ খুঁজতে আসবে, তখন সে-সব কিছুই পাবে না, পাবে কেবল তার ব্যর্থ জীবনের ব্যথিত ইতিহাস। কিন্তু এখন? এখন হিংসার আঘাতেও ইজা-র বিমুখতা ঘুচবে না; তার প্রভূত সম্পত্তি এখন আর প্রহরণ নয়, কেবল ভার, কেবল বিড়ম্বনা। সে তৎক্ষণাৎ উকিল ডাকিয়ে নিজের যথাসর্ব্বস্ব ছেলে-মেয়েদের লিখে দিলে। ফলে তারা হয়তো বৃদ্ধকে পাগল ভাবলে, কিন্তু তার নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে জীবনের পরম অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সে বুঝলে সকলের আনন্দ-বেদনার মধ্যে অনাত্ম ভাবে বাঁচাই একমাত্র বাঁচা। তাই লব্ধকাম পুত্র-কন্যারা তার সদ্যজাগ্রত স্নেহ-সমবেদনাকে যখন নিতে পারলে না, তখনো সে টললো না; আজন্মের বিবাদ মিটিয়ে, ভগবানের সঙ্গে মৈত্রী পাতিয়ে, অনাবশ্যক আত্মজীবনী লিখতে লিখতে ভবলীলা সংবরণ করলে।

এই হ্রস্বীকরণ মুখ্যত আমার অক্ষমতারই পরিচয় দেবে, কিন্তু এর থেকেও বোঝা যাবে যে "ল ন্য দ ভিপের"-এর সঙ্গে আজকালকার উপন্যাসের প্রভেদ প্রকৃতিগত। যে-সপ্রতিভ নিষ্কারুণ্য, যে-বক্রোক্তিপূর্ণ দীর্ঘসূত্রতা, যে-অতিচেতন ইন্দ্রিয়নিষ্ঠা আধুনিক কথাসাহিত্যের অপরিহার্য্য উপাদান, মোরিয়াক্-এর রচনায় সে-সমস্ত চির দিনই অবর্ত্তমান। সুতরাং আলোচ্য পুস্তকের পুরাকালীন গাম্ভীর্য্যে বিস্ময়প্রকাশ হয়তো নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে-খৃষ্টানী ধার্ম্মিকতা তাঁর আখ্যানাবলীর সনাতন লক্ষণ, এখানে তার অভাব সত্যিই চমকপ্রদ। তবে পূর্ব্বেই বলেছি যে একটা অহৈতুক অধ্যাত্ম চিন্তা বইখানির শেষ কয়েক পাতাকে একটু অবান্তর ক'রে তুলেছে। কিন্তু এই অংশের অনুপ্রেরণাও বোধহয় রোমপ্রসূত নয়, গ্রীসজাত। গল্পটি উত্তম পুরুষে লিখিত হওয়ায়, তার মধ্যে খৃষ্টীয় চরমোক্তির ইঙ্গিত দেখা সহজ। কিন্তু প্রতিপক্ষে এটাও স্মরণীয় যে নায়ক আমরণ অননুতপ্ত, তার মনোভাবে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যীশুকথিত দীনতার লেশমাত্র ধরা পড়ে না, যা ফুটে ওঠে, তা খৃষ্টীয় চিত্তবৃত্তিনিরোধের উল্‌টো গুণ, অর্থাৎ চিত্তের দ্বারমুক্তি, বিষকুণ্ডলীর ব্যবচ্ছেদ। অন্তকালে বৃদ্ধ ভগবানকে পেলে বটে, কিন্তু সে-পাওয়া পরিত্যাগের মধ্যে দিয়ে নয়, পরিগ্রহণের মধ্যে দিয়ে; তার পারমার্থিক সার্থকতার সীমান্তে নির্ব্বাণের রহস্য নেই, আছে মনুষ্যধর্ম্মের রহস্য।

অবশ্য আমি জানি যে মাত্র তিনখানা বইয়ের সাহায্যে অর্দ্ধেক পৃথিবীর

হার্দ্দ্য পরিবর্ত্তনপ্রমাণের চেষ্টা দুঃসাহসেরই নামান্তর। উপরন্তু শিল্প-সাহিত্যকে ইতিবৃত্তের মর্য্যাদা দান আমার বিবেকে বাধে। কিন্তু সাহিত্য যতই নৈর্ব্যক্তিক হোক, তাকে আমি লোকোত্তর ভাবি না। তার মধ্যে জীবনের অবিকল প্রতিমূর্ত্তির সাক্ষাৎলাভ যেমন অসম্ভব, সে-দর্পণে সমাজের দ্বিরায়তনিক ছায়াপাতও তেমনি স্বাভাবিক। অতএব আমি যদি আমার অনুমিতির পক্ষ থেকে কৈবল্যের দাবি না করি, তবে সিদ্ধান্তের সত্যতা-নিরূপণে এই তিনজন ভিন্নস্তর ও ভিন্নরুচি লেখকের সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

উইলিয়ম্ ফক্‌নর

আমি সাহিত্যে জঙ্গমতার পক্ষপাতী। মানবসত্য যদিও মূলত সনাতন, তবু তার বিকাশ যুগে-যুগান্তরেও না বদ্‌লালে, যেটা একদিন প্রবর্ত্তনা-রূপে আসে, অবশেষে সেটা পরিণত হয় অন্ধ অভ্যাসে। সকল সাহিত্যস্রষ্টাই এ-কথা পাকে-প্রকারে মেনে নিয়েছেন। সেইজন্যেই গ্রীক্ ট্র্যাজেডির ঐক্যত্রয় শেক্স্‌পীয়র-এর সমর্থন পায় নি, এবং রাসীন্ এলিজাবেথী নাটকের অসংহত উচ্ছ্বাসকে ভয়ের চক্ষে দেখেছিলেন। সেইজন্যেই ডিফো, স্টর্ন্, ও ফিল্ডিং-এর আখ্যানসাহিত্য স্কট্, ডিকেন্স্, থ্যাকরে-কে অন্তঃপ্রেরণা জোগাতে পারে নি, এবং আধুনিকেরা ভিক্টোরীয় ঔপন্যাসিকদের এড়িয়ে চলেন। কিন্তু পরিবর্ত্তন শুধু পরিবর্ত্তন হিসাবেই শ্রদ্ধেয় নয়; তার পিছনে নিত্যের তাগিদ থাকলে, তবেই তা গ্রাহ্য। সুতরাং এমন মন্তব্যে অত্যুক্তি নেই যে সাহিত্যে রূপ যে-কাজ করে, সমাজে সেই প্রয়োজন মেটায় টাকা। অর্থাৎ মূল্য যেমন চিরন্তন, মুদ্রা তেমনি ক্ষণস্থায়ী; এবং মুদ্রা যেহেতু মূল্যেরই প্রতিভূ, তাই কালক্রমে কিম্বা জালিযাতের কৃপায় তার প্রতিনিধিত্বে ঘুণ ধরলেই, আমরা তাকে ছাড়তে বাধ্য, নচেৎ তার আকারে-প্রকারে বড় একটা ইতর-বিশেষ ঘটে না।

দুঃখের বিষয়, আমাদের সমসাময়িক লেখকেরা এ-কথাটা প্রায়ই ভুলে যান। হয়তো ধনিকতন্ত্রের যুগে, যখন মুদ্রা মূল্যের অগ্রগণ্য, তখন রূপ ও রসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার অসম্ভব। হয়তো বের্গস্‌-র পরিণামী তত্ত্ববিদ্যায় প্রাচীনপন্থী দার্শনিকেরা যত ছিদ্র খুঁজে পেয়েছেন, তার অধিকাংশই কাল্পনিক। হয়তো——। কিন্তু কারণসন্ধান এ-ক্ষেত্রে অসার্থক; কারণ যাই হোক না কেন, এটা নিশ্চয় যে পাউণ্ড্, জয়েস্, এলিয়ট্ ইত্যাদির মতো প্রকৃত শিল্পীরাও মাঝে মধ্যে পরিবর্ত্তনকে শুধু পরিবর্ত্তন হিসাবেই প্রশ্রয় দেন, স্টাইন্, ম্যাক্‌লাইশ্, কামিংস্ প্রভৃতি বাগ্‌জীবনেরা কেবল উদ্‌ভটতার কল্যাণেই কবিপ্রতিভার অংশীদার হয়ে ওঠেন, এবং হক্স্‌লি-র মতো নকলনবিস স্রেফ ভেকবদলের ক্ষিপ্রতায় অর্জ্জন করেন ভাবস্বকীয়তার খ্যাতি। স্ট্রেচি-র ভাষায় অষ্টাদশ শতকের স্থাপত্যশিল্প দেখি ব'লে, তাঁর অপূর্ব্ব মৌলিকতা আজ অস্বীকৃত; ফর্স্টর-এর নিববদ্য উপন্যাসগুলি যেহেতু অধুনাতনী অস্ত-ব্যস্ততার ধার ধারে না, তাই তাঁকে আর আমরা পুছি না; য়েট্‌স্-এর কবিতায় শাশ্বত সত্যের স্বাক্ষর থাকায় তাঁর বিস্ময়াবহ সদ্যতা ও সজীবতা আমাদের দৃষ্টির অগোচর।

শেষোক্ত তিন মহারথীর বিষয়ে যা বললুম, তার পরে এমন বিশ্বাস পোষণীয় নয় যে এঁদের দিগ্বিজয় চিরপরিচিত পথেই আবদ্ধ। বরং উল্টোটাই বেশি সত্য; এবং মানবমনের এমন দিক খুব কমই আছে যার ভৌগোলিক বৃত্তান্ত এঁদের লেখায় লিপিবদ্ধ নেই। এ-কথা ভাবলেও, ভুল হবে যে পদ্ধতির চেয়ে প্রসঙ্গের প্রতিই এঁদের নজর বেশি, অথবা কলাসৃষ্টিতে এঁরা যতখানি পারদর্শী, কলাকৌশলে ততখানি সিদ্ধহস্ত নন। গোয়েটে-র পরবর্ত্তী প্রত্যেক সাত্ত্বিক সাহিত্যিকই শিল্প ও স্বভাবের প্রকৃতিগত প্রভেদ বুঝে এসেছেন; এবং উক্ত তিন লেখক এই মূলগত পার্থক্য যে কেবল নীরবে মেনে নিয়েছেন, তা নয়, কলা ও কৌশলের দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ নিয়েও এঁরা বাগ্বিস্তার করেছেন যথেষ্ট। তাহলেও শিল্পপ্রকরণ-প্রসঙ্গে এঁদের তিন জনের মতামত সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে মেলে না। প্রথম থেকেই এঁদের রচনায় একটা স্থৈর্য্য দেখা গেছে, যা আধুনিক সাহিত্যে দুর্লভ; এবং পরীক্ষায় যদিও এঁরা সতত প্রস্তুত, তবু এঁরা মুহূর্ত্তের জন্যেও ভোলেন নি যে পরীক্ষা শুধু তখনই সার্থক, যখন তার সাহায্যে একটা অবিনশ্বর ও অবিকল শিল্পসামগ্রীর সন্ধান মেলে। বহু পরিবর্ত্তনের মধ্যেও এঁরা এই আর্য্যসত্যের প্রতি আস্থা রেখেছেন যে রূপ ও রসের অবিভাজ্য সামঞ্জস্যই সাহিত্য-নামে অভিহিত। তাই এঁদের পদ্ধতি সব সময়ে হয়তো কালোপযোগী নয়; কিন্তু প্রসঙ্গের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গিসম্পর্ক সদাসর্ব্বদা অটুট।

ফক্‌নর-এর মতো অত্যাধুনিক লেখকের আলোচনায় উক্ত ধ্রুবপদী সাহিত্যিকত্রয়ের উল্লেখ নিশ্চয়ই অবান্তর। কিন্তু লেখার ঝোঁকে ওই তিন জনের নাম কলমের মুখে দৈবাৎ জুটে গেলো ব'লেই, আমি ওঁদের বিষয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি নি; অনেক ভেবে-চিন্তে, তবে ওঁদের এই প্রবন্ধে নামিয়েছি। কারণ ওঁরা যদিও প্রায় সকল রকমেই পরস্পর ও ফক্‌নর-এর থেকে আলাদা, তবু একটা অতিপ্রয়োজনীয় দিকে ওঁদের সঙ্গে বর্ত্তমান লেখকের সাদৃশ্য আছে। সে-সাদৃশ্য রূপজ্ঞানে। প্রথম প্রকাশিত রচনা থেকেই ওঁরা প্রত্যেকে রূপ-সম্বন্ধে যে-নির্ব্বিকল্প মনোভাব দেখিয়েছেন, তার জোড়া ইদানীন্তন সাহিত্যিকদের মধ্যে মাত্র ফক্‌নর-এর উপাখ্যানেই আমি পেয়েছি। তার মানে এ নয় যে সাধনায় বা সিদ্ধিতে ফক্‌নর ওঁদের সমকক্ষ; তার মানে শুধু এই যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাঁচখানা উপন্যাস ও তেরোটা গল্প ছেপেও ফক্‌নর তাঁর সমসাময়িকদের মতো কোনো অমার্জ্জনীয় মুদ্রাদোষের আভাস দেন নি; এবং পরীক্ষায় তাঁর উৎসাহ অপরিমেয় বটে, কিন্তু ঔপন্যাসিকের আত্মকৃত্য যে রোমাঞ্চসঞ্চার নয়, কথকতা, তা তিনি একবারও ভোলেন নি। ফলে তাঁর অনেক লেখাই অনেক সময়ে কষ্টপাঠ্য

লেগেছে, অথচ কোনোটাই কখনো অনাবশ্যক ঠেকে নি; মাঝে মাঝে ভেবেছি যে তাঁর ধরণ-ধারণ অপ্রত্যাশিত রকম জটিল, তবু বই ফুরোতে বুঝেছি যে ঠিক সেই রসটি অভ্যস্ত প্রণালীতে ধরা পড়তো না; বহু স্থানে বহু পূর্ব্বসূরীর প্রভাব তাঁর উপরে এসে পড়েছে, কিন্তু অবশেষে মানতেই হয়েছে যে আধুনিক রুচিসম্মত আদর্শের অনুকরণে তাঁর স্বাতন্ত্র্য কমে নি, বরং বেড়েছে। যত হাল আমলী শিল্পপ্রকরণ নিয়েই তিনি পরীক্ষা করুন না কেন, তবু ফকনর সর্ব্বদা মনে রেখেছেন যে ঔপন্যাসিকের মুখ্য কর্ত্তব্য তার চরিত্রাবলীর প্রতি; তারা জীবন্ত, এবং জীবনে উৎকটতার স্থান থাকলেও, উদ্ভটতা একেবারেই অচল।

হয়তো প্রশংসা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো। কিন্তু আমি ফকনর-এর দোষ-সম্বন্ধে অচেতন নই। তাঁর রচনার প্রধান ত্রুটি প্রত্যক্ষতার অভাব; এবং আধুনিক নভেলের যেটা মুখ্য দৌর্ব্বল্য, অর্থাৎ অবাস্তরতা, তার আকর্ষণ ফকনর গোড়া থেকেই এড়িয়ে চলেছেন বটে, কিন্তু জোরালো কথাকে ঘোরালো উপায়ে বলার শিশুসুলভ অভ্যাস তিনি এখনো কাটিয়ে ওঠেন নি। অবশ্য এই পরোক্ষ পদ্ধতির সমর্থনে ধ্রুপদী নজির আওড়ানো শক্ত নয়। গ্রীক্ নাট্যকারেরাও সাধারণত তাঁদের ট্র্যাজেডির দুর্ঘটনাগুলোকে রঙ্গমঞ্চে ঢুকতে দিতেন না, বিপদাপদের ফলাফল দর্শকদের জানাতেন সাক্ষীর জবানিতে; এবং ইব্‌সেন্-এর নাটক যে-দুর্ব্বিপাকের পটভূমিকায় আশ্রিত, তা ততটা দৃষ্টিগোচর নয়, যতটা অনুমেয়। কিন্তু নাটকে এই কৌশল খাটে ব'লেই, উপন্যাসে এর প্রবেশাধিকার নেই; এবং প্রসঙ্গত এ-কথাও এখানে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে সাহিত্যের নাটকাদি প্রাচীনতর অঙ্গগুলো সঙ্কীর্ণ না হলে, মানুষ কখনো উপন্যাস লিখতো না। সুতরাং নব বিধানেও যদি সঙ্গতি ও সক্রিয়তার সমীকরণ আমাদের সাধ্যে না কুলয়, তবে উপন্যাসের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ-আপত্তির জবাব এই যে ফকনর-এর গল্পগুলির জন্ম এমন সব পঙ্ককুণ্ডে যে অত্যাধুনিক সমাজেও সে-বিষয়ে স্পষ্টভাষণ অসম্ভব; এবং দৃষ্টান্ত হিসাবে 'স্যাংটুয়ারি'-বইখানি উল্লেখযোগ্য। তার পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে, ভব্যতা কোন্ ছার, সভ্যতার সম্পর্কও এত শিথিল যে তাদের কার্য্যকলাপের সোজা বর্ণনা একেবারে অচল; এবং এই চরিত্রগুলি সম্বন্ধে যা সত্য, ফকনর-এর অন্যান্য কুশী-লবদের বেলাও তা প্রযোজ্য।

ফকনর-এর দ্বিতীয় ত্রুটি এই বীভৎসরসের আধিক্য। যত দূর মনে পড়ে, তাঁর গল্প-উপন্যাসে সচ্চরিত্র লোকের সংখ্যা প্রায় শূন্য; এবং তাঁর গ্রন্থাবলী তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলে, এমন দু-এক জন মানুষ নিশ্চয়ই পাওয়া যায় বটে যারা নিঃস্বার্থ আদর্শের সঙ্গে একেবারে অপরিচিত নয়, কিন্তু তারাও

সাধারণ স্তরের বহু নিম্নে, তাদের অধিকাংশই হয় পাগল, নয় অসুস্থ, সকলেই অক্ষম ও উৎকেন্দ্রিক। অবশ্য এ-অভিযোগেরও উত্তর আছে; এবং ফক্‌নর অনায়াসেই বলতে পারেন যে ঔপন্যাসিকমাত্রেই যেহেতু সামান্যকে ছেড়ে, বিশেষকে নিয়ে ব্যস্ত, তাই তিনি পাহাড়ে না চ'ড়ে খাতেই ঘুরে বেড়ালে, তাঁর জীবনবেদের প্রতি কটাক্ষ করা অনুচিত। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধগমন আর অধঃপতনের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই, দুটোই সমভূমি থেকে সমান দূরে; এবং উপরে উঠলে, যদি বাস্তব জগতের সম্বন্ধসূত্র না ছেঁড়ে, তবে নীচে নামলেও, সে-বন্ধন অটুট থাকবে। তাছাড়া আধুনিক মনোবিজ্ঞান অপ্রাকৃতকে আমল দেয় না; বিশেষজ্ঞদের বিবেচনায় বিকৃতিই মনের ধর্ম্ম। অতএব ব্যক্তিবিশেষ যখন প্রকৃতিস্থ-বিশেষণের যোগ্য, তখন প্রশংসাটা তার অন্তঃপ্রকৃতির প্রাপ্য নয়, তার বহিঃপ্রকৃতিই অনিন্দ্য। অর্থাৎ তখন এটাই বক্তব্য যে মানসিক বিশৃঙ্খলায় সে সর্ব্বসাধারণের সমকক্ষ হলেও, তার পারিপার্শ্বিক শৃঙ্খলা এমনি সুপ্রতিষ্ঠিত যে সে অভ্যন্তরীণ অশান্তি-প্রকাশের অবকাশই পায় না।

উপরন্তু ফক্‌নর-এর নাট্যোলিখিত ব্যক্তিগণ যে-নটমঞ্চে আসীন, সেখানে সমাজবন্ধন প্রায় অবিদ্যমান। মার্কিনী যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাপথে স্থৈর্য্যের দেখা পাওয়া যায় না। নব ভূভাগে সিতাসিতের সংঘর্ষ বোধহয় ওই অঞ্চলেই প্রথম বাধে; দক্ষিণী চাষবাসের সুবিধার জন্যই সারা পশ্চিমে দাসপ্রথা চলে; ভ্রাতৃবিরোধ অ্যামেরিকার ওই দিকটাকেই কুরুক্ষেত্রের সমপর্য্যায়ে ফেলে; এবং ওইটাই লিঞ্চিঙের জন্মভূমি। মার্কিনী প্রগতির জয়ধ্বজা উত্তরাভিমুখী; সে-দেশের নাগরিক সভ্যতা উত্তরেরই দান; সেখানকার আদর্শপ্রাণ মহা-মানবগণ প্রায় সকলেই উত্তরে উৎপন্ন। দক্ষিণ কৃষিপ্রধান, অলস, রক্ষণশীল। এ-তল্লাটের হাল-চাল জমিদারী ধরণের; এরা শক্তি চায় কিন্তু শক্তি-অর্জ্জনের উপায় জানে না, শাসন মানে কিন্তু রাষ্ট্রে আস্থা রাখে না, স্নেহের অর্থ বোঝে কিন্তু ন্যায়নিষ্ঠার ধার ধারে না। কাজেই দক্ষিণের মানুষ সঞ্চয়ের চেয়ে অপচয়েই বেশি সিদ্ধহস্ত, সদাচারের চেয়ে অনাচারেই অধিক পটু, জীবনের চেয়ে মরণের আকর্ষণই তাদের উপরে প্রবলতর। এ-অবস্থায় এরা পদে পদে উত্তরের কাছে পরাজিত; এবং এ-রকম পরাজয়ের মানে গ্রাম-উচ্ছেদ ক'রে শহর গড়া, শস্য তুলে ফেলে ফ্যাক্টারি বসানো, পরিজনের বদলে পরজীবী পোষা। কিন্তু পরিবর্ত্তনের প্রতিযোগিতায় বাহির চির দিনই অন্তরকে হটিয়ে এসেছে। সুতরাং প্রাগ্রসর উত্তর আমন্থর দক্ষিণকে স্থিতি দিতে পারে না, শুধুই তার সর্ব্বনাশ সাধে। ফলে বিকৃতি সেখানে প্রকৃতির ভেক পরে, অত্যাচার সেখানে লোকাচারের মধ্যে ঢোকে, সমাজ সেখানে সংঘের কাছে

হারে; এবং সেই পরিমণ্ডলে যে-আশুবেদন লেখক জন্মায়, তার চোখে অনিষ্টই হয়ে ওঠে মানবজীবনের একমাত্র সত্য, অদ্বিতীয় সত্তা।

অবশ্য অনিষ্ট কেবল দক্ষিণেরই নিজস্ব সম্পত্তি নয়, উত্তরেও তার প্রকোপ যথেষ্ট; এবং সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব কালে মনুষ্যজীবনের অধিকাংশই ওই শব্দের দ্বারা নির্ণীত। অতএব এই দিক থেকে ফক্‌নর-এর সংবেদনশীলতাকে দোষ না ভেবে গুণ বলাই শ্রেয়; এবং এই অনিষ্টজ্ঞানই বোধহয় ফক্‌নর-এর স্থান-কালানুগত সাহিত্যসৃষ্টিকে একটা ব্যাপকতা দান করেছে, তাঁর অতিবিশেষ চরিত্রগুলিকে তুলে ধরেছে আদর্শের নৈর্ব্যক্তিক লোকে। কিন্তু অনিষ্টের সঙ্গে অনিষ্টের সংঘর্ষে যে-ট্র্যাজেডির উদ্ভব, তার প্রসার ও হৃদয়স্পর্শিতা আমার বিবেচনায় অল্প। তা দেখে দর্শকের চিত্ত তেমন শুদ্ধ হয় না, যেমন হয় ইষ্টের সঙ্গে ইষ্টের সংঘাতসন্দর্শনে। কারণ ট্র্যাজেডির মূল মন্ত্র দুঃখ নয়, করুণা; এবং করুণা ইষ্ট-সম্বন্ধে যত সহজে জাগে, অনিষ্টের সম্পর্কে তত অনায়াসে আসে না। সুতরাং অনিষ্টের অনুধাবনকালে সাহিত্যস্রষ্টা হয়তো স্বভাবতই নিরাসক্ত থাকতে পারে; কিন্তু অনুকম্পা, যা বাদে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি একেবারে অসাধ্য, তার সংস্পর্শও তাকে স্বতই এড়িয়ে যায়। সেইজন্যে গ্রন্থকারের প্রথম উপন্যাস, 'দি সোল্‌জর্স্ পে' প'ড়ে আর্নল্ড্ বেনেট্ যদিও বলেছিলেন যে ফক্‌নর কথাসাহিত্যের ভাবী সম্রাট্, তবু উণ্ডাম্ ল্যুইস্ তাঁর লেখায় প্রধানত প্রত্যাগত অসভ্যতার পরিচয়ই পেয়েছেন: এবং তৎসত্ত্বেও রসিকসাধারণ ল্যুইস্-এর সিদ্ধান্তে সায় দিয়ে ফক্‌নর-এর রচনারীতিতে মনস্তত্ত্বের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী গর্ট্রুড্ স্টাইন্-এর উপন্যাস-নামধেয় লিপিবদ্ধ প্রলাপের প্রতিধ্বনি শোনেন নি বটে, কিন্তু অনেক কোমলহৃদয় পাঠক ফক্‌নর-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাহিনী, 'দি সাউণ্ড্ এণ্ড্ দি ফ্যুরি' ও 'স্যাংট্যুয়ারি'-র মধ্যে এমন একটা অমানুষিক নৃশংসতার সুর ধরতে পেরেছেন, এমন একটা দাক্ষিণ্যের অভাব লক্ষ্য করেছেন যে তাঁদের বিচারে সে-বই-দুখানা রসসাহিত্যের গণ্ডি পেরিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের পর্য্যায়ে পৌঁছেছে।

তাহলেও আমি মানতে বাধ্য যে মানুষের চৈতন্যস্রোতের চালানে যত উপন্যাস সম্প্রতি অকূলে ভেলা ভাসিয়াছে, সেগুলোর মধ্যে 'দি সাউণ্ড্ এণ্ড্ দি ফ্যুরি'-র গতিই সব চেয়ে দ্বিধাবিরহিত; এবং গতির নিশ্চয়তা যদিও গন্তব্যপ্রাপ্তির নামান্তর নয়, তবু সেই আপাত-উচ্ছৃঙ্খল পুস্তকখানির সংযম ও মাত্রাজ্ঞান সত্যই বিস্ময়কর। অবশ্য উপাখ্যান যাঁদের অবসরের সাথী, কাল্পনিক রোমহর্ষে যাঁরা জীবনের আষ্টপ্রহরিক গ্লানিকে অন্তত কিছু ক্ষণের জন্যেও ভুলতে চান, যাঁরা দুর্ভাবনার জ্বালা জুড়োতে ডুব দেন কথাসরিৎসাগরে, 'স্যাংট্যুয়ারি' তাঁদের হাতে না পড়াই ভালো। কিন্তু যাঁরা বিশুদ্ধ চিন্তার ভক্ত, সাধনাকে

যাঁরা সিদ্ধির চেয়ে বড় ক'রে দেখেন, উপন্যাসের উর্ণাতন্তুর অবলম্বন খোঁজেন জীবনসৌধের আনাচে-কানাচে, তাঁরা হয়তো মানবমনের অন্ধকার মহলে এই অস্থায়ী প্রদীপ জ্বালানোর জন্যে ফকনর-কে ধন্যবাদই জানাবেন। উপরন্তু সে-বই-দুটি যে নিরাসক্তিসাধনার সোপানমাত্র, ফক্‌নর-এর চিত্তবৃত্তির যথাযথ প্রতিকৃতি নয়, তার আভাস পাওয়া যায় 'সার্টোরিস্'-উপন্যাসে। এই আধ্‌পাগলা পরিবারের ইতিহাস লিখে তিনি দেখিয়েছেন যে শুধু কারণকর্দ্দমেই তাঁর অবাধ যাতায়াত নেই, স্বপ্নলোকেও তাঁর প্রবেশ অব্যাহত; এবং প্রয়োজনের খাতিরে তিনি যেমন সাংবাদিক হতে পারেন, তেমনি আবশ্যকমতো গীতিকবিতাও তাঁর আয়ত্তে। বলাই বাহুল্য যে এখানেও ফক্‌নর-এর সাধু চরিত্রগুলির যা বিশিষ্ট লক্ষণ, অর্থাৎ ব্যর্থতা, তা ভূরি পরিমাণে বর্ত্তমান। তবু এটাও স্পষ্ট যে লেখক এখন আর কেবল অনিষ্টকেই জগতের একমাত্র উপাদান ব'লে ভাবেন না, তিনি বোঝেন যে বিশ্বব্যাপারে ইষ্টের অধিকারও সুনির্দ্দিষ্ট। তাই 'সার্টোরিস্'-এর পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে ভালো-মন্দ, উভয়েরই সন্ধান মেলে; এবং অবশেষে ভালোই হারে বটে, কিন্তু মন্দের মামলা যে আপীলে টিঁকবে না, এমন একটা ইঙ্গিত বোধহয় লেখকের অনভিপ্রেত নয়।

'সার্টোরিস্' পড়ার পরে আমার মনে আর সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না যে সিদ্ধির দিক দিয়ে ফক্‌নর খুব বড় ঔপন্যাসিক না হলেও, সম্ভাবনার বিচারে তাঁর স্থান অতি উচ্চে। তাঁর প্রত্যেক পুস্তকে দেখেছিলুম যে দু-একটা কথায় একখানা জীবন্ত ছবি ফুটিয়ে তুল্‌তে তাঁর সমকক্ষ সাম্প্রতিক সাহিত্যে খুব বেশি নেই। অবশ্য কথোপকথনরচনায় তাঁকে হেমিংওয়ে-র সঙ্গে একাসনে বসাতে পারি নি। কিন্তু এ-বিদ্যাতেও তিনি যে শরুড্ অ্যাণ্ডর্সন্, জন্ ডস্ পাসজ্ ইত্যাদি আধুনিক লব্ধপ্রতিষ্ঠদের বহু পশ্চাতে ছেড়ে গেছেন, তাও আমি অনায়াসে মেনেছিলুম। তাঁর দোষগুলোর কথা পূর্ব্বেই বলেছি; এবং সেগুলো আমাকে সুরু থেকেই পীড়া দিয়ে এসেছে। কিন্তু 'সার্টোরিস্'-এ যে-গাম্ভীর্য্যের সাড়া শুনেছিলুম, যে-বিশ্ববীক্ষার সন্ধান পেয়েছিলুম, তার পরে তাঁর ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে আমার মন আর কোনো প্রশ্ন তোলে নি; বুঝেছিলুম যে আজ না হোক, কাল না হোক, পাঁচ, সাত, দশ বৎসর বাদেও তিনি একখানা স্মরণীয় উপন্যাস লিখবেনই লিখবেন। আমার এই প্রত্যাশা অচিরে পূরেছে, অপ্রত্যাশিত রকমের বাহুল্য-সহকারে পুরেছে। জানতুম এতখানি সাধনা কখনো অপুরস্কৃত থাকবে না; এবং তাঁর জয়যাত্রার দিনে উচ্ছ্বসিত জয়ধ্বনিও আমার জিভে বাধতো না। কিন্তু এ-কথা কখনোই ভাবি নি যে একজন অল্পবয়সী মার্কিনী লেখকের হাত দিয়ে এত শীঘ্র এমন একখানা উপন্যাস বেরোবে যার তুলনা খুঁজতে যেতে হবে প্রাচীন গ্রীসের

নাট্যজগতে। অসংখ্য দোষ সত্ত্বেও ফক্‌নর-এর শেষ উপন্যাস 'লাইট্ ইন্ আগাস্ট্' ঈডিপাস্-জাতীয় পুস্তক। তার অবয়বে ভেদ্য স্থান অনেক আছে; হয়তো তার আয়ুবিচারে কেউই কখনো শতাব্দী গুণবে না; তবু সে যে অমৃতের পুত্র, তা অন্তত আমার কাছে তর্কাতীত।

আধুনিক বিজ্ঞাপনের দিনে যখন অসাধারণ-শব্দটার অপপ্রয়োগ সর্ব্বত্রই চোখে ঠেকে, তখন অমৃত-বিশেষণটা নিশ্চয়ই সকল সমালোচকের পক্ষে বর্জ্জনীয়। তাহলেও, 'লাইট্ ইন্ অগাস্ট্'-এর উপযুক্ত অন্য কোনো উপাধি আমি খুঁজে পেলুম না। কারণ বইখানা যদিও আট মাস আগে পড়েছিলুম, তবু তার প্রভাব এখনো আমার উপরে পূরো মাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে; এবং এই স্থায়ী ভাব সাম্প্রতিক সাহিত্যে কত বিরল, তা অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই জানেন। কিন্তু তাই ব'লেই 'লাইট্ ইন্ অগাস্ট্' অনিন্দনীয় নয়। অসঙ্গতি, প্রত্যক্ষতার অভাব, বৈষম্যের প্রতি পক্ষপাত, উপকরণের অপচয়, এমনকি ব্যাকরণচ্যুতি প্রভৃতি যত দোষ ফক্‌নর-এর লেখায় ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে, সে-সমস্তই এখানেও অল্প-বিস্তর পরিমাণে উপস্থিত। উপরন্তু এর আখ্যান-ভাগ এমনি গ্রন্থিল যে শাখা-প্রশাখার আধিক্যে পাঠক প্রায়ই দিশা হারিয়ে ফেলে। তবে এ-বাহুল্যকে অবান্তর ভাবা অন্যায়, মণিশিল্পীর হাতে নিটোল হীরে শতমুখী হয়ে উঠলেই, যেমন তার দাম বাড়ে, তেমনি রূপকারের স্পর্শে গল্পের শত বাতায়ন খুলে গিয়ে, সহস্র রশ্মি ঢুকে তার অন্তম ঐক্যটাকেই উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। উপন্যাসের এই অবৈকল্য সত্ত্বগুণের দান; এবং সে-সত্ত্বগুণের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের স্খলন-পতন-ত্রুটির কোনো সংস্রব নেই, সেটা সেই ক্ষমতা যার জোরে অতি বড় আষাঢ়ে গল্পকেও চাক্ষুষ সত্যের চেয়ে বেশি বাস্তব দেখায়। আমার কাছে সেইটাই রসসাহিত্যের সনাতন লক্ষণ; এবং তরুণ লেখকদের মধ্যে একা উইলিয়ম্ ফক্‌নর-ই যে-বিশ্বব্যাপী অনুকম্পার পরিচয় দিয়েছেন, সে-করুণা থেকে পায়ে-চলা পথের ধূলিকণা পর্য্যন্ত বঞ্চিত নয়। সেইজন্যেই এই নীচতা ও নৃশংসতার কাহিনী মনে মালিন্য আনে না, জাগায় প্রসাদ। সেইজন্যেই এই বিকৃতচেতাদের আলাপে অন্তরে কলুষ ঢোকে না, আসে চিত্তশুদ্ধি। সেইজন্যেই নায়ক ক্রিস্‌মাস্ নিজের বিসদৃশ বিকটতা শেষ অবধি বজায় রেখেও বিশ্বমানবের প্রতিভূ। এতখানি সার্ব্বজনীনতা যে-পুস্তকের আছে, তার মধ্যে সহস্র ছিদ্র থাকলেও, তাকে মহৎ না বলা আমার মতে ভীরুতা।

উপন্যাসে তত্ত্ব ও তথ্য

পশ্চিমী লেখকেরা দিনে দিনে এমন লিপিচাতুর্য্য দেখাচ্ছেন যে প্রায় সকল আধুনিক পুস্তকই সুখপাঠ্য এবং অনেকগুলি স্মরণীয়। তাহলেও সাহিত্যিক উৎকর্ষ কমেছে বই বাড়ে নি। এটা যদিও বিশেষ ক'রে নভেলেরই যুগ এবং প্রতি বছরেই একাধিক ভালো নভেল বেরোয়, তবু যথার্থ মহৎ উপন্যাস যুদ্ধের পরে বড় আর একটা হাতে পড়ে না। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্যে টল্‌স্টয় অথবা হার্ডি-কে প্রতিমান হিসাবে ধরা নিষ্প্রয়োজন; এবং তাঁদের তুল্য কথক তো সকল দেশে সকল কালেই বিরল, এমনকি মূর, ওয়েল্‌স্, বেনেট্, গল্‌স্‌ওয়র্দি-র মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর কথাসাহিত্যিকদের তুলনাও সাম্প্রতিকদের পক্ষে ক্ষতিকর। এই দুরবস্থার কারণনির্দ্দেশ সহজ নয়। এর মূলে হয়তো কোনো একটা হেতু নেই; হয়তো জীবনের সার্ব্বত্রিক দুর্দ্দশাই নভেলেও প্রতিবিম্ব ফেলেছে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক সর্ব্বনাশ নভেলকে যতই ক্ষুণ্ণ করুক না কেন, আন্তর দৈন্যই তার প্রধান শত্রু। এ-মতে অর্ব্বাচীনেরা সম্ভবত ধৈর্য্য হারাবেন; এবং এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের বৈচিত্র্যে নবীনেরা প্রবীণদের বহু পশ্চাতে ছেড়ে এসেছেন। তবু এটাও নিশ্চিত যে উপন্যাসরচনায় কেবল উদ্‌ভাবনাশক্তিই যথেষ্ট নয়; সেজন্যে সত্যনিষ্ঠাও হয়তো অনাবশ্যক; যেটা অপরিহার্য্য, সে-গুণ হচ্ছে লরেন্স্ যাকে বলেছিলেন 'থট্ অ্যাড্‌ভেঞ্চর'—অর্থাৎ দুঃসাহসিক ভাবুকতা।

সত্য, লরেন্স্ ছাড়াও দু-এক জন ঔপন্যাসিক ওই গুণের মর্য্যাদা বুঝেছেন; কিন্তু অধিকাংশই আজ সনাতন আদর্শে আস্থাহারা। তবে এ-মনোভাব মার্জ্জনীয়; এবং সম্প্রতন কথাসাহিত্যের নৈর্ব্যক্তিক বিজ্ঞানস্বারূপ্য আমার অনুমোদিত। কিন্তু তর্ক বাধে বিশেষণটার মানে নিয়ে। সাহিত্যসভায় আত্মজীবনীর বস্ত্রহরণ নিষিদ্ধ ব'লেই, সেখানে আত্মোপস্থিতি নিষিদ্ধ নয়; এবং নভেলে ভালো-মন্দের ব্যক্তিগত বিচার অশোভন হলেও, তাতে একটা জাগতিক মূল্যজ্ঞান শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, নিতান্ত আবশ্যিক। নৈরাজ্য ও নৈরাত্ম্য, এই শব্দ-দুটোর অর্থবৈষম্য আমরা যেন ভুলতে বসেছি। নৈরাজ্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরাকাষ্ঠা; এবং যে-ব্যক্তি বিধিবদ্ধ বিশ্বকে অহমিকার অহৈতুক অসংস্থিতিতে পর্য্যবসিত করতে পেরেছে, নৈর্ব্যক্তিক তার উপযুক্ত আখ্যা নয়, তার পদবী বৈনাশিক। কাজেই যাঁদের কাছে অনাত্ম সাহিত্যই কাম্য ঠেকে, তাঁদের পক্ষে শ্রেয়োবোধ অপরিহার্য্য, তাঁরা একটা লোকোত্তর আদর্শকে প্রাণপণবলে আঁকড়ে ধরতে বাধ্য; এবং ঔপন্যাসিক যদি শেষ পর্য্যন্ত তাঁর

কল্পনাকে প্রপঞ্চসীমায় আটকে রাখেন, চোখে অতিমর্ত্ত্য নিরীক্ষার কজ্জল না লাগান, মানবজীবনে পরমার্থের প্রাধান্য না মানেন, তবে তিনি হয়তো মমত্ব-বোধের মাদকতা কাটিয়ে উঠবেন, কিন্তু আত্মজ্ঞানের বিষকুণ্ডলী থেকে মুক্তি পাবেন না, তবে তিনি হয়তো কুসংস্কার এড়িয়ে যাবেন, কিন্তু ধ্রুপদী জীবনমুক্তির আকাশবাণী শুনবেন না।

ঐতিহ্যনির্দ্দিষ্ট পথে চলা আমাদের পক্ষে নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য ; এবং মানুষের পশুত্বস্বীকার ভিন্ন আজ আর কারো গত্যন্তর নেই। তাহলেও প্রুস্ৎ ও লরেন্স্, জয়েস্ ও উল্ফ্-এর মতো একটা নবাবিষ্কৃত নিকষে আমাদের সৃষ্ট চরিত্রগুলির পরখ আধুনিকদেরও আশুকৃত্য। নচেৎ নৈরাত্ম্য সত্ত্বেও আমাদের রচনা সাংবাদিক সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতেই আজীবন আবদ্ধ থাকবে। অবশ্য নূতন প্রতিমানপ্রতিষ্ঠা সকল দেশেই দুষ্কর। কিন্তু ঘটনাচক্রের সমাবেশে ব্যাপারটা সর্ব্বস্বান্ত জার্মানিতে আজ অপেক্ষাকৃত সহজ। জার্মানি এমন একটা সর্ব্বনাশের কবলে যে কোনো এক জন ব্যক্তির অধ্যবসায়ে তাকে আর প্রকৃতিস্থ করা যাবে না। কাজেই এই ব্যষ্টিবিলাসী দেশও আজ সমষ্টিবাদের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে উধাও ; এবং এ-বিবরণ কম্যুনিস্ট্‌বিদ্বেষী নাৎসীদের সম্বন্ধেও খাটে। কারণ তারা যদিও রুষদের শুনিয়ে শুনিয়ে তারস্বরে প্রাচীন জার্মেনিয়ার মৌখিক প্রশস্তি গাইছে, তবু অন্তত সরল বিশ্বাসীর বিচারে নাৎসী মতবাদের মূল সূত্র হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মঙ্গলকে ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে বড় ভাবা, এবং সেইজন্যেই সে-দল সম্প্রতি এত প্রতাপান্বিত। তবে সমাজ-তন্ত্রের অনুকম্পায়ীরা যে নাৎসী রাষ্ট্রনিষ্ঠাকে ভয়ের চক্ষে দেখেন, তা আমি জানি। কিন্তু উদারপন্থী মনুষ্যধর্ম্মের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের কোনো প্রকৃতিগত বিরোধ নেই ; এবং যাঁরা বিশ্বমানবের প্রতিভূ, তাঁরাও ব্যক্তিমানবকে জনহিতার্থে আত্মবলি দিতে ডেকেছেন।*

দেশভক্তদের আদর্শও তদনুরূপ ; এবং দেশই হোক আর ব্রহ্মাণ্ডই হোক, যেখানে সামান্য মানুষের আত্মোৎসর্গে কোনো অতিমানুষিক সত্তার কল্যাণ সম্ভবপর, সেখানে মানুষ বস্তুত নগণ্য নয়, তার জীবন প্রকৃতপক্ষে পরমার্থময়। আমার বিশ্বাস টমাস্ মান্ থেকে হের্মান্ ব্রখ্ পর্য্যন্ত জার্মানির সকল প্রথম শ্রেণীর লেখকই মানবজীবনের এই আদর্শ মেনে নিয়েছেন ; এবং সে-দেশের প্রাত্যহিক জীবন বহিরঙ্গ ঐশ্বর্য্যে হয়তো একেবারে বঞ্চিত ব'লেই, সেই

* এ-বইয়ের অসংখ্য ভুল-চুকের মধ্যেও উল্লিখিত ভ্রান্তির তুলনা নেই। অবশ্য এ-মন্তব্য যখন করেছিলুম, তখনো হিট্‌লারী পৈশাচিকতার মুখোস খোলে নি। কিন্তু অবচেতন শ্রেণিস্বার্থের চক্রান্ত ব্যতীত নাৎসী প্রতিশ্রুতির মধ্যে মনুষ্যধর্ম্মের প্রতিধ্বনি আমি শুনতে পেতুম কিনা সন্দেহ।

"দি স্লীপ্‌ওয়কর্স্‌"-এর পরে "দি ফর্টিসেকেণ্ড্‌ প্যারালেল্‌"* পড়া এক দিকে যেমন অতৃপ্তিকর, অন্য দিকে তেমনি কৌতুকপ্রদ; এবং শরুড্‌ অ্যাণ্ডর্স‌ন্‌, অর্নেস্ট্‌ হেমিংওয়ে প্রভৃতির মতো জন্‌ ডস্‌ পাসজ্‌-ও তাঁর অত্যাধুনিক উপন্যাস থেকে কেবল দার্শনিকতা নয়, 'সাহিত্যিকতা' সুদ্ধ ছেঁটে ফেলতে প্রস্তুত। এই হাল আমলের লেখকেরা ঘোরতর জড়বাদী; মন ব'লে কোনো জিনিসে তাঁদের তিলার্দ্ধ বিশ্বাস নেই। তাই তাঁদের গল্পের ঝোঁক বিষয়ীকে ছেড়ে বিষয়ের উপরে; তাঁদের রচনা অনাত্ম রীতির অতিভূমি। এই সমস্ত কাহিনীর কুশী-লবেরা সিনেমাছবির মতো শুধু কাজই ক'রে যায়, কখনো এতটুকু ভাবে না; এবং তাঁদের সাহিত্যাতিরিক্ত শিল্পাদর্শের এইখানেই শেষ নয়, তাঁরা দৈনিক পত্রের হাব-ভাবের অনুকরণে আত্মপ্রসাদ পান, ব্যাকরণ ও যতিচিহ্নকে অকাতরে বলি দেন, অর্থসঙ্গতির আশঙ্কায় সদা-সর্ব্বদা বেপমান থাকেন। কিন্তু তাহলেও তাঁদের পুস্তকাবলীতে একটা একাগ্র সাধনার, একটা নিষ্কাম সংযমের, একটা আত্মসমাহিত সজীবতার আভাস মেলে, যার পাশে ড্রাইসার-কে তো বাক্‌সর্ব্বস্ব ঠেকেই, এমনকি সিন্‌ক্লেয়র ল্যুইস্‌-কেও বাহুল্যময় লাগে; এবং ড্রাইসার-ল্যুইস্‌-জাতীয় প্রাচীনপন্থী মার্কিনী লেখকদের সঙ্গে যিনিই ঘনিষ্ঠ, তিনিই নিশ্চয় দেখেছেন যে এঁদের চরিত্রাবলীর পটভূমির সঙ্গে ওয়েল্‌সী কল্পলোকের সৌসাদৃশ্য কী রকম বিশদ।

অর্থাৎ এই অ্যামেরিকান্‌ জগতেও উনিশ শতকের নিঃসংশয় বিজ্ঞান ত্রৈলোক্যচিন্তামণি-রূপে বিরাজমান, এখানেও সকল সাংসারিক সমস্যা শুধু সদিচ্ছার দ্বারা সমাধানসাধ্য, এ-সমাজেও মানুষমাত্রেই প্রচ্ছন্ন উদারনীতির আধার; এবং এ-চিত্র কেবল অসত্যই নয়, উপরন্তু দুঃসহ অভিজ্ঞতার ধাক্কায় আমরা আজ অন্তত এইটুকু শিখেছি যে এ-ধরণের ভাববিলাসের সান্নিধ্যও বিপজ্জনক। কারণ জগৎ মূলত মঙ্গলময়, এই রকম শুভবাদের আড়ালে বাস করছিলুম ব'লেই, মহাপ্রলয়ের দিনে আমাদের মনে প্রতিবাদের প্রবৃত্তি জাগে নি, মুখে এসেছিলো অসার অতিবাদ; এবং সেইজন্যে উত্তরসামরিক সাহিত্যেও যখন সেই অসত্যের পুনরুদ্ধার দেখি, তখন বিতৃষ্ণাবোধ তো স্বাভাবিক বটেই, অধিকন্তু সহজেই মনে হয় যে এ-সাহিত্যের আসল উদ্দেশ্য রূপসৃষ্টি নয়, প্রচারকার্য্য। কিন্তু প্রথমে দার্শনিক উপন্যাসের পক্ষে যে-ওকালতি করেছি, এ-অভিমতকে আপাতত তার পরিপন্থী লাগবে। তত্রাচ একটু গভীরে তাকালেই, আর বিরোধ থাকবে না, ধরা পড়বে যে স্বকীয় তুলাদণ্ডে ভারী কথার বাট্‌খারা চাপিয়ে পরকীয় জগতের ওজন বোঝা

* The Forty-second Parallel—by John Dos Passos (Constable).

যেহেতু অসম্ভব ও অসার্থক, তাই ঔপন্যাসিকের পক্ষেও দার্শনিক নিরীক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ সার্ব্বজনীন বিচারবুদ্ধির সঙ্গে ব্যক্তিগত মানদণ্ডের সমীকরণই তত্ত্বদর্শনের প্রধান কর্ত্তব্য; এবং নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্যসাধনাও যেকালে একের ভাবনা-বেদনাকে সাধারণের ভাবনা-বেদনার এলাকায় আনতে চায়, তখন নৈরাত্ম্যসিদ্ধির সঙ্গে দর্শনানুশীলনের কোনো বিবাদ নেই।

প্রচারকের মনোভাব এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যেটা সর্ব্ববাদিসম্মত, যার মূল মন্ত্র প্রত্যাখ্যান নয়, পরিগ্রহণ, তার বিজ্ঞাপন যেমন অনাবশ্যক, তেমনি ভেদবুদ্ধি দলপুষ্টি-ব্যতিরেকে টি`কতে না পারায়, প্রচারকার্য্যই তার আত্মকৃত্য। মানুষমাত্রেই অতুল মর্য্যাদায় অধিকারী এবং তাই তার আত্মবলিদানে পৃথিবীর মঙ্গল নিশ্চিত, এ-কথা বলা এক, আর মানুষমাত্রেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, এবং বিজ্ঞানই তার পক্ষে অগতির গতি, এ-কথা রটানো অন্য। যে-ঔপন্যাসিক প্রথম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, নিরপেক্ষ রূপসৃষ্টি তাঁরই আয়ত্তে; তিনি জানেন যে মানবচরিত্র কৈলাসের মতো, নীতিকারের হস্তাবলেপে তার অন্তরঙ্গ শৃঙ্খলা নিপাতে যায় বটে, কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেলে, সে সহজ সৌন্দর্য্যে স্বরাট হয়ে ওঠে। অন্য দলের মধ্যে এই রকম নিরীহ সহিষ্ণুতা দুর্লভ; তাঁরা স্থির করেছেন যে জগত্ত্রাণের দায়িত্ব শুধু তাঁদের পরেই ন্যস্ত; কাজেই যে-মানুষ তাঁদের দীক্ষাগ্রহণে অসম্মত, তার উচ্ছেদসাধনে তাঁরা বদ্ধপরিকর। ফলে তাঁদের উপন্যাস যদিও হিতোপদেশ হিসাবে মহার্ঘ্য, তবু জীবনের আলেখ্য হিসাবে তা অতিরঞ্জনদোষে দুষ্ট। উপরন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি যে সত্যনিষ্ঠা কথাসাহিত্যের অপরিহার্য্য লক্ষণ নয়, সত্যকল্পতাই তার প্রাণ; এবং সেইজন্যে কল্পনাপ্রবণ সাহিত্যের সঙ্গেও কোনো পরিচিত তত্ত্বের সংঘর্ষ ঘটলে, ক্ষতি একা সাহিত্যেরই। সুতরাং শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টিকে আভ্যন্তরীণ অবৈকল্যের উপরে বসাতে চান, যাতে অখণ্ড শিল্পসামগ্রী কোনো অভিমতবিশেষের সত্যাসত্যের ধার না ধারে, যাতে সে স্বাবলম্বনগুণে সংঘাতের দুঃখ ও পক্ষপাতের গ্লানি কাটায়।

বলাই বাহুল্য এই সকল মতামত আমারই মনের কথা; এবং আলোচ্য লেখকসম্প্রদায় প্রকাশ্যে কোনো আধিদৈবিক আদর্শে বিশ্বাসী নন। তাঁরা জীবনকে যেমন দেখেন, ঠিক তেমনটি আঁকতে চান; ফোটোগ্রাফের পুঙ্খানুপুঙ্খ বস্তুনিষ্ঠাই তাঁদের অভিপ্রেত পদ্ধতি। বোধহয় সেইজন্যেই ডস্ পাসজ্ তাঁর উপন্যাসের বেশ খানিক অংশ পুরাতন সংবাদপত্রের পাঠোদ্ধারে ভরেছেন। কারণ "দি ফর্টিসেকেণ্ড্ প্যারালেল্" কোনো মানুষের জীবনচরিত নয়, বিংশ শতাব্দীর প্রথম চৌদ্দ বৎসরই তার মুখ্যপাত্র; এবং আমাদের কালের প্রকৃত স্বরূপ যেহেতু সংবাদপত্রেই সুপরিস্ফুট, তাই যুগচিত্রের প্রত্যেকটি প্রতীকের রূপরেখা তিনি

টেনেছেন আষ্টপ্রহরিক খবরের রঙে। এই কালগত ট্র্যাজেডি কতকগুলি সঞ্চরণশীল মূর্ত্তির মধ্যস্থতায় আমাদের জ্ঞানগোচরে আসে; এবং মূর্ত্তিগুলি মার্কিনী জীবনের বিভিন্ন ধারার বিগ্রহ, ধ্বংসোন্মুখ সময়স্রোতের বুদ্বুদ; তারা নানা কারণে নানা স্থানে উদ্ভূত, আর সকলেই য়ুরোপীয় মহাসমরের প্রলয়-পয়োধিতে বিলুপ্ত। তারা এ-রকম অন্তঃসারশূন্য ও নৈমিত্তিক, জীবনের এমন সব অখ্যাত স্তরে তাদের উৎপত্তি, এতই অপ্রতিষ্ঠ তাদের ব্যক্তিত্ব যে তাদের দিনগত পাপক্ষয়ের বিবরণে তত্ত্বদর্শন তো দূরের কথা, কোনো উল্লেযোগ্য ঘটনার সুদ্ধ অবকাশ নেই। কিন্তু আখ্যানবস্তুর এই অকিঞ্চনতা বইখানির সারসংগ্রহে বাধা দিলেও, তার ফলে গ্রন্থকারের বিশ্ববীক্ষা বরং সমধিক ঔজ্জ্বল্য পেয়েছে; এবং আলোকচিত্রের পদার্থনির্ভর সত্যানুরক্তি প্রসিদ্ধ হলেও, তার গ্রাহকশক্তি যেকালে সর্ব্বব্যাপী নয়, তাই জীবনের অবিকল আলেখ্য ব'লে যদি কোনো ফেটোগ্রাফ সুনাম কেনে, তাহলে আমরা বুঝতে বাধ্য যে ফোটোগ্রাফার জীবনের কোনো একটা দিককে সমগ্রতার পরমোত্তম প্রতিনিধি হিসাবে বেছে নিয়ে, তবেই ক্যামেরা ব্যবহার করেছিলেন। অর্থাৎ তাদৃশ নির্ব্বাচনের পিছনেও জীবন-সম্বন্ধে একটা মন্তব্য উহ্য না থেকে যায় না।

কিন্তু এই সামান্যবিধি যদি আলোচ্য লেখকের বেলা নাও খাটে, জন্ ডস্ পাসজ্-এর মনে যদি দার্শনিকতার ছায়াটুকুও না পড়ে, তবু এ-কথা না মেনে উপায় নেই যে নিছক সহজ জ্ঞানের সাহায্যে তিনি যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, সেই এক সত্যকেই হের্মান্ ব্রখ্ উপলব্ধি করেছেন অতিচেতন বুদ্ধির প্রয়োগে। কারণ "দি ফর্টিসেকেণ্ড্ প্যারালেল্"-এ যত চরিত্রের পরিচয় মেলে, তাদের আত্মাও সুপ্ত, তারাও নিঃসঙ্গতার দুস্তর পরিখায় বেষ্টিত, তাদের পরস্পরের মধ্যেও ক্বচিৎ-কদাচিৎ দেহের মিলন হয়তো বা ঘটে, কিন্তু মনের সাযুজ্য একেবারেই অসিদ্ধ থেকে যায়, তারাও চলে মৃত্যুর অভিযানে, এবং বিশ্বে বদ্ধমূল হবার যোগ্যতা তাদের যেহেতু নেই, তাই নিরর্থ উদ্যোগে উপক্রত জীবনে তারা যুদ্ধের সর্ব্বনাশকে গন্তব্য ব'লে ধ'রে নিয়েও অল্প-বিস্তর শান্তি পায়। তাছাড়া উভয় পুস্তকেই রচনারীতির একটা সাদৃশ্য আছে: দুই লেখকই প্রাচীন প্রকরণে বীতশ্রদ্ধ, এমনকি বিপ্লবী আদর্শেও তাঁদের মন ওঠে না; গদ্য, পদ্য, সাংবাদিক সংক্ষিপ্ততা, সকল পদ্ধতির প্রতিই তাঁরা সমান পক্ষপাতী। তবে ব্রখ্ আর্টের তথাকথিত কমঠবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেন না, বিনা প্রয়োজনেই গল্পের মধ্যে অনবগুণ্ঠিত তত্ত্বকথা ব'লে বসেন; এবং ডস্ পাসজ্ শিল্পকে এত ভঙ্গুর ভাবেন যে শিল্পাতিরিক্ত বস্তুমাত্রকে তিনি এড়িয়ে চলেন, এমনকি তাঁর মতে ঔপন্যাসিকের পক্ষে ভাবুকতাও হয়তো অমার্জ্জনীয়। বুঝি সেইজন্যেই "দি ফর্টিসেকেণ্ড্ প্যারালেল্" "দি স্লীপ্-

ওয়র্কস্”-এর চেয়ে সুখপাঠ্য এবং “দি স্লীপওয়র্কস্” “দি ফর্টিসেকেণ্ড্ প্যারালেল্”-এর চেয়ে গভীরতর। কিন্তু দুখানাই অসাধারণ বই; অর্থাৎ আমাদের অবশ্যপাঠ্য।

মাক্‌সিম্‌ গর্কি

এক সময়ে সাহিত্যের সার্ব্বজনীনত্বায় আমার অগাধ আস্থা ছিলো। তখন আর পাঁচ জনের মতো আমিও মনে করতুম যে বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গল ভিন্ন শিবের অন্য কোনো পরিচয় না থাকলেও, সত্য আর সুন্দর নির্ব্বিকার ও নিত্য, তাদের সম্বন্ধে আদমসুমারির সাক্ষ্য যেমন অশ্রদ্ধেয়, বিসংবাদ তেমনি অভাবনীয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সে-বিশ্বাস ধোপে টিঁকলো না; পারিপার্শ্বিক রুচিপরিবর্ত্তনের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে এবং নিজের খামখা খেয়ালের যুক্তিসূত্র খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্য্যন্ত আর না মেনে পারলুম না যে বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যা লোকাচারের মতোই দেশ-কাল-পাত্রের মুখাপেক্ষী; এখানেও পরমার্থের স্বাক্ষর নেই, স্বার্থই কর্ম্মকর্ত্তা; এবং এ-ক্ষেত্রে দর্শকের ব্যক্তিগত পক্ষপাত তো অনিবার্য্য বটেই, এমনকি দ্রষ্টার কৈবল্যও হয়তো কিংবদন্তী। অবশ্য তৎসত্ত্বেও সাহিত্যবিচারে শ্রেণিসংঘর্ষের প্রস্তাবনা সঙ্গত নয়, এবং হোমর বা শেক্স্‌পীয়র, য়ুক্লিড্‌ বা ন্যুটন্‌-এর প্রতিপত্তি এতই সার্ব্বভৌম ও সর্ব্বকালীন যে তাঁদের নির্লিপ্তি অন্তত আংশিক ভাবে সার্থক।

কিন্তু তাঁরা ব্যতিক্রমমাত্র, সাধারণ বিধির প্রত্যন্তে অবস্থিত; এবং গত সাত-আট হাজার বৎসরের বিবর্ত্তনেও এই রকম বিশ্বমানবের সংখ্যা যেকালে মুষ্টিমেয়ই রয়ে গেছে, অহংসর্ব্বস্বদের মতো অসীমে ঠেকে নি, তখন শিল্পী-বিশেষের সুনাম-কুনামের জন্যে তাঁর স্বকীয় প্রতিভার উৎকর্ষ-অপকর্ষ ততটা দায়ী নয়, যতটা দায়ী তাঁর সমসাময়িকদের সহজ অনুকম্পা অথবা স্বাভাবিক অনীহা। অর্থাৎ সরস্বতীপূজাও যুগধর্ম্মেরই অভিব্যক্তি; এবং যুগধর্ম্ম যেহেতু লোকোত্তরের ধার ধারে না, লোকায়তেই বাঁচে মরে, তাই প্রকাশ্যে বিদ্যোৎসাহ দেখালেও, ভারতীর কাছে আমরা ধনলাভ, বংশবৃদ্ধি, শত্রুবিনাশ ইত্যাদি বরই চাই। সেইজন্যেই কোনো কোনো কাব্যবিবেচকের মতে মহাকবিরা পরবর্ত্তীদের উপরে প্রভাববিস্তারে অক্ষম, সে-সাফল্য অকবিদেরই আয়ত্তে; কারণ প্রকৃত কাব্যের প্রাঞ্জলতায় ভুল বোঝার অবকাশ নেই, এবং ব্যাসকূটের ব্যাখ্যায় স্বেচ্ছাচার অনিবার্য্য ব'লেই, অপসাহিত্য অনুযাত্র-আকর্ষণে সিদ্ধহস্ত। সম্ভবত এ-সিদ্ধান্ত অতিরঞ্জিত; কিন্তু চরিত্রগত ঐক্যের অবর্ত্তমানে এড্‌গর এলেন্‌ পো-র সংক্রাম বোদ্‌লেয়র মারফৎ ফরাসী দেশে পৌঁছতো কিনা সন্দেহ।

সে যাই হোক, পরলোকগত মাক্‌সিম্‌ গর্কি-র সঙ্গে দেশ-কালের যোগ

আমার নেই, এবং আমাদের চিত্তবৃত্তি এমনি বিসদৃশ যে আমার পক্ষে সে-মনীষার মূল্যবিচার ধৃষ্টতা। আমি উত্তরসামরিক মানুষ, বিমানবিধ্বস্ত সমাজে বেড়ে উঠেছি, মেশিন্ গানের অগ্নিবৃষ্টি, শর্ষে গ্যাসের বিষবাষ্প, গৃহবিবাদের রক্তগঙ্গা আমার আবাল্য সহচর। কাজেই প্রাগ্‌বিপ্লবী বাঙালীর মতো স্বাধীনতার দেবদত্ত অধিকারে অচলা ভক্তি আমায় সাজে না, অন্যায়ের অমোঘ পরাজয় আমি রূপকথার রাজ্যেই খুঁজি, আমার জানতে বাকী নেই যে সাম্য ও মৈত্রীর মন্ত্র সেধে মানুষ মুক্তি পায় না, নামে পিশাচের পর্য্যায়ে। উপরন্তু অনাবশ্যক নরবলি ছাড়া বিদ্রোহের যে অন্য কোনো পরিণাম আছে, তা আমি ভাবতে পারি না; এবং প্রাগ্রসর মরীচিকার পিছনে ছুটতে গিয়ে এত জাতি গত বিশ বছর ধ'রে নরকের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরছে যে অদৃষ্টের গয়ংগচ্ছে অধৈর্য্যপ্রকাশ আমার বিবেচনায়, মারাত্মক, তাতে অরাজকতারই আগল ভাঙে, ভাগ্যবিপর্য্যয় ডুনে চলে না। অতএব গর্কি-র বিপ্লব-বিলাসের সঙ্গে আমার সহানুভূতি নেই।

পক্ষান্তরে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশায় মানুষের মনোভাব অন্য রকম ছিলো; রোমাণ্টিক্ আদর্শের আত্মপ্রবঞ্চনা তখনো অনাবিষ্কৃত, কালপ্রবাহের বাঁধা ঘাট তখনো উদারনীতির শূন্যকুম্ভে শব্দায়মান, নির্ব্বাসিত ভগবানের উচ্চ সিংহাসনে ব'সে বিজ্ঞান তখনো দুঃস্থ সংসারকে ত্রৈলোক্যচিন্তামণির প্রলোভন দেখাতে ব্যস্ত। অবশ্য ইতিমধ্যেই সেই স্বপ্নগর্ভ অন্ধকারের এখানে ওখানে রূঢ় আলোক উঁকি পাড়ছিলো; এবং বুয়োর যুদ্ধ, জাপানের অভ্যুদয়, ফাশোদা ইত্যাদির উপদেশে কেবল কালারাই কান পাতে নি। কিন্তু তখনকার মানুষ শব্দব্রহ্মকেই সর্ব্বশক্তিমানের মর্য্যাদা দিয়েছিলো; এবং সদিচ্ছা আর সমাজসংস্কারের মধ্যে যে আকাশ-পাতালের ব্যবধান, তা সেই ওজস্বিনী বক্তৃতার যুগ ঘুণাক্ষরেও বোঝে নি। হয়তো সেইজন্যে শ-প্রমুখ ফেবিয়ান্‌দের কাছে মার্ক্‌স্ হাস্যকর ঠেকেছিলো; এবং সেই বুদ্ধিজীবীরা স্থানে-অস্থানে জোর গলায় ব'লে বেড়িয়েছিলেন যে তাঁদের মতো আমিষ-ভোজন ছাড়লেই, ভবিষ্যতের কল্পলতায় টেনিসনী নজীরের স্বতঃস্ফূর্ত্তি সুরু হবে। যত দূরে মনে পড়ে, গর্কি-র সঙ্গে পশ্চিম য়ুরোপের প্রথম পরিচয় এই ভাবধারার শ্রাবণপ্লাবনের দিনে; এবং সমাজের অধস্তন স্তরে জন্মালেও, তাঁর পরিকল্পিত ত্রাণকর্ত্তারা যেহেতু কর্ম্মবীর নন, অসাধারণ তার্কিক আর অসামান্য বাগ্মী, তাই গর্কি-র নাম জপতে জপতে তদানীন্তন রক্ষণশীলেরাও ভেবেছিলেন যে তাঁরাই বুঝি অত্যাচারের চির শত্রু ও নব বিধানের অগ্রদূত।

আমি জানি উল্লিখিত মন্তব্যের বিপক্ষে অনেকেই আপত্তি তুলবেন; এবং যাঁদের চক্ষে সোভিয়েট্ শাসন রাষ্ট্রডায়ালেক্‌টিকের চরম ও পরম সমন্বয়,

তাঁরা নিশ্চয়ই আমাকে ধমকে বলবেন যে মাক্‌সিম্ গর্কি শুধু বৃদ্ধ বয়সেই নৈর্ব্যক্তিক সমাজব্যবস্থার গুণ গান নি, ১৯০৫ সনের সশস্ত্র রাজদ্রোহেও তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাহলেও তাঁকে হিংসাব্রত বোল্‌শেভিক্‌দের সমপাংক্তেয় ভাবা আমার অসাধ্য। কারণ তৎকালীন জার্মান্ দার্শনিকদের সংসর্গদোষে গর্কি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেই মার্ক্‌স্‌বাদে আস্থা খোয়ান, এবং উক্ত সমাজতন্ত্রের শোধনকল্পে কাপ্রি আর বোলোনাতে দুটি বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা ক'রে সহকর্ম্মী লুনাচার্স্কি-র সঙ্গে লেনিন্-এর কটু কাটব্য কুড়োন। কিন্তু তাতেও তাঁর ভুল ভাঙে নি; এমনকি ১৯১৭ সালের উপনিপাতের পরেও বুর্জোয়া সংস্কৃতির অপঘাত শোচনীয় জেনে তিনি উচ্ছ্বাসী লুনাচার্স্কি-র সংস্রবই ছেড়েছিলেন, বিজয়ী বিপ্লবের শৃগালী ঐকতানে স্বর মেলাতে পারেন নি। তবে নব বিধানের ধ্বংসকামনায় তাঁর সম্মতি ছিলো না, এবং বুনিন্-প্রমুখ স্বদেশপলাতক লেখকদের মতো মাতৃভূমির কুৎসাপ্রচারে তিনি উৎসাহ দেখান নি।

উপরন্তু গর্কি যদিও একাধিক বার সাফল্যের চূড়ান্তে উঠেছিলেন, তবু বাঁদা-বর্ণিত মসিজীবীর বিশ্বাসঘাতকতা তাঁকে কোনো দিনই ছোঁয় নি; এবং জনগণের আত্মপ্রসাদে সাধুবাদের ঘৃতাহুতি ঢালা আমরণ তাঁর বিবেকে বাধলেও, তিনি কখনো ভোলেন নি যে প্রাক্তন আত্মীয়তার সূত্রে প্রোলেটেরিয়ট্‌ই তাঁর সেবা ও অনুকম্পার অংশভাক্। তাহলেও ব্যক্তিবাদ তাঁর কাছে মহামূল্য ঠেকতো; রুষ ধনতন্ত্রের রক্তাক্ত উপসংহারে তিনি যথাসাধ্য প্রতিবন্ধক জুটিয়েছিলেন; এবং জন্মভূমি-সম্বন্ধে বিদেশীদের অবিমিশ্র বৈরিভাবে ধৈর্য্য হারিয়ে তিনি তাঁর শেষ জীবন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ছিদ্রান্বেষেই কাটিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এই রুচিপরিবর্ত্তনের পরেও গর্কি মনুষ্যধর্ম্মের বাদ সাধেন নি, সাধারণ স্বত্ব ব্যতীত ব্যক্তিস্বরূপের পূর্ণ পরিণতি দুর্ঘট বুঝেই কম্যুনিজ্‌ম্‌কে আঁকড়ে ধরেছিলেন। আসলে গর্কি-র হৃদয় তাঁর মস্তিষ্কের চেয়ে অনেক বড়; এবং সেইজন্যে লেনিন্-এর মৃত্যুর পরে তিনি এক দিকে যেমন লেনিন্-প্রতিষ্ঠিত শাসনযন্ত্রকে তাঁর শোকার্ত্ত বন্ধুবাৎসল্যের উত্তরাধিকারী ব'লে চিনেছিলেন, তেমনি অন্য দিকে তাঁর অহৈতুক কৃষকবিদ্বেষের দায় রুষ জাতির তথাকথিত নৃশংসতার উপরে চাপিয়ে তিনি স্বদেশে সমষ্টিবাদের সম্ভাব্যতা মানতে চান নি।

তাহলেও গর্কি-সম্পর্কে নির্ব্বোধ-বিশেষণ অব্যবহার্য্য। বরং তাঁর ক্ষেত্রে রুষ চারিত্র্যের স্বভাবসিদ্ধ তর্কপ্রেম আত্মশিক্ষিতের সচেতন বিদ্যাভিমানে মিশে রসরচনাকেও তত্ত্ববিচারের মতো শুষ্ক ও সূক্ষ্ম ক'রে তুলেছিলো; এবং এ-অভিযোগ শুধু তাঁর শেষ বয়সের উপন্যাস 'ক্লিম্ সাম্‌গিন্'-সম্বন্ধেই খাটে না,

জগদ্বিখ্যাত 'ফোমা গর্ডেইয়েভ্', 'থ্রি অফ্ দেম্', 'দি মাদার' ইত্যাদিও কেমন যেন নীতিমূলক, কেমন যেন অবাস্তব ও অসংহত। অথচ সে-বইগুলোর জীবনবেদ অসাধারণ; তাদের পাত্র-পাত্রীরা মাঝে মাঝে অতিশয় জীবন্ত; প্রাদেশিক কুসংস্কারের অনড় অন্ধকারও যে স্বাধীনতার সূর্য্যকে চির কাল ঢেকে রাখবে না, এই অমর আশার উন্নয়নে প্রায় প্রত্যেক পুস্তকই উদ্দেশ্য-প্রধান হয়েও সঙ্কীর্ণ সাময়িকতার গণ্ডি পেরিয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে-পিপাসা নিয়ে আমরা রুষ উপন্যাসের অতলে ডুবি, এখানে তা মেটে না; টল্‌স্টয়-এর বিশ্ববীক্ষা, টুর্গেনিভ্-এর মাত্রাজ্ঞান, ডস্টয়েভ্স্কি-র অন্তর্দৃষ্টি, চেকোভ্-এর বহিরাশ্রয়িতা, সে-সমস্তই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি ব'লে ধরা পড়ে, এমনকি এর পরে গোঞ্চারভ্, আর্টসিবাশেভ্ প্রভৃতির বস্তুনিষ্ঠাকেও আর জাতীয় প্রতিভার লক্ষণ হিসাবে ভাবা যায় না।

তবে এ-ধরণের তুলনা আসলে হয়তো নিরর্থক। কারণ রসপ্রতিপত্তি একাগ্রতার পুরস্কার; এবং সম্প্রতি কীথ্-এর মতো নৃতত্ত্ববিদও জাতিস্বাতন্ত্র্যের দিকে যতই ঝুঁকুন না কেন, তবু অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই মানুষী বিবর্ত্তনে বর্ণভেদের প্রশ্রয় দেন না। তাছাড়া সংস্কারমুক্তি ও স্বকীয়তা সকল সাহিত্যিকেরই কাম্য; এবং গর্কি-র নভেলে প্রত্যাশিত সুষমার অভাবে আমি ও আমার সমানধর্ম্মীরা পীড়া পাই বটে, কিন্তু তাঁর ছোট গল্প অথবা জীবনস্মৃতি এই বৈচিত্র্যের বাহুল্যে, এই অপরিচয়ের বিস্ময়েই আমাদের মন মজায়। 'দি বর্থ্ অফ্ এ ম্যান্', 'ইন্ দি অটম্', 'টোয়েন্টিসিক্স্ মেন্ এণ্ড্ এ গর্ল্' এবং সর্ব্বোপরি 'দি লোয়র ডেপ্থ্স্' পড়লে, আর সন্দেহ থাকে না যে গর্কি রুষ সাহিত্যের মহাপথে চলুন বা না-চলুন, তাঁর রূপনৈপুণ্য অন্য কারো চেয়ে কম নয়; এবং সেই কলাকৌশলের উপভোগ যদিও দুর্লভ বৈদগ্ধ্যের ধার ধারে না, তবু আদর্শ ও যাথার্থ্য, বাদানুবাদ ও তন্ময়তা, চিত্তশুদ্ধি ও রোমাঞ্চপ্রীতি, কালোপযোগিতা ও অবৈকল্যের এ-রকম অপরূপ সংমিশ্রণ তাঁর আগে আমাদের কল্পনার অতীত ছিলো।

দুর্ভাগ্যবশত উক্ত রসায়ন গর্কি-র বুদ্ধিজাত নয়, তাঁর আবেগপ্রসূত; তার পিছনে বিরাট সাধনা নেই, আছে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য; এবং উপন্যাস যেহেতু এক নিঃশ্বাসে লেখা যায় না, ঐকান্তিক সঙ্কল্পের সাহায্যে গ'ড়ে তুলতে হয়, তাই গর্কি-আদি প্রেরণাপ্রধান লেখকেরা ছোট গল্প রচনায় যে-সাফল্য পান, বড় উপন্যাসে তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারেন না। এ-ধরণের পুস্তকে আমরা মাঝে মাঝে হয়তো বিদ্রোহী উন্মাদনার বিদ্যুদ্বিলাস দেখি, বিদ্রোহের শোকাবহ ব্যর্থতায় তলাই, কিন্তু গর্কি-সদৃশ প্রতিভাবানের প্রাণপাত প্রযত্ন সত্ত্বেও তার সার্থকতা বুঝি না, আগন্তুক সমাজের সুসমঞ্জস চলচ্চিত্র প্রত্যক্ষ

করি না। আমি যত দূর জানি, সফল বিদ্রোহ-সম্বন্ধে সন্তোষজনক উপন্যাস একখানাও নেই; কারণ উপন্যাসে বিশ্বাসের অবকাশ থাকলেও, বুদ্ধিই সেখানকার প্রভু, তার থেকে পক্ষপাত বাদ পড়ে না বটে, কিন্তু তার মধ্যে তুলাসাম্যই নজরে আসে, সে-কার্য্যে সত্যকে যদি বা সম্ভাব্যতার খাতিরে ভোলা চলে, তবু তথ্য বা তত্ত্ব, কারো প্রয়োজনেই শৃঙ্খলার অসম্ভ্রম সয় না। আপাতত নিরাসক্তি ভিন্ন ঔপন্যাসিকের গতি নেই; এবং গীতিকবিতা বা আখ্যায়িকা-রচয়িতার মতো অনুকূল ঘটনাচক্র তাকে উত্তেজনা জোগায় না, সে যখন চরিত্রব্যবসায়ী, তখন মানসপুত্রদের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ-সুবিধা সে নিজেই জোটাতে বাধ্য।

সুতরাং এ-ক্ষেত্রেও অত্যধিক কল্পনাবিলাস বিপজ্জনক; অলস মনে ভাব থেকে ভাবান্তরে ঘুরলেই, উপন্যাস ফুটে ওঠে না, সেজন্যে মমত্ববোধ বর্জ্জনীয় এবং বিবেচনা আবশ্যিক। অর্থাৎ ছায়ামূর্ত্তিও স্বাতন্ত্র্যে অধিকারী, স্বধর্ম্মেই তার উজ্জীবন; এবং পৈত্রিক আদর্শের বোঝা বইলে, পুত্রের ব্যক্তিস্বরূপ যেমন পিষে মরে, তেমনি উদ্‌ভাবকের মতপ্রচারে জুড়ে দিলে, মানসপ্রতিমার বুকেও প্রাণস্পন্দন জাগে না। ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ্‌ বলেছিলেন নিস্তাপ স্মৃতির অন্তর রোমন্থনেই কাব্যের উৎপত্তি; এবং সে-অনুমান যে মিথ্যা, তার প্রমাণ শেলি-র উচ্ছ্বসিত কবিতাবলী। কিন্তু কাব্যের বেলা সে-নিয়ম খাটুক আর নাই খাটুক, ঔপন্যাসিকের মুখ্য সম্বল কীট্‌স্‌-বর্ণিত জীবন্মুক্তি। বলাই বাহুল্য, এই নঙর্থক ক্ষমতা ভাবয়িত্রী প্রতিভার লক্ষণ; এই নির্ব্বিকার সমভাব কারয়িত্রী প্রতিভাকে সাজে না; এবং এটা শুধু নিষ্কাম ও নৈরাত্ম্য নয়, অমানুষিক রকমের নিষ্ঠুরও। হয়তো সেইজন্যেই সাহিত্যসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা ট্র্যাজিডি; এবং শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকেরা দেশপ্রেম, সমাজসংস্কার, ভগবদ্‌ভক্তি ইত্যাদি বিষয়ের আকর্ষণ মানলেও, পরিণামী সিদ্ধির মোহ সাধ্যপক্ষে এড়িয়ে গেছেন। অতএব উপন্যাস করুণাময়দের উপযুক্ত রঙ্গভূমি নয়; কেননা সর্ব্বগ্রাসী বোধশক্তি আর সর্ব্বংসহ ক্ষমা কেবল ফরাসী প্রবচনের মতেই তুল্যমূল্য; সাধারণ মানুষ স্নেহান্ধ, এবং স্নেহ আর হিংসা অভিন্নহৃদয়, উভয়েই অধীর ও একদেশদর্শী।

দুঃখের বিষয়, বিপ্লবী লেখকেরা আর্য্যসত্যে বীতশ্রদ্ধ। তাই উপরোক্ত সিদ্ধান্তে তাঁদের সমর্থন নেই; এবং তাঁরা যদিও জানেন যে অগ্নিপরীক্ষা উৎরিয়েই বৈদেহী দুর্ম্মুখদের থামিয়েছিলেন, তবু সেজন্যে তাঁরা রামের সুমতিকে বাহবা দেন না, বলেন যে নিশ্চিতের যাচাই চিরায়ুদেরই মানায়, মর্ত্ত্যমানুষের কাছে স্বজ্ঞার নির্দ্দেশ স্বতঃপ্রমাণ। মার্ক্‌স্‌-ভক্ত না হলেও, মাক্‌সিম্‌ গর্কি এ-কথা মানতেন; এবং ১৯০৭ সাল থেকে ক্ষয়রোগের কবলে

প'ড়ে সময়সংক্ষেপের প্রয়োজন তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছিলেন। উপরন্তু অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকদের মতো তিনি দুঃখ-দৈন্যকে দূর থেকে দেখেন নি; এবং পরোক্ষ অভাব-অনটন তাঁর ভাববিলাসের উপলক্ষ জোগাতো না। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নিজ্‌নি-র এক সর্ব্বহারা পরিবারে তাঁর জন্ম; এবং চার বৎসর বয়সে চর্ম্মকার পিতাকে হারিয়ে ১৮৯২ সনে তাঁর প্রথম গল্পের মুদ্রণ পর্য্যন্ত যে-অকথ্য দুর্দ্দশা তাঁর সঙ্গ নিয়েছিল, সেই উপাদানে হয়তো দশ-বিশখানা মহাভারত লেখা যেতো, কিন্তু সে-সম্বন্ধে শিল্পিশোভন পরিচ্ছন্নতার অবকাশ ছিলো না। অবশ্য তার পর থেকে মাঝে মাঝে রাজপুরুষদের তাড়া খেলেও, বর্ত্তমান বিধি-ব্যবস্থা গর্কি-র জয়যাত্রার সামনে কেবল ফুলই ছড়িয়েছে। কিন্তু প্রাপ্যের অধিক পূজা পেয়েও তিনি নিজের গন্তব্য ভোলেন নি, আমরণ মনে রেখেছেন যে গ্রাসাচ্ছাদন, আহ্লাদ-আমোদ, শিক্ষা-সংস্কৃতি শুধু প্রতিভাশালীদের আয়ত্তে এলেই যথেষ্ট নয়, সর্ব্বসাধারণের উৎকর্ষসাধনই সভ্যতার একমাত্র ব্রত।

এ-আদর্শ যে মহান, অনবদ্য শিল্পসৃষ্টির চেয়ে অকাতর সমাজসেবা যে অনেক বেশি উদার, তা নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাহলেও এ-মত সম্ভবত অর্দ্ধ সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত; এবং অর্দ্ধ সত্য অসত্যের চেয়েও মারাত্মক। অন্ততপক্ষে এ-সংবাদ সকলেরই সুবিদিত যে অনুরূপ যুক্তির জালেই জার্মানি ও ইটালীর স্বাধিকারপ্রমত্ত রক্ষণশীলেরা তথাকথিত অসামাজিক সৌন্দর্য্যজ্ঞান বা শ্রেয়োবোধের উদ্বন্ধন ঘটাচ্ছে; এবং স্বৈরতন্ত্রের প্রতিবাদেই যখন গর্কি-র সারা জীবন কেটেছে, তখন তাঁর দৃষ্টান্ত থেকে কখনো প্রজ্ঞাবিসর্জ্জনের কুমন্ত্রণা মিলবে না, স্বাবলম্বী বিচারবুদ্ধিকেই অপরিহার্য্য লাগবে। কারণ ফাশিজ্‌ম্‌ আর কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর উভয়সঙ্কটে শেষোক্ত নিগ্রহনীতিই যৎকিঞ্চিৎ কম অসৎ ব'লে আমাদের অবশ্যবরণীয় নয়; এবং সমুৎপন্ন সর্ব্বনাশে অর্দ্ধত্যাগের হিতোপদেশ যতই পাণ্ডিত্যসূচক হোক না কেন, দুটো মন্দের মধ্যে একটার নির্ব্বাচন ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের অসাধ্য। এ-ক্ষেত্রে সভ্যতার চিরাচরিত মধ্য পন্থাই হয়তো অগতির গতি; এবং সে-পথে চলতে গিয়েই বুরিদান্‌-এর গাধা অনাহারে মরেছিল বটে, কিন্তু তার দু পাশে যে-দুটি বিপরীতমুখী গড্ডলিকাস্রোত প্রবাহিত, তাদের পরিসমাপ্তিও একেবারে প্রলয়পয়োধিতে।

দোটানা

গত পনেরো-কুড়ি বছর ধ'রে আর্য্যসত্যের উপরে আবালবৃদ্ধবনিতার আর বিশ্বাস নেই। পণ্ডিত ও মূর্খ, ধনী ও দরিদ্র, দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানী সকলেই আজ সমস্বরে বল্‌তে সুরু করেছেন যে ধর্ম্মনীতি কোন্ ছার, এমনকি ন্যায়শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ পর্য্যন্ত আত্মম্ভরির চক্রান্তচালিত। অবশ্য এ-অভিমত অভিনব নয়; উনিশ শতকের বেণ্টামী ভাবুকেরাও চার্ব্বাকপন্থীদের মতো রটিয়ে বেড়াতেন যে অভীষ্ট আর ইষ্ট একই টাকার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। কিন্তু সোহংবাদে তাঁদের মন উঠতো না; ভূয়োদর্শনের খাতিরে তাঁরা নিঃসংশয়ে মানতেন যে মানুষমাত্রেই যেকালে আকারে-প্রকারে অনেকখানি অভিন্ন, তখন ভিতরে ভিতরেও তাদের মধ্যে বৈষম্যের চেয়ে সাদৃশ্য বেশী। সুতরাং রাষ্ট্রগত ব্যক্তিকে স্বাধীন প্রতিযোগিতার অধিকার দিতে তাঁদের আপত্তি ছিলো না। তাঁদের নিজস্ব জীবনে চক্রবৃদ্ধি আর হিতৈষণার নির্দ্বন্দ্ব ঘটাতে তাঁরা স্বভাবতই ভাবতেন আসল স্বার্থের উপরে জ্ঞানের আলো পড়লে আজন্ম অনাচারী সুদ্ধ বুঝবে যে স্বপ্রাধান্যের জন্যেও সার্ব্বজনীন শান্তি ও শৃঙ্খলা আবশ্যিক। তবে উক্ত মহানুভবেরা কূট বুদ্ধিতে সাময়িক সমাজপতিদের সঙ্গে তাল রাখতে পারেন নি; এবং সেইজন্যে বর্দ্ধিষ্ণু সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্যে তাঁদের সদুপদেশ বারম্বার গৃহীত হলেও, তাঁরা কেউই পৃথিবীর কোথাও বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গল দেখে যান নি, অনেকেই মরবার আগে চার্ল্‌স্ ডারুইন্-নামক এক জন হঠকারীর মুখ থেকে শুনে গিয়েছিলেন যে তেলা মাথার তেল জোগাতেই পশুপতি সর্ব্বস্বান্ত।

সৌভাগ্যক্রমে পরবর্ত্তী প্রাণিবিদেরা ডারুইন্-এর অপসিদ্ধান্তে অসংখ্য ছিদ্র খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সমবয়সী তত্ত্বসন্ধানী মার্ক্‌স্-এর মীমাংসা নৈয়ায়িকদের কাছে নিন্দনীয় ঠেকলেও, কৃতকর্ম্মাদের পরোক্ষ সমর্থনে আজ অবধি বঞ্চিত হয় নি। কারণ মার্ক্‌স্-এর বিবেচনায় অন্তত লোকযাত্রার উদ্বর্ত্তন স্বার্থ ও শক্তির সমন্বয়ঘটিত, এবং সচরাচর মানুষ যদিচ লাভের আশাতেই জোট পাকায়, তবু সংঘবদ্ধ জীব বিশ্বমানবিকতার প্রতিভূকল্প নয়, যূথচারী জন্তুদের মতো অনাত্ম ও হিংসাপরায়ণ। অতএব যে-স্বার্থ আমাদের পরমার্থের দিকে ছোটায়, তা নৈর্ব্যক্তিক অথবা শ্রেণিগত, এবং সেইজন্যে অন্তর্মুখী প্রজ্ঞাচক্ষু খুলে চাইলেও, আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলি না, অনিবার্য্য কুরুক্ষেত্রের স্বেচ্ছাসেবকদলে অগত্যা নিজের নাম লেখাই। বলাই বাহুল্য এ-অবস্থায় সার্ব্বভৌমিকতার ভার সত্য-শিব-সুন্দরের পক্ষেও দুর্ব্বহ; এবং

সম্প্রতি সোভিয়েট্‌ব্যবস্থার সমালোচনায় হিতে বিপরীত ক'রে স্বয়ং আঁদ্রে জীদ্ যখন তাঁর নূতন কুটুম্বদের কলমে অতখানি বিষ জুগিয়েছেন, তখন আমি ও আমার সগোত্রেরা এ-প্রবচন অহরহ মনে রাখতে বাধ্য যে ভয়াবহ পরধর্ম্মের চেয়ে স্বধর্ম্মে নিধন শতশ্রেয়। উপরন্তু জীদ্-ই অবশ্যম্ভাবী শ্রেণিসংঘর্ষের একমাত্র ভুক্তভোগী নন ; শুনেছি ডস্টয়েভ্‌স্কি-র রচনা রুষ কর্ত্তৃপক্ষের বিচারে অপাঠ্য ; এবং এখনো কোনো বল্‌শেভিক্ কথাসাহিত্যিক আমার একাধিক বন্ধুকে তিলার্দ্ধ আনন্দ দিতে পারেন নি। আমি যেহেতু বুর্জোয়া, তাই তাদের সঙ্গে আমার মতান্তর নেই ; আমিও প্রায়ই ভেবে থাকি যে গর্কি-র ইদানীন্তন পুস্তকাবলী শুধু জরার সংস্পর্শে কিম্ভূতকিমাকার নয়, তাঁর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনই বোধহয় এই হানির মূলাধার।

পক্ষান্তরে সারা পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশের অধিকাংশ অধিবাসী ও-মন্তব্য নিশ্চয়ই নির্ব্বিবাদে মানবে না, একবাক্যে বলবে গর্কি হোমর-দান্তে-শেক্‌স্‌পীয়র-এর সমকক্ষ তো বটেই, এমনকি হয়তো বা অগ্রগণ্য। অবশ্য বর্ত্তমান জগতে আমার দল এখনো সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ব'লে, মাথাগুণতিতে তাদের পরাজয় আজ অবিসংবাদিত। কিন্তু আদমসুমারির পৃষ্ঠপোষণ বুদ্ধিজীবীদের রুচিসম্মত নয় ; এবং সেইজন্যে গণতন্ত্রের পরীবাদে তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সাম্প্রতিক মনীষীরা সর্ব্বদা জানাতে ব্যস্ত যে বিপ্লবী লেখকদের মধ্যে যথার্থ প্রতিভার পরিচয় পেলে, অর্ঘ্যবিতরণে আমরা কোনো দিন কার্পণ্য করি নি, বরং মাল্‌রো-র মতো রূপকারকে ট্রট্‌স্কি-র অন্যায় আক্রমণে বিপন্ন দেখে নানা রকমে তাঁর পক্ষ নিয়েছি। তবে সেইসঙ্গে এ-সত্যটুকু প্রচ্ছন্ন রাখা অনুচিত যে মাল্‌রো-র সর্ব্বশেষ উপন্যাস ছাড়া অন্য বইগুলি যে-আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তা অন্তত প্রকাশ্যে আমাদের শ্রেণিস্বার্থের প্রতিকূল নয় ; এবং তাঁর অন্তিম পুস্তকে গ্রন্থকারের অর্থনৈতিক পক্ষপাত যদিও সুস্পষ্ট, তবু সেখানির সেই জায়গাই বিশেষ ভাবে আমাদের উপভোগ্য, যেখানে লেখকের অভিপ্রায় অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট, অথবা যে-স্থানে তিনি নিতান্ত সাবেকী ধরণে নায়কের চরিত্র ও সুখ-দুঃখ ফুটিয়ে তুলেছেন। জন্ ডস্ পাসজ্-এর অদৃষ্টও অনুরূপ ; তাঁর প্রকৃত তাৎপর্য্য আমাদের প্রায়ই এড়িয়ে যায় ; এবং তিনি একবার কথকতায় ঢিলে দিলে, আমরা তৎক্ষণাৎ তাঁকে সাহিত্যসভা থেকে তাড়িয়ে প্রচারকের অনাচরণীয় পর্য্যায়ে ফেলি। সুতরাং রসবস্তুও রাজকার্য্যের বিভাগমাত্র ; শিল্পী ও শিল্পামোদীর প্রাথমিক বিশ্বাসের অদ্বৈত সর্ব্ববিধ মূল্যবিচারের জন্যেই অপরিহার্য্য ; এবং আমার বয়স যতই বাড়ছে, ততই পরিষ্কার ক'রে বুঝছি যে কাব্যবিবেচকের অন্তরঙ্গ আপত্তিকে যিনি ঘুম পাড়াতে অক্ষম, কবিতাপাঠ তাঁর পক্ষে পণ্ড শ্রমের পরাকাষ্ঠা।

তাহলেও এ-কথা সত্য নয় যে মনুষ্যসমাজ দুটো পরস্পরবিরোধী শ্রেণীতে আবহমানকাল বিভক্ত। এমনকি আজকের দিনেও অনেকের সম্বন্ধেই এ-রকম অনুমান অমূলক যে তারা যখন স্টালিন্-র কথামৃত শুনতে প্রস্তুত নয়, তখন মুসোলীনি-র সিংহনাদই তাদের বীজমন্ত্র। অন্ততপক্ষে এতে বোধহয় সন্দেহ নেই যে রুষদেশের বাইরে যে-লেখকেরা এখনো পর্য্যন্ত সাহিত্যিক পরিমণ্ডলের দিকপাল, তাঁরা আপাতত দুর্গম মধ্য পন্থারই পথিক; এবং সে-পথের প্রান্তে বাম বা দক্ষিণ যে-তন্ত্রই থাক না কেন, তাতে চল্‌লে নিষ্ফল আত্মজিজ্ঞাসার অত্যাচার থেকে অব্যাহতি মেলে। অবশ্য যুবকেরা পারম্পর্য্য মানলেও, কার্য্য-কারণের ধার ধারেন না। কাজেই অন্ধ নিয়তির আঁচল ছেড়ে তাঁরা ইদানীং মুক্তকণ্ঠে বলে বেড়াচ্ছেন যে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারলেই, ভবিতব্যকে ইচ্ছাপূরণের কাজে লাগানো যাবে। ফলত ইংলণ্ডের মতো নিশ্চেতন দেশেও তরুণ সাহিত্য রাষ্ট্রনৈতিক বাদ-বিতণ্ডার গর্ভগৃহ; এবং সাধ থাকলেও, তারুণ্য যেহেতু আর আমার সাধ্যে কুলয় না, তাই আমি দূর থেকেই অত্যাধুনিক আত্মবেদের গুণ গাই, সে-সন্ধানে যোগ দিয়ে অনাবশ্যক কায়ক্লেশ বা অপরিহার্য্য মনঃকষ্ট সওয়ার সার্থকতা বুঝি না। এই কারণে গত পাঁচ-সাত বছরের অনেক প্রথিতযশা লেখকই আমার কাছে নামমাত্র; এবং সাময়িক পত্রে কল্‌ডর-মার্শেল্-এর নিরন্তর উল্লেখ দেখে জানি বটে যে প্রভাবে ও প্রতিপত্তিতে তিনি স্বয়ং অডেন্-এর প্রতিদ্বন্দ্বী, তবু ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট্ পার্টির অন্যতম কর্ম্মীর সঙ্গে আমার মনান্তর অবশ্যম্ভাবী ভেবে আমি এত দিন তাঁকে এড়িয়ে গেছি। কিন্তু পঠন-পাঠন অকর্ম্মণ্যদের ব্যসনবিশেষ; এবং আমি যে-লেখকদের অনুরাগী, তাঁরা যেমন অল্পসংখ্যক, তাঁদের গ্রন্থাবলীও তেমনি নাতিবহুল। অতএব সম্প্রতি এক দিন অভাবে প'ড়ে আমি অবশেষে কল্‌ডর-মার্শেল্-এরই শরণ নিয়েছিলুম। কিন্তু সেজন্যে আমি অনুতপ্ত নই; কেননা তিনি শুধু আমার চিত্তপ্রসাদই জাগান নি, সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর ভুলও ভেঙেছেন।

আমার প্রগতিক বন্ধুদের কাছে প্রায়ই শুনি যে কলাকৌশলের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ ধনিক সভ্যতার দারুণ দুর্লক্ষণ; এবং সংবাদপত্রাদিতে মাঝে মাঝে পড়ি যে রুষ দলপতিরা কবিযশঃপ্রার্থীকে শিল্পপ্রকরণ ভুলে শিল্পসামগ্রীর দিকে তাকাতে আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে উল্লিখিত উপন্যাসে কল্‌ডর-মার্শেল্-এর কৃতিত্ব প্রসঙ্গনির্ব্বাচনে নয়, প্রকাশ-পদ্ধতিতে। উপরন্তু তাঁর উদ্দেশ্য আধুনিক ইংরেজী সমাজের পরিচয়প্রদান; এবং এ-প্রচেষ্টা যদিও কম্যুনিস্ট্‌শোভন, তবু ভূতপূর্ব্ব ঔপন্যাসিকেরাও বোধহয় অনুরূপ আদর্শের প্রেরণাতেই কলম ধরতেন। তবে জয়েস্ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত সামনে না থাকাতে তাঁরা প্রবহমাণ জীবনস্রোতের বর্ণনায় স্বাচ্ছন্দ্য আনতে

পারতেন না ; এক এক বারে এক এক জন পাত্র-পাত্রীর পৃথক বৃত্তান্তে এক একটি পরিচ্ছেদ ভ'রে, নায়ক বা নায়িকার সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্পর্ক নিরূপণ ক'রে, অসংলগ্ন উপাদানে অখণ্ডতানির্ম্মাণের প্রয়াস পেতেন। যুগধর্ম্মের কল্যাণে কল্ডর-মার্শেল্ এই অপ্রাকৃত বিশ্লেষণ বাঁচিয়ে চলেছেন ; এবং তাঁর গল্পে ব্যক্তি ও শ্রেণীর তাৎকাল্য আর পরস্পরের উপরে তাদের ঘাত-প্রতিঘাত একত্রে প্রতিভাত। বলাই বাহুল্য সংসারে ও-রকম নিশ্ছিদ্র সংযোজনা স্বভাবসিদ্ধ হলেও, সাহিত্যে তার প্রতিবিম্বপাত আয়াসসাধ্য ; এবং নিছক অনুকরণের সাহায্যেও অতখানি অবৈকল্যে পৌঁছতে পারলে, কল্ডর-মার্শেল্ আমাদের সাধুবাদ কুড়তেন। কিন্তু তাঁর সাফল্য আরো অনেক বেশি। কারণ 'পাই ইন্ দি স্কাই'-এর* সর্ব্বত্র যেমন গ্রন্থকারের স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ আছে, তেমনি কাহিনীর সমগ্রতা কোথাও ভর্জিনিয়া উল্ফ্-এর মতো আত্মনেপদী নয়, আগাগোড়া বহিরাশ্রয়ী। অর্থাৎ আখ্যানের কথক তো প্রথম পুরুষ বটেই, এমনকি, হয়তো সাধারণ স্বত্বের খাতিরে, চরিত্রবিশেষের প্রাধান্যও লেখকের অনভিপ্রেত ; এবং বইখানি নায়কহীন, সমানাধিকারের মানচিত্র।

কিন্তু কল্ডর-মার্শেল্-এর উপরে সাম্যবাদের প্রভাব আর বেশি দূর খুঁজলে, নৈরাশ্য অনিবার্য্য ; এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে উক্ত নৈরাত্ম্য রীতি বাদে অন্য সব বিষয়ে তিনি কম্যুনিস্ট্‌সুলভ সমাজসেবার প্রতি অবহেলাই দেখিয়েছেন। অন্তত তাঁর উপন্যাসে হিতোপদেশের প্রত্যাশিত গন্ধ নেই ; বর্ত্তমান ব্যবস্থায় যে বামাচারী ভিন্ন অন্য সকলেই পশু বা পিশাচ, এমন সংবাদসরবরাহে তিনি নিতান্ত নিরুৎসুক ; এবং এই বিশুদ্ধ কথাসাহিত্যের পিছনে যদি কোনো নীতি লুক্কায়িত থাকে, তবে তা সম্ভবত এই যে বুঝে-সমঝে কম্যুনিস্ট্‌দের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে, ভূস্বর্গের দ্বার খোলাই থাকে, ফাশিজ্‌ম্-এর নরকে লোকসংখ্যা বাড়ে না। অবশ্য বইখানির একমাত্র বুদ্ধিবাদী ফেনার-এর লোভনীয় পরিণাম হয়তো বা সামান্য বিধির ব্যতিক্রম হিসাবেই মর্য্যাদার স্থান পেয়েছে ; নতুবা বোল্‌শেভিক্‌দের সাম্প্রতিক বেণেপনার সমর্থনেই কল্ডর মার্শেল্ আমাদের জানাতে চান যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপান্ত-বর্ত্তিনী উইন্-এর পুণ্যবলেই ফেনার-এর মতো পাপিষ্ঠও চরমে ত'রে গেলো। কিন্তু সেই 'পেতিৎ বুর্জোয়াজ্'-এর সম্বন্ধে লেখকের অন্যায় দুর্ব্বলতা উপসংহারে স্পষ্টত ধরা পড়লেও, এমন সন্দেহ একবারও আমার মনে জাগে নি যে মেয়েটির মারফতে গ্রন্থকার এই আশ্বাসবাণীই আমাদের শোনাতে চান যে স্টালিন্-

* Pie in the Sky—by Arthur Calder-Marshall (Cape).

প্রসঙ্গে বিষয়ী মানুষের হৃৎকম্প নেহাৎ নিষ্প্রয়োজন ; কেননা রুষদেশের ভাগ্য-বিধাতা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিশিষ্ট বন্ধু ; এবং তাঁর শতনাম জপলে, বিপ্লব-বিলাসীরাই নিপাতে যাবে না, অধিকারভেদ, উদ্বাহবন্ধন, উত্তরাধিকার ইত্যাদি চিরপ্রথাগুলোর দুর্দ্দশাও ঘুচবে। এই শোকাবহ কর্ত্তব্যবিমুখতার পরে সধর্ম্মীদের মধ্যে কল্ডর-মার্শেল্-এর সুখ্যাতি টিঁক্‌বে কিনা, তা বোধহয় অনিশ্চিত, কিন্তু রসিক মহলে তাঁর প্রতিপত্তি যে আরো ছড়াবে, তা এক রকম তর্কাতীত।

আসলে কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম ক'রে যারা স্বাতন্ত্র্য খোয়ায়, হয় তাদের ভিতরে ব্যক্তিস্বরূপের বালাই নেই, নয় তারা কার্য্যকরী প্রতিভায় বঞ্চিত। অন্ততপক্ষে ফলিত মনস্তত্ত্বের মতে ধাক্কা না খেলে, চৈতন্য জাগে না ; এবং স্বাবলম্বীর স্বাক্ষরিত প্রতিকূল প্রতিবেশই যেহেতু রূপসৃষ্টির অনন্য অভিজ্ঞান-পত্র ; তাই জার্ম্মান্ বা ইটালিয়ান্ সাহিত্যসেবীরা এখনো একেবারে লোপ পান নি। তবে দাউলি-ও অগণ্য ইটালীয় মনীষীর মতো স্বদেশপলাতক কিনা জানি না ; এবং মাতৃভূমিতে থাকলে, তাঁর অবস্থা হয়তো ক্রোচে-র চেয়েও বেশী সঙ্গীন। কিন্তু 'দি হুইল্ টর্ন্‌স্'-এর* যে-ইটালিয়ান্ সমালোচনার তর্জ্জমা বইখানির মলাটে উদ্ধৃত হয়েছে, তা দেখে তাঁকে মুসোলীনি-র চক্ষু-শূল ব'লে লাগে না ; এবং এটাও কষ্টকল্পনা যে যাঁর ভাগ্যে আত্মীয়ের অনুগ্রহ জোটে নি, তিনি বিদেশী প্রকাশকের বিষয়বুদ্ধিকে ঘুম পাড়াবেন। ফলত পুনশ্চ আমরা মানতে বাধ্য যে বাহ্য বশ্যতা বজায় রাখলেও, প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বুক ফেটে মরে না, সহস্রাক্ষ স্বৈরাচারীর চোখে ধুলো দিয়ে স্বকীয় দৃক্‌শক্তিই ফুটিয়ে তোলে ; এবং তখন লেখকের মৌখিক মতামতকেও আর মিথ্যা ঠেকে না, সতীর পতিনিন্দার মতো তার তোতাপড়ার আড়ালে নিজস্ব পক্ষপাতের পরিচয় মেলে। অবশ্য দাউলি উক্ত উপন্যাসে এ-রকম কোনো শ্লেষ বা বক্রোক্তির সাহায্য নেন নি, বরং নায়কের সমাজতান্ত্রিক পিতাকে তাঁর বিষাক্ত বিদ্রূপের উপলক্ষ বানিয়েছেন। তাহলেও তিনি নিঃস্ব-নির্জ্জিতেরই অনুকম্পায়ী, এবং সম্ভবত সেইজন্যেই উল্লিখিত সমালোচকের বিবেচনায় জোলা তাঁর একমাত্র উপমান। কিন্তু জোলা-র সাহিত্যিক বস্তুবিলাস তাঁর বিরাট বিশ্বপ্রেমেরই অন্যতম অভিব্যক্তি ; তিনি শুধু কুৎসিৎ কাহিনী লিখেই শুচিগ্রস্তদের অভিশাপ কুড়ন নি, ড্রেফ্যুস্-এর পক্ষসমর্থনে নেমেই সংরক্ষিত স্বার্থের অত্যাচার সয়েছিলেন ; এবং দাউলি-র গল্প পারি-বারিক কুৎসাপ্রচারের অছিলায় এগিয়ে চল্‌লেও, এমন ধারণা অগ্রাহ্য যে

---

* The Wheel Turns—by Gian Dàuli (Chatto & Windus).

পাশ্চাত্ত্য ঐতিহ্যের প্রত্যেক উপকরণের ফাঁকি বুঝে যিনি আধুনিকদের নিরুদ্দিষ্ট জীবনযাত্রাকে মৃত্যুর তুল্যমূল্য ভাবেন, কেবল ফাশিস্ট্ তর্জ্জন-গর্জ্জন তাঁর কাছে অর্থগম্ভীর।

দুঃখের বিষয়, দাউলি-র সম্বন্ধে আমার সমস্ত জ্ঞান এই একখানি নিখুঁৎ উপন্যাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত; এবং বস্তুতই যদি য়ুরোপে তাঁর অল্প-বিস্তর নাম-ডাক থাকে, তবু ভারতে তিনি এখনো পর্য্যন্ত অপরিচিত। কাজেই তাঁর কত বয়স, তিনি কবে প্রথম এবং এ যাবৎ কখানা বই লিখেছেন, এ-জাতীয় প্রশ্নের উত্তর আমার অজ্ঞাত। তবে যেহেতু তাঁর বিশ্ববীক্ষা হেগেল্-এর প্রভাব কাটিয়ে ভিকো-র দিকে ঝুঁকেছে, তাই তিনি শুধুই মধ্যশ্রেণিভুক্ত নন, বোধহয় মধ্যবয়সীও। অর্থাৎ ধ্বংসের উপলব্ধি তাঁর অস্থি-মজ্জাগত, এবং তাঁর বিবেচনায় এই প্রাকৃতিক ক্ষয় অপ্রতিকার্য্য ব'লেই তিনি বুঝি বা আখ্যায়িকার মাঝখানে দৈবজ্ঞ প্রমুখাৎ তাঁর নায়ককে আসন্ন অধঃপাতের পূর্ব্বোক্তি শুনিয়েছেন। কিন্তু সে-ভাগ্যগণনা থেকে বেচারা তিলমাত্র উপকার পায় নি, হাত-পা ছুঁড়তে গিয়ে কার্য্য-কারণের দুশ্ছেদ্য শিকলে ক্রমশ জড়িয়ে পড়েছিলো; এবং বয়োবৃদ্ধির ফলে সে নিঃসংশয়ে জেনেছিলো বটে যে তার সর্ব্বনাশ হেতুপ্রভব, তবু সেজন্যে সে কাণ্ডজ্ঞানহীন আত্মীয়-স্বজনের উপরে দোষ চাপায় নি, বুঝেছিলো যে নটরাজের গৈবী টানে নর-নারী বানরের মতো নাচে। এই সিদ্ধান্তের পরে দাউলি-কে প্রচ্ছন্ন কম্যুনিস্ট্দের সমপাংক্তেয় ভাবা খুবই শক্ত; এবং সাধারণত বামেতর দক্ষিণেরই নামান্তর হলেও, বর্ত্তমান বন্দোবস্তের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ এতই সুপ্রকট যে ফাশিস্ট্ প্রভুভক্তদের দলে তাঁর স্থাননির্ণয় আরো কষ্টকর। আসলে অন্যান্য রূপকারের মতো তাঁরও পাদপীঠ সম্ভবত সর্ব্ববিধ আদর্শের সীমাসন্ধিতে; সকল মতামতের আতিশয্যই তাঁকে পীড়া দেয়; কোনো বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য ঘটাতে না পেরেই তিনি সাহিত্যের স্বায়ত্তশাসনে আত্মসমর্পন করেন। অবশ্য তার মানে এ নয় যে একদেশদর্শিতা তাঁকে একেবারে ছোঁয় না। কিন্তু তিনি সে-সম্বন্ধে হয়তো সচেতন; এবং সেইজন্যে তাঁর সমাজচিত্রের যাথার্থ্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ ভিতরে ভিতরে আমরা যত স্বপ্নই পুষি না কেন, বাহ্য জগৎ সে-কল্পনাবিলাসের বাদ না সাধলে, সংসারে সংস্কারকের অন্নজল জুটতো না; এবং সংস্কারক যখন ভবিষ্যৎপ্রলুব্ধ দূরদৃষ্টির সাহায্যেই বর্ত্তমানের প্রকৃত পরিস্থিতি দেখে, তখন স্বার্থপ্রণোদিত শিল্পীর পক্ষেও সত্যসন্ধান সুসাধ্য।

সুতরাং হিতবাদীদের বিশ্বমানবিক মনোভাবের প্রতি তাচ্ছিল্যপ্রদর্শন অসঙ্গত; এবং নিরপেক্ষতার নেতিবাচক নির্দ্দেশ মানলেও, শেষ পর্য্যন্ত দু কূল

বাঁচিয়েই সার্ব্বজনীন গন্তব্যে পৌঁছনো যাবে। অন্ততপক্ষে রসগ্রহণ শ্রেণি-স্বার্থের তোয়াক্কা রাখে না। নচেৎ জ্ঞাতসারে ডাইনে বা বাঁয়ে না তাকালে, আমি কখনো এই প্রকাশ্য কম্যুনিস্ট্ ও অনুমিত ফাশিস্ট্-এর লেখা প'ড়ে এতখানি পরিতৃপ্তি পেতুম না। তবে আমার উপভোগ নিশ্চয়ই নৈর্ব্যক্তিক নয়, তার পিছনে আমার উপস্থিত আবেশ-অভিনিবেশের অনুমোদন আছে; এবং সেইজন্যেই দুখানা উপাদেয় উপন্যাসকে উপলক্ষ ক'রে আমি অর্থশাস্ত্রের অবান্তর আলোচনায় এতটা সময় কাটালুম। বলা বাহুল্য লেখকদ্বয় আমার বাগ্‌বিস্তারের জন্যে আদৌ দায়ী নন; এবং উভয় পুস্তকই কথাসাহিত্যের প্রশংসনীয় নিদর্শন। অর্থাৎ কোনোটাতেই তত্ত্ববিচারের বা মতপ্রচারের ইঙ্গিতমাত্র নেই। আসলে দাউলি-ও কল্‌ডর-মার্শেল্-এর মতো আখ্যান-শিল্পের নূতন প্রকরণ-আবিষ্কারেই ব্যস্ত; আর এ-দিক থেকে তাঁদের দু জনের সিদ্ধি এমন অসামান্য এবং গল্প দুটির বিষয় ও ভঙ্গি এত গাঢ় ও অননুকরণীয় যে সেগুলির সারসংগ্রহের চেষ্টা বিড়ম্বনা। কিন্তু কলাকৈবল্য যদি বা সম্ভব-পর হয়, তাহলেও বৈদগ্ধ্যের সমাধি কোনো কালেই সহজ নয়; এবং কল্‌ডর-মার্শেল্ ও দাউলি-র অন্যান্য পাঠকেরা আমার মতে সায় দিন বা না দিন, প্রত্যেকেই নিজের রীতিতে মাথা ঘামাবেন, আর একবার ভাবতে বসলে, রাষ্ট্রবিধি ও সমাজব্যবস্থার কথা তাঁরাও নিশ্চয় ভুলতে পারবেন না। কারণ চিত্তবিনোদনই সৎশিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য বটে, তবু লোকরঞ্জন আর লোকশিক্ষা হরিহরের মতো ঐকাত্মিক; এবং তাই আর্ট আর প্রোপ্যাগ্যাণ্ডার মালাবদল-ব্যাপারে ঢেঁট্‌রা পেটা পণ্ডশ্রম। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রূপস্রষ্টা প্রবক্তার সোদর।

বর্নার্ড্ শ

সে-দিনকার সংবাদপত্রে যখন পড়লুম যে অশীতিপর বর্নার্ড্ শ অতঃপর মুখ বুজে সভা-সমিতিতে তাঁর বয়ঃপ্রাপ্তির বার্ত্তা রটাবেন, তখন, সত্য বলতে কি, বেশ একটু ভয় পেয়েছিলুম। কারণ তাঁর সাহিত্যসাধনা আমার জন্মের আগেই সিদ্ধ হলেও, তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তির পরাকাষ্ঠা আমার ছাত্রাবস্থার সমসাময়িক; এবং তিনি যদি আজ বার্দ্ধক্যের চূড়ান্তে পৌঁছে থাকেন, তবে আমিও নিশ্চয় প্রৌঢ়ির উপান্তে পা দিয়েছি। প্রথমটায় মন এ-পরিবর্ত্তন মানতে চায় নি, স্মরণে এসেছিলো যে অন্তত ভুক্তভোগীদের মতে তারুণ্যের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক অত্যল্প, এবং ষ্টাইনাক্-ভোরোনোফ্-এর অস্ত্রচিকিৎসাতেও শ্রান্ত শরীরে পূর্ব্বরাগের পুলক আবার লাগবে না বটে, কিন্তু একবার জড়তা কাটিয়ে 'প্লেজ্—প্লেজেণ্ট্ এণ্ড্ অন্প্লেজেণ্ট্'-এর ধূলা ঝাড়তে পারলেই, মুমূর্ষু মনীষাও চিরনূতন সত্যের সংঘাতে যৌবন ফিরে পাবে। দুঃখের বিষয়, সোৎসাহ ঝাড়নচালনার পরেও এ-প্রত্যাশা অতৃপ্ত রইলো, বোঝা গেলো ওয়রেন্-জয়ার অধুনালুপ্ত যাদুর পিছনে নাট্যকারের দুঃসাহসিক স্পষ্টবাদিতা নেই, আমাদের প্রাক্‌সামরিক কৈশোরের গৈবী পাতকবিলাসই সেই উত্তর-চল্লিশ রূপজীবাকে রূপকথার নায়িকা বানিয়েছিলো।

অবশ্য শত চেষ্টা সত্ত্বেও 'ক্যাণ্ডিডা'-র বিরুদ্ধে আর অনুরূপ আপত্তি টিঁকলো না, অগত্যা স্বীকার করলুম যে সেই শুচিব্রতার আকর্ষণ পাঠকবিশেষের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির ধার ধারে না, তার আত্মস্থ উৎকর্ষ অনাগত নাট্যামোদীদেরও অর্শাবে। কিন্তু আমার উপভোগের বাধা তবু যেন ঘুচলো না; অবচেতনের অগাধ থেকে বররুচি হঠাৎ সন্দেহের স্বরে শুধোলো সে-পুস্তকের নামকরণে ভল্‌তেয়র-প্রণীত উপাখ্যানের ছায়াপাত গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রেত কিনা; এবং অনিচ্ছুক অন্তর্যামী অনেক ভেবে জবাব দিলে যে শ-এর প্রগল্‌ভ প্রতিভা অঘটনসংঘটনপটীয়সী নয়, সাধারণত পল্লবগ্রাহী, তাই যে-নির্ব্বন্ধ উপলব্ধির জোরে সেই ফরাসী ভাবুক তাঁর তুচ্ছতম প্রচারসাহিত্যকেও সনাতনের সকাশে পাঠাতেন, তা কোনো দিনই বুদ্ধিসর্ব্বস্ব বর্নার্ড্ শ-এর আয়ত্তে আসে নি। কিন্তু এ বোধহয় গায়ে প'ড়ে ঝগড়া; কারণ বই-দুখানির উপাধিগত সাদৃশ্য শুধুই আক্ষরিক, এমনকি ধ্বনিসাপেক্ষও নয়; এবং নাটকের নামনির্ব্বাচনকালে আপন প্রতিভার বংশপরিচয় হয়তো তাঁর অজ্ঞাতই ছিলো, কুলপঞ্জিকাটা পরবর্ত্তী সমালোচকদের আবিষ্কার। তাহলেও তাঁর সম্বন্ধে পরলোকগত ফ্র্যাঙ্ক্ হ্যারিস্-এর অভিযোগ অমূলক নয়, এবং অভিজ্ঞতা ও অনুকম্পার অনটনে

তাঁর নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ যেমন রক্ত-মাংসহীন যন্ত্রজগতেই থেমে আছে, তেমনি হার্দ্দ্য সঙ্কীর্ণতার দোষে তাঁর সমাজতন্ত্রবাদও কেবল আত্মপ্রসাদের ইন্ধন জুগিয়েছে, কখনো ফেবিয়ান্ সাবধানের ভবী ভোলে নি।

সুতরাং শ-এর সঙ্গে আর আমার পা মিলছে না দেখেও আমি অবিচলিত রইলুম, বুঝলুম এ-অসামঞ্জস্যের সঙ্গে আমার নিঃসংশয় বয়োবৃদ্ধির কোনো সম্পর্কই নেই; যারা এখনো দেহে তরুণ, তারা শ-এর বর্ষণহীন গর্জ্জন শুনে আমার চেয়ে বরং বেশি চটবে। কারণ অ্যাংলো-স্যাক্সন্ বিপ্লববাদীরা আজও যদিচ মার্ক্স্-বিমুখ, তবু অবস্থানুরূপ ব্যবস্থার উপরে রক্ষণশীলেরা স্থদ্ধ ভক্তি হারিয়েছে; এবং ফাশিস্ট্ আর কম্যুনিস্টের মধ্যে যতই মনান্তর থাক না কেন, অন্তত এ-বিষয়ে তারা একমত যে সব ছেড়ে শুধু সুযোগ খুঁজলে, কুযোগই আমাদের ঘিরে ফেলে; তখন তো গন্তব্য আর নজরে পড়েই না, এমনকি শুভ মুহূর্ত্ত চেনাও দুঃসাধ্য হয়। কিন্তু এ-মন্তব্য যে-পরিমাণ নৃশংস, সে-অনুপাতে ন্যায়পরায়ণ নয়; এবং এ-কথা সত্য বটে যে বর্নার্ড্ শ-এর জীবনে অহমিকা চির দিনই আদর্শের অগ্রগণ্য, তবু এ-দেশের সংযমী সংস্কারক-দের মতো তিনি কখনো বুক ফাটাকে মুখ ফোটার উপরে বসান নি, তাঁর প্রচণ্ড পরিহাসই উনিশ শতকের সর্ব্ববিধ অত্যাচার-অনাচারের প্রতি আমার সমবয়সীদের মনোযোগ সর্ব্বপ্রথমে আকর্ষণ করেছিলো। তাহলেও সদর্থক উপদেশের অভাবে সেই উপাদেয় বিদূষণ সে-কালের নিরুদ্যোগ মানুষকে কর্ম্ম-প্রবর্ত্তনার সুপথ্য জোগাতে পারলে না; এবং তাঁর শূন্য নির্ঘোষের নিরন্তর সঙ্গীতে আমাদের সদ্যজাগ্রত চৈতন্য আবার ঘুমে না ঢুল্‌লেও, বুদ্ধিমানেরা পর্য্যন্ত অবিলম্বে ভুললো যে বহিরাশ্রয় ব্যতীত বাক্যের কোনো অর্থ নেই।

হয়তো সেইজন্যেই মহাপ্রলয়ের ডাকে সমাজতান্ত্রিকেরাও সাড়া দিলে, সাত্ত্বিক স্বাধীনতাসেবীরাই সর্ব্বাগ্রে ভাবলে যে প্রাতঃস্মরণীয় আপ্তবাক্যগুলো জপতে জপতে শব্দব্রহ্মের উদ্দেশে প্রাণ সঁপলেই বিধ্বস্ত বিশ্বে সাম্য-মৈত্রীর পুনরাবর্ত্তন ঘটবে। অবশ্য এই অগ্নিপরীক্ষার দিনে বর্নার্ড্ শ ওয়েল্‌স্ বা গল্‌স্‌ওয়র্দি-র মতো নরমেধযজ্ঞের পৌরোহিত্যে মাতেন নি, উপনিপাতটাকে অনাদ্যন্ত প্রাণশক্তির দুরূহ খেয়াল ব'লে মেনে নীরবে অনুকূল লগ্নের আশাপথ চেয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রশংসনীয় মিতভাষণ সত্ত্বেও তিনিই আমাদের বাগ্‌জীবন বাল্যকালের প্রতীক; এবং তাঁর ও সমধর্ম্মীদের কাছে আমরা যেহেতু সংস্কৃতিসংরক্ষণের উপায় শিখি নি, আজন্ম শুধু নেতিবাচক সংস্কারমুক্তির প্রয়াস পেয়েছি, তাই আজকের জগদ্ব্যাপী নিরীহনিগ্রহও আমাদের টলায় না, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পৌর্ব্বাপর্য্য অলঙ্ঘনীয় জেনে আমরা প্রতিবাদের সময়টুকু কাটাই হিরণ্যগর্ভ মৌনের আড়ালে।

এখানে স্বভাবতই একটা আপত্তি উঠবে যে রসপ্রতিপত্তিই যখন সাহিত্য-সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন রসবিচারে রূপকারের শিল্পেতর জীবন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ; এবং এ-কথা যদিও সত্য যে বর্নার্ড্ শ-এর মতামত পোষণীয়তা বা যুক্তিসঙ্গতির জন্যে বিখ্যাত নয়, চমৎকারী স্বাতন্ত্র্যের কল্যাণেই বিশ্ববিশ্রুত, তবু 'পিগ্ম্যালিয়ন্,' 'সেণ্ট্ জোন্' ও আরো অনেক রচনার সাক্ষাৎ পরিচয়ে বিপক্ষেরা সুদ্ধ তাঁর দায়িত্ববোধের দৈন্য ভুলে যায়, এবং দুর্মুখেরাও আগে তাঁর কলাকৌশলের গুণ গেয়ে, পরে তাঁর আত্মবিজ্ঞাপন, প্রকৃতিকার্পণ্য ও চিত্তলাঘবের দোষ ধরে। কিন্তু বর্নার্ড্ শ নিজেই এই রকম অতিশিল্প সমালোচনার উদ্ভাবক, কীট্স্-এর 'নেগেটিভ্ কেপেবিলিটি' অথবা নৈরাত্ম্যসিদ্ধি তাঁকে কোনো দিনই টানে না, তিনি সদা-সর্ব্বদা শেলি-র সর্ব্বতোমুখী সংবেদনার গুণগ্রাহী ; এবং শিল্প ও জীবনের বৈষম্যে তাঁর অবিশ্বাস এত প্রবল যে ইবসেনী নাটক সামাজিক সমস্যার সমাধানকল্পে ব্যবহৃত ব'লে, সেই নাট্যকারকে তিনি স্বয়ং শেক্স্পীয়র-এর উপরে স্থান দেন। অবশ্য এই রুচিভেদের জন্যে শ-এর সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের বিবাদ নেই, বরঞ্চ সাম্প্রতিক বিদগ্ধমণ্ডলীর কাছে তাঁর নির্ভীক একদেশদর্শিতা ল্যাম্ব্-কোল্রিজ, ডাউডন্-ব্র্যাড্লি-র অন্ধ ভাববিলাস ও উচ্ছসিত স্তব-স্তুতির চেয়ে শ্রেয় ; এবং এ-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই বটে যে শেক্স্পীয়র মহাকবিদের মধ্যেও অদ্বিতীয়, তবু সুইন্বর্ন্ ও সাইমন্স্-এর মতো আমরা আর তাঁর কাব্যে স্বকীয় পলায়নপ্রবৃত্তির প্রতিচ্ছবি দেখি না, বুঝি যে নিজের সময় ও সমাজকে নিঃসঙ্কোচে মেনে নিয়েই তিনি কালের কবল থেকে নিস্তার পেয়েছিলেন।

কিন্তু প্রগতিপ্রেমিক বর্নাড্ শ-এর বিবেচনায় এ-ধরণের সমভাব অমার্জ্জনীয় ; এবং সেইজন্যেই তিনি তাঁর শুচিগ্রস্ত রঙ্গরচনার এলাকায় পারিপার্শ্বিকের অব্যাহত প্রবেশ অপছন্দ করেন, এমন অবাস্তব ঘটনা বা অমূলক চরিত্রের উপাদানে নাটকগুলিকে গ'ড়ে তোলেন যা তাঁর তত্ত্বসঙ্কুল ভূমিকাসমূহের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদাহরণ জোগাতে পারে। আসলে নিজের শিল্পপ্রেরণার উপরে তাঁর বিন্দু-বিসর্গ আস্থা নেই, তিনি জ্ঞানত সারা সংসারের দীক্ষাগুরু ; এবং আজকালকার প্রতিকূল পরিমণ্ডলে অকৃত্রিম প্রবক্তাদের প্রাণধারণ যেহেতু অসাধ্য, তাই বিবেকের বাধা স'য়েও তিনি শিশুসমাকীর্ণ সমাজকে চিনির পাকে নিম খাওয়াতে বাধ্য। ফলত তাঁর প্রত্যেক প্রহসনই অবসরবিনোদনের ক্ষমতা ধরে, তাঁর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসপুত্রদের অতিরঞ্জিত দুর্দ্দশায় আমরা নিশ্চয়ই হাসি, হয়তো অর্দ্ধচেতন আত্মশ্লাঘার ঝোঁকে অল্প কিছু ক্ষণ উদারনীতিতেও ডুবি ; কিন্তু সম্ভাব্যতার

অভাববশত তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের আত্মীয়তা আমাদের চোখেই পড়ে না; এবং যে-চিত্তশুদ্ধি শুধু ট্র্যাজিডির নয়, মোলিয়েরী বিদ্রূপ বা সুইফট্-প্রযুক্ত শ্লেষের অনিবার্য্য পরিণাম, তার অনুপস্থিতি ঢাকবার জন্যেই যেন শেভিয়ান্ নাটকের যবনিকা নামে।

সে যাই হোক, ভল্‌তেয়র-এর পরে একা বর্নার্ড্ শ ছাড়া দুরূহ দর্শনের এমন রমণীয় ব্যাখ্যান বোধহয় আর কারো শক্তিতেই কুলয় নি; এবং কালধর্ম্মের পরিবর্ত্তনে তাঁর তত্ত্বকথার প্রথম মুখপাত্র 'ম্যান্ এণ্ড্ সুপারম্যান্' আজ অনেকেরই ক্লান্তি জাগায় বটে, কিন্তু 'ব্যাক্ টু মেথুসেলা'-র প্রস্তাবনা ও উপসংহার শাশ্বত সৌন্দর্য্যের অধিকারী। ইতিপূর্ব্বে 'ক্যাশেল্ বাইরন্স্ প্রোফেশন্'-এর অমিত্রাক্ষর সংস্করণ সত্ত্বেও শ অনবদ্য গদ্যলেখক হিসাবেই আমাদের মন জুড়েছিলেন; এবং তাঁর ভাষায় যদিচ কোনো দিনই ভাবের অপ্রাচুর্য্য ছিলো না, তবু রচনারীতিতে প্রসাদ ও পৌরুষকে প্রাধান্য দিয়ে তিনিই ইংরেজী গদ্যসাহিত্য থেকে পেটরী অলঙ্কারবিলাস তাড়ান। এইবার হঠাৎ তাঁর কবিপ্রতিভার কিন্নরকণ্ঠ শোনা গেল; এবং অতঃপর আর সনাতনীদেরও বুঝতে বাকী রইলো না যে গদ্য-পদ্যের হর্বর্ট্ স্পেন্সর-প্রদত্ত সংজ্ঞাই নির্ভুল, অন্ততপক্ষে মুদ্রাকরদের প্রচলিত প্রথা না মেনে কাব্যকে সমমাত্রিক কিনারার মধ্যে ছাপালেও, তা কাব্যই থাকে। কিন্তু কবিতার জন্মব্যাপারে ছন্দ ইত্যাদি বাহ্য প্রকরণগুলো অনাবশ্যক হলেও, আন্তরিক হৃদয়াবেগ ব্যতীত তার উদ্ভব অভাবনীয়; এবং 'মেথুসেলা'-র অগ্রে ও পশ্চাতে প্রাগুক্ত প্রাণশক্তির প্রশস্তি গাইবার সময়ে শ যেকালে অবিশ্বাসী দর্শকবৃন্দের কথা মনে রাখেন নি, নিজের নিগূঢ় অনুভূতিই ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমাদের মত মিলুক আর নাই মিলুক, তর্কের অবকাশ না পেয়ে আমাদের সমবেদনা বেড়েই চলে।

সম্ভবত এইটাই বর্নার্ড্ শ-এর বিশিষ্ট উপলব্ধি; এবং ঐতিহাসিক কারণবশত উনিশ শতকের নাস্তিকতা তাঁকে না বর্ত্তালে, হয়তো লামার্কী অভিব্যক্তিবাদের বাইরেই তাঁর অমৃতপিপাসা মিটতো। কেননা তাঁর মরমী চিত্তবৃত্তি আপাততই ধর্ম্মদ্রোহী, আসলে তিনিও টেনিসন্-এর মতো কেবল কর্ত্তব্যের খাতিরে বিজ্ঞাননিষ্ঠা দেখান; এবং ভিভিসেক্‌শন্-এর নিষ্ঠুরতা ও চিকিৎসকদের অবিদ্যাই 'দি ডক্টর্স্ ডাইলেমা'-র উপলক্ষ জোগালেও, তিনি যে বস্তুত ভূমা আর ব্রহ্মাস্বাদের সাধক, তার প্রমাণ 'দি ব্ল্যাক্ গর্ল'-এর অভিরাম বিজ্ঞানবিদ্বেষ। সেইজন্যেই শ কখনো অন্ধ নিয়তির অকাট্য নিয়ম সইতে পারেন নি, এবং ডারুইনী বিবর্ত্তনের চেয়ে বের্গ্‌সনী 'এলাঁ ভিতাল্'-ই তাঁর বেশি বরণীয় লেগেছে; সেইজন্যেই প্রতিযোগী সমাজ-

ব্যবস্থায় তাঁর মন বসে নি, এবং প্রবৃত্তিচালিত মানবচৈতন্যে তিনি সামবায়িক সঙ্কল্পের বীজ ছড়িয়েছেন; সেইজন্যেই তিনি একাধারে কম্যুনিস্ট্ আর ফাশিস্ট্, প্রগতির অগ্রদূত, আবার মৃত্যুঞ্জয়ের ভাবিকথক, জীবনযাত্রানির্ব্বাহে জৈনশোভন অহিংসার পক্ষপাতী, অথচ রাষ্ট্রপরিচালনায় অমানুষিক স্বৈরতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক; এবং তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ যেমন মানদণ্ডনির্ব্বিচারে বিরাট, তেমনি গুণমুগ্ধদের কাছেও সে-ব্যক্তিস্বরূপের অবৈকল্য সংশয়াচ্ছন্ন।

বলাই বাহুল্য যে অনুরূপ সঙ্করতাই বর্ত্তমান সভ্যতার দারুণ দুর্লক্ষণ; এবং অনেকের অনুসারে প্রতিভা যেহেতু দূরদৃষ্টিরই পরম পরিণতি, তাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই বর্নার্ড্ শ আধুনিক আদর্শবিভ্রাটের ডাক শুনেছিলেন। সেইজন্যেই তাঁর সারা জীবন নিকামত তত্ত্বনিষ্কর্ষণে কাটলেও, তাঁর রচনাবলীর আষ্ঠে-পৃষ্ঠে সাময়িকতার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট; এবং এই সকল লেখা পরবর্ত্তী সৌন্দর্য্যসেবী বা সত্যসন্ধানীর কাজে লাগুক আর নাই লাগুক, এগুলোর উপকারিতা আগামী ঐতিহাসিকেরা নিশ্চয় সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করবে। অবশ্য তাঁর ক্ষেত্রে এই কালানুগত্যের সবটাই কিছু সুপ্রকট নয়; অনেকখানিই শুধু অনুমেয়; এবং অসঙ্গতির যে-আতিশয্যে আজকের বৈজ্ঞানিকেরা ধর্ম্মের দিকে ঝুঁকছে এবং ধার্ম্মিকেরা বিজ্ঞানের অভিমুখে এগোচ্ছে, অথবা শিল্পীরা প্রচারকার্য্যে নামছে এবং প্রচারকেরা কারুকলার সাহচর্য্য মানছে, তার আলোড়নে বর্নার্ড্ শ-এর বিচারবুদ্ধি বড় একটা ঘুলিয়ে ওঠে নি। কিন্তু আমাদের মতো দু নৌকোয় পা রেখে ভবনদী পেরোনোর সময়োপযোগী প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যেও চিরপ্রবল, কুয়ে-প্রস্তাবিত অকারী আত্মসম্মোহনের সাহায্যে সমাজের রোগমুক্তি তাঁরও অভিপ্রেত, এবং তিনি যখন ভাবেন যে সৎশিক্ষাই সাম্যবাদের জনক, তখন তাঁরও জানা নেই যে নরকের পথ সদিচ্ছায় বাঁধানো।

আমার বিশ্বাস আজকে সজ্জনদের মনও অনেকান্ত ব'লেই, মানবসভ্যতা মৃত্যুমুখে পতিত, এবং ভবিষ্যতে বাক্যব্যয় কমিয়ে শক্তিক্ষয় না বাড়ালে, তার উজ্জীবন একেবারে অসাধ্য। সেইজন্যেই বর্নার্ড্ শ-এর প্রতি আমার প্রাথমিক অনুরক্তি আজ আমি পাল্টে নিতে চাই; এবং আমার কৃতজ্ঞতা এ-কথা কোনো দিনই ভুলবে না বটে যে তিনি ইদানীন্তন স্বাধীন চিন্তার অন্যতম মন্ত্রদাতা, কিন্তু আমার পক্ষে আজ আর এমন ধারণা সহজ নয় যে আচারলুপ্ত বিবেচনায় তাঁরা যে-অতিজীবিত ঐতিহ্যকে আমাদের অবচেতনা থেকে উপড়ে ফেলেছেন, সে-ঐতিহ্য-ব্যতিরেকেও মনুষ্যধর্ম্ম টিঁকে থাকবে। কারণ দুর্মর প্রাণপ্ররোহ যদি বা কার্য্য-কারণের শিকল ছিঁড়তে পারে, তবু নিরবলম্ব শূন্যে তার স্বতঃস্ফূর্ত্তি অসম্ভব; এবং নীট্শে-র প্ররোচনায় তুলামূল্য উৎরোতে

গিয়ে শ-প্রমুখ প্রাগ্রসর নিয়ামকেরা আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, সেখানে হয়তো নিঃশ্রেয়স নেই, আছে কেবল নাস্তি। ফলে এখন প্রকৃষ্টচিত্ত মানুষেরাই বিশেষ ভাবে নিশ্চেষ্ট; যা নেই তার জন্যে সতর্কতা হাস্যকর, যা অনাগত তার বিষয়ে নিরাগ্রহ স্বাভাবিক, এবং ইতিমধ্যে যা ঘটছে তা নির্ব্বিকার নৈরাশ্যে তবু একটু বৈচিত্র্য জাগায়; সুতরাং তার পথে প্রতিবন্ধক জোটানো মূঢ়তা, সে-প্রযত্নও ক্ষতিকর, এত বৎসরব্যাপী প্রাণপাত পরিশ্রমে যে-প্রবঞ্চনা চুকেছে, তদুপলক্ষে শোকপ্রকাশ নিষ্প্রয়োজন, তদপেক্ষা অপরীক্ষিত মরীচিকাই শ্রেয়; আসলে আত্মরক্ষার কোনো মানে নেই, আমরা রামে মারলেও মরবো, রাবণে মারলেও বাঁচবোনা। তবে এ-সম্বন্ধে দুস্তর মতভেদ অবশ্যম্ভাবী; এবং আমি যেমন সনাতন সত্যে আস্থাবান, আমার মার্ক্‌স্‌-বাদী বন্ধুরাও তেমনি শ্রেণিগত মিথ্যায় বীতশ্রদ্ধ।

লিটন্ স্ট্রেচি

প্রথম যে-দিন লিটন্ স্ট্রেচির 'বুক্স্ এণ্ড্ ক্যারেক্টর্স্' পড়ি, যে-দিন আমার মনোভাব কীট্স্-বর্ণিত কর্টেজ্-এর অনুকরণ করেছিলো, মেনেছিলুম এই অন্তর্দৃষ্টির প্রতীক্ষাতেই বর্ত্তমান যুগ এত দিন নির্নিমেষ নেত্রে ব'সে থেকেছে ; উল্লসিত কল্পনাকে ভবিষ্যতে ছুটিয়ে ভেবেছিলুম অনাগতেরা বিংশ শতাব্দীর কাছে অনাসৃষ্টির কৈফিয়ৎ চাইলে, আমরা নিশ্চয় এই লোকটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্‌তে পারবো যে এ-কালের তথাকথিত ধ্বংসোন্মাদনা নিতান্তই মিথ্যাপবাদ, এবং জীবব্যবচ্ছেদের দক্ষতায় অন্যান্য যুগ আমাদের প্রতিযোগী হোক বা না হোক, আধুনিক শবসাধকেরাও যে অমৃতের বার্ত্তাবহ, তা অবিসংবাদিত। কারণ প্রাচীনেরা শুধু প্রামাণ্যের নিশ্চিন্ত রোমন্থনেই অর্ব্বাচীনদের অগ্রগণ্য ছিলেন ; সমুৎপন্ন সর্ব্বনাশে অর্দ্ধ ত্যাগ ক'রে তাঁরা পরবর্ত্তীদের প্রশংসা পেয়েছেন ; পরিব্যাপ্ত প্রতর্কে সকল তুলামূল্য ঝেড়ে ফেলে স্ট্রেচি-র মতো নৈরাত্ম্যসাধনায় নামা কখনো তাঁদের সাধ্যে কুলয় নি। উপরন্তু শুধু সংস্কারমুক্তিই স্ট্রেচি-র বৈশিষ্ট্য নয় ; তিনি কেবল মড়ার উপরে খাঁড়া চালিয়ে থামেন নি, মর্ম্মান্বেষী অস্ত্রকৌশলে অনায়াসেই দেখিয়েছেন যে খুঁজতে জানলে, যাদুঘরের মমির মধ্যেও চির প্রাণের সাড়া মেলে।

সেই সোৎসাহ ভক্তি হয়তো আর কারো সম্বন্ধে জাগবে না ; কিন্তু সে-দিনের পুলকিত বিস্ময়ের সমস্ত দায়িত্ব শুধু তারুণ্যের স্কন্ধে চাপিয়ে নির্ভাবনা হওয়াও দুঃসাধ্য। শেক্স্‌পীয়র-এর বিষয়ে বহু মতামত আজীবন শুনে আসছি, কিন্তু সে-নাট্যকারের শেষ পর্য্যায়-সম্পর্কে স্ট্রেচি-র নির্দ্দেশ আজও আমার কাছে দিব্য জ্ঞানের নিদর্শন ; সম্প্রতি বেডোস্-কে নিয়ে বেশ একটু কানাকানি চলেছে, তবু সেই উপেক্ষিত মহাকবির প্রসঙ্গে স্ট্রেচি-র বক্তব্য শুধু নূতন কথা নয়, শেষ কথাও বটে ; এবং "বুক্স্ এণ্ড্ ক্যারেক্টর্স্"-এর ব্যাপক উৎকর্ষে এ-দুটি উদাহরণের কোনো অসামান্য পদমর্য্যাদা নেই, স্থান ও সময়-সংক্ষেপের প্রয়োজন না ঘটলে, দশ-বিশ পাতা ধ'রে কেবল উপযোগী দৃষ্টান্তই সাজিয়ে যেতুম।

তার পরে "কুইন্ ভিক্টোরিয়া", "এমিনেণ্ট্ ভিক্টোরিয়ান্স্", "পোপ্" ইত্যাদি পুস্তক ও প্রবন্ধের প্রবর্ত্তনে আমার শ্রদ্ধা যখন প্রায় অসীমে ঠেকেছে, তখন হঠাৎ "এলিজাবেথ্ এণ্ড্ এসেক্স্"-নামক বইখানি হাতে এলো ; এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার উল্লাসের উচ্ছৃঙ্খলতায় কে যেন অলক্ষ্য গণ্ডি টেনে

দিলে। বইখানার বিরুদ্ধে যদিও কোনো প্রকাশ্য অভিযোগ খুঁজে পেলুম না, তবু একটা অহৈতুক অস্বস্তিতে আমার মন ভ'রে উঠলো; সন্দেহ হলো যে-অনুকম্পাকে বিশ্ববিস্তৃত ব'লে ভেবেছিলুম, বস্তুত তা হয়তো প্রাদেশিক। স্ট্রেচি-র আদেশে আমার শৈশবাদর্শ গ্লাড্‌স্টন্‌-এর বাগ্‌বাহুল্যে নিরর্থ প্রহেলিকার রিক্ত নির্ঘোষ শুনতে আমি প্রস্তুত ছিলুম; কিন্তু এলিজাবেথ্‌, এসেক্স্‌, বেকন্‌, রলে প্রভৃতি ষোড়শ শতাব্দীর প্রত্যেক প্রাতঃস্মরণীয়ই যে অবিকল একই শূন্যতার সন্তান, এমন দুঃসাহসিক সিদ্ধান্তে আমার বৈনাশিক বিবেকও আপত্তি তুল্‌লে। তাহলেও সে-নির্ব্বাক প্রতিবাদকে ভাষায় বাঁধতে আমি ভরসা পাই নি; কারণ তখনো পর্য্যন্ত স্ট্রেচি-প্রশস্তিই ছিলো বৈদগ্ধ্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ।

সম্প্রতি সেই শৃগালী ঐকতানে একটা স্বরবৈচিত্র্য লক্ষ্য করছি। আজকালকার বুদ্ধিঝলমল অত্যাধুনিকের দল রটিয়ে বেড়াচ্ছেন যে সাহিত্যসৃষ্টিতে লিটন্‌ স্ট্রেচি তো নগণ্য বটেই, এমনকি জায়গায় জায়গায় ব্যাকরণ বাঁচিয়ে বাক্যসংযোজনাও তাঁর দুঃসাধ্য। বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ-শুদ্ধি-সম্বন্ধে আমার মুখ স্বভাবতই বন্ধ। কাজেই এ-ক্ষেত্রে শুধু অন্ধ বিশ্বাসের শরণ নিয়ে সে-ক্ষণজন্মা মহারসিকদের উদ্দেশে আমি এইটুকুই বলতে পারি যে তাদৃশ ব্যাকরণদুষ্ট উপাদানে "কুইন্‌ ভিক্টোরিয়া"-র মতো আর একখানা বই তাঁরা যত দিন পর্য্যন্ত না লিখছেন, তত দিন তাঁদের গুরুনিপাতনী বিদ্যা কেবল অশোভন নয়, উপহাস্যও। এটা অবশ্য নিছক পক্ষপাতের কথা; এবং স্ট্রেচি-সম্বন্ধে হাল আমলের সমালোচনা অতিকথনে ভরা হলেও, তাঁর মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে প্রকাশিত "পোর্ট্রেট্‌স্‌ ইন্‌ মিনিয়েচার" পড়ার পরে আর এমন বিশ্বাসের অবকাশ থাকে না যে তরুণদের সকল আপত্তিই অমূলক। কিন্তু আসলে যেটা স্ট্রেচি-র প্রধান গুণ, সেটাই সময়ে সময়ে দোষের আকার ধরে; এবং তাঁর সিদ্ধি ও বৈফল্য এ-দুয়ের মূলেই আছে তাঁর অত্যুগ্র মাত্রাজ্ঞান।

সেইজন্যেই জনৈক সাহিত্যবিলাসী বন্ধু যখন "এলিজাবেথ্‌ এণ্ড্‌ এসেক্স্‌"-সম্বন্ধে আমার অভিযোগ শুনে বলেছিলেন যে বিশেষ ক'রে ওই বইখানাই তাঁর বিবেচনায় একেবারে গ্রীক্‌ নাটকের সঙ্গে তুলনীয়, তখন তাঁর মন্তব্যে সায় দিতে না পারলেও, সে-মতের পোষণীয়তা আমায় মানতে হয়েছিলো; এবং যাঁরা গ্রীক্‌ মনীষার মধ্যে প্রধানত সীমাসচেতন-তারই সন্ধান পান, তাঁদের বিচারে স্ট্রেচি-ও নিশ্চয় ধ্রুপদী-পদবাচ্য। কারণ হোমর-এর মতো স্ট্রেচি-ও জানতেন যে মহাপুরুষেরা সুদ্ধ দৈব দ্যুতক্রীড়ার অনিকাম পণ; আত্মবিস্মৃত মনুষ্যকীটের আস্ফালন দেখে আরিস্টফেনিস্‌-

এর মতো তাঁরও হাসি আসতো; সফোক্লিস্-এর সঙ্গে স্বর মিলিয়ে তিনিও গাইতেন যে মৃত্যুর মাতৃক্রোড়ে নিরাপদে না ফেরা পর্য্যন্ত মানুষের সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি অলীক ও অসার। কিন্তু মনুষ্যধর্ম্মের গণ্ডি টানতে গিয়ে গ্রীক্ কবি যে-অতিমর্ত্ত্য বোধির সাহায্যে ঈডিপাস্-এর মহাপতনেও তার কৈবল্যপ্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সে-রকম মরমী অনুকম্পায় স্ট্রেচি স্বভাবতই বঞ্চিত। তাই ইংরেজী ইতিহাসের একমাত্র নাটকীয় পটভূমিতে নেমেও এলিজাবেথ্, এসেক্স্ ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গেরা কুশী-লবই রয়ে গেছে, জীবন্ত নর-নারী হতে পারে নি: অভিনয় চূড়ান্তে পৌঁছেছে, কিন্তু যে-চিত্তশুদ্ধি ট্র্যাজেডির অবশ্যম্ভাবী উপসংহার তার আভাসটুকুও ধরা পড়ে নি।

তার মানে এ নয় যে সমসাময়িক সমালোচকদের মতো স্ট্রেচি-ও নিকষের নামোল্লেখেই চমকে উঠতেন; অথবা জীবনযাত্রায় মার্ক্স্-কীর্ত্তিত স্বতোবিরোধের যান্ত্রিক বিভাষাই তাঁর একমাত্র অন্বিষ্ট ছিলো। বরং তাঁর সম্বন্ধে উল্টো কথাই প্রযোজ্য; এবং প্রাক্সামরিক কেম্ব্রিজ্-এর লোকায়তিক আবেষ্টনে বড় হয়েও তাঁর মন কখনো মূর-এর সংশয়বাদে সায় দেয় নি, লোইস্ ডিকিন্সন্-এর মনুষ্যধর্ম্মেরই আশ্রয় নিয়েছিলো। তবে ডিকিন্সনী ভাববিলাস তাঁকে কোনো দিন পেয়ে বসে নি; এবং একবার প্লেটো-র কুহকে মজলে, পাছে শেলি-র আকর্ষণও অবশেষে অনিবার্য্য লাগে, সেই ভয়ে তিনি কখনো গ্রীসের নামসঙ্কীর্ত্তনে মাতেন নি, রাসীনী বিচারবুদ্ধির মধ্যেই ধ্রুপদের ধুয়ো শুনেছিলেন। হয়তা সেইজন্যেই তাঁর রচনারীতি ফরাসী আদর্শের কাছে অতখানি ঋণী; এবং তিনি কেবল প্রসাদগুণেই লা রশ্ফুকো-র উত্তরাধিকারী নন, তাঁর বিশিষ্ট জীবনবেদও সেই আভিজাতিক ঔদ্ধত্যের মুদ্রাঙ্কিত।

অবশ্য ঔদ্ধত্য গ্রীক্ সভ্যতারও দুর্লক্ষণ; এবং সে-দেশ যদিচ গণতন্ত্রের জন্মভূমি, তবু সেখানকার রাষ্ট্রব্যবস্থায় অধিকারভেদ থেকে দাসপ্রথা অবধি সর্ব্ববিধ অত্যাচার অঙ্গীকৃত হয়েছিলো ব'লেই, অবসরভোগী ভাবুকের দল সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার মৌখিক আদর-আপ্যায়নের সময় পেতেন। কিন্তু আঠারো শতকের ফরাসীদেশে শ্রমবিভাগ এত দূর পর্য্যন্ত এগিয়েছিলো যে অনুরূপ অবকাশ আর সমাজপতিদের ভাগ্যেও জুটতো না; কর্ম্মঠ মানুষেরা তো সদাসর্ব্বদা স্বার্থসংরক্ষণের চেষ্টা দেখতোই, এমনকি যারা বেকার, তারাও আধিদৈবিক উপনিপাত আসন্ন জেনে অবশিষ্ট আয়ুটুকু কাটাতো দায়িত্বশূন্য আমোদ-প্রমোদে। ফলত সেকালের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সনাতন সত্যসমূহে আস্থা খুইয়ে ক্ষুরধার বুদ্ধির চাকচক্যে নিরন্তর পরস্পরের চমক লাগাতো; এবং বুদ্ধি যেহেতু স্বভাবতই বৈনাশিক, তাই তার আক্রমণে তথাকথিত পরমার্থগুলোই নিপাতে যেতো না, সঙ্গে সঙ্গে মহত্ত্বও তাদের

কাছে মৃন্ময় ঠেকতো, আর তারা ভাবতো যে সংস্কারমুক্তির চরমে পৌঁছে তারা টেরেন্সী বিশ্বমানবিতাকে আয়ত্তে এনেছে।

বলাই বাহুল্য তাদের সে-বিশ্বাস সাধারণ আত্মশ্লাঘার মতোই অন্তঃসারশূন্য; এবং মনুষ্যধর্ম্ম প্রগল্‌ভতার উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, তার মূলমন্ত্র বিনয়। আমার মতে এলিজাবেথী সমাজ বিনয়-ব্যবহারে অনভ্যস্ত হলেও, তদানীন্তন সাহিত্যে বিনম্র বিস্ময়ের প্রাদুর্ভাব সুপ্রকট, এবং সেইজন্যে জ্ঞাতসারে গ্রীকো-রোমান্‌দের পদাঙ্কে চ'লে অষ্টাদশ শতক যেখানে প্রকৃত ধ্রুপদের তাল সাম্‌লাতে পারে নি, সেখানে খেয়ালী ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী অনিচ্ছা সত্ত্বেও যথাক্রমে লয় দিয়ে গেছে। কিন্তু তাই ব'লে সফোক্লিস্ আর শেক্স্‌পীয়র-এর অভিজ্ঞা এক নয়; এবং সেই আদিম পার্থক্যের ফলেই উভয়ের কলাকৌশল অতখানি বিভিন্ন। অর্থাৎ এলিজাবেথী নাট্যকারেরা বুঝতেন যে ঐতিহ্য-বিপ্লবের দিনে বিশেষ ও সামান্যের বিরোধ বাধলে, প্রথমোক্তের পরাজয় হয়তো শুধু সংখ্যার জোরেই, অবশ্যম্ভাবী; এবং তাই তাঁদের যুগে ট্র্যাজেডির পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। কিন্তু উক্ত উপলব্ধি তাঁদের তিক্ততা কমায় নি, বরং এমন বাড়িয়ে তুলেছিলো যে গতানুগতিক প্রণালীতে অথবা সাধারণবোধ্য উপায়ে সে-মর্ম্মান্তিক বিদ্রোহের অভিব্যক্তি সুদ্ধ তাঁদের সাধ্যে কুলয় নি, তাঁরা নিত্যনৈমিত্তিক ভাষার পাপস্পর্শ থেকেও মুক্তি চেয়েছিলেন।

এইখানেই ডান্ আর ড্রাইডেন্-এর আসল তফাৎ; এবং পোপ্-এর আমলে একটা নূতন ভারসাম্য তো কালগুণে গ'ড়ে উঠেছিলো বটেই, এমনকি সমাজের স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকতা ফিরে না এলেও, তাঁকে হয়তো এলিজাবেথী স্বাবলম্বনের শরণ নিতে হতো না। কেননা ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে আর ফ্রান্সে শ্রেণিভেদ এত দূর এগিয়েছিলো যে উচ্চস্তরের মানুষ প্রায়ই নিম্নবর্ত্তীদের অস্তিত্বটুকুও মনে রাখতো না। অন্ততপক্ষে তখনকার সাহিত্য শুধু সাম্প্রদায়িক অবসরবিনোদনের উপলক্ষ জোগাতো; এবং অভিজাত শিক্ষা ও সংস্কারের সাদৃশ্যবশত যেমন ভাব ও ভাষার দুরূহতা ঘুচেছিলো, তেমনি রুচি ধরেছিলো সার্ব্বজনীন আকার। অবশ্য সে-সার্ব্বজনীনতা সার্ব্বভৌম নয়, শ্রেণিগত। কিন্তু বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে তার ব্যতিক্রম ধরা পড়তো না; এবং সম্ভবত সেই কারণেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবেগবাহী কবিতা অপেক্ষাকৃত বিরল, সুলভ শুধু অত্যুত্তম বিতর্কবাচক গদ্য।

সৌভাগ্যক্রমে বিশুদ্ধ পদ্য যদি বা সম্ভবপর হয়, তবু বিশুদ্ধ গদ্য সোনার পাথরবাটির চেয়েও নিরুপাখ্য সামগ্রী; এবং এ-সত্য লিটন্ স্ট্রেচি এত গভীর ভাবে বুঝেছিলেন যে রচনারীতিতে অষ্টাদশ শতকী প্রসাদ এনেই তিনি থামেন নি, যে-প্রজ্ঞাবাদ সে-প্রাঞ্জলতার ভিত্তি, তার অনুশাসনে সহজাত কবি-

প্রতিভাকেও তিনি অকাতরে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। অতএব সকল কালের সর্ব্ববিধ আতিশয্যই তাঁর অসহ্য ঠেকতো; এবং স্বজাতির মুখরক্ষার খাতিরেও তিনি যেমন্ গর্ডন্-এর পানাসক্তি লুকতে পারেন নি, তেমনি এলিজাবেথী অতিমানুষ এসেক্স্-এর শিশুসুলভ মনোভাব তাঁর বিদ্রূপই জাগাতো। কিন্তু উপদেবতাদের ছলা-কলায় তিনি ধৈর্য্য হারাতেন ব'লেই, তাঁর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ন্যায্য নয় যে স্বভাবকার্পণ্যই তাঁকে মহাপুরুষ-সম্বন্ধে নিরুৎসাহ করেছিলো। বরঞ্চ তাঁর সমস্ত পুস্তকের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য এ-অপবাদের বিপক্ষে; এবং তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত "কারেক্টর্স্ এণ্ড্ কমেণ্টারিজ্" পড়লে, জানা যায় যে স্ট্রেচি কেবল ঐতিহাসিক মহাত্মাদেরই গুণগ্রাহী ছিলেন না, সমসাময়িকদের সমালোচনাতেও তিনি অদ্ভুত ঔদার্য্য দেখাতেন।

তাহলেও এমন বিশ্বাস হয়তো অনুচিত নয় যে মহত্ত্বের সকল আকার-প্রকার তাঁর কাছে সমান আদর পেতো না। স্ট্রেচি নিশ্চয়ই ভাবতেন যে সুবুদ্ধি ও সুরুচি, সহিষ্ণুতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, এই চারটি গুণই সভ্যতা ও সমৃদ্ধির মূল সূত্র; এবং সেইজন্যে যে-যুগ বা ব্যক্তির মধ্যে লক্ষণগুলি বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান, তারাই স্ট্রেচি-র শ্রদ্ধা-সমবেদনার সর্ব্বপ্রথম ভোক্তা। কিন্তু আঠারো শতক বা ভল্‌তেয়র যদিও ক্বচিৎ-কদাচিৎ তাঁর কলমে উচ্ছ্বাস জোগাতো, তবু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর মাত্রাজ্ঞানকে কেউই ঠেকিয়ে রাখতে পারতো না; এবং তিনি যেহেতু দেখেছিলেন যে স্বয়ং আকিলিস্-ও অভেদ্য নয়, তাই ক্ষেত্র-বিশেষে ভল্‌তেয়র-এর স্খলনপতনও তিনি অগত্যা মেনে নিতেন। এই সত্যানুরক্তিকে ছিদ্রান্বেষণের পর্য্যায়ে ফেলা অভিধানের অবমাননা; এবং চাঁদের কলঙ্কস্বীকার আর চন্দ্রসন্দর্শনে কুকুরের মতো চীৎকার যেমন এক নয়, তেমনি মনুষ্যত্বের সীমাবধারণ আর মহত্তের পরীবাদ স্বতন্ত্র।

আসলে স্ট্রেচি-র আগেও অনেক মনীষীই বুঝতেন যে সম্পূর্ণতা মৃত্যুর নামান্তর; এবং এ-দিক থেকে স্ট্রেচি-র নিরুক্তি বরং পূর্ব্বসূরীদের চেয়ে কম উগ্র; তিনি শুধু রোদ্যাঁ-র দৃষ্টান্তে অণুপ্রাণিত হয়ে ভাবতেন যে অতিমসৃণতার মোহ না চুকলে, ঐতিহাসিক প্রস্তরমূর্ত্তিগুলোয় প্রাণের ছোঁয়াচ লাগে না। শুনেছি চার্ব্বাকের বিবেচনায় যৌনবোধই জীবনের চরম ও পরম রহস্য। স্ট্রেচি নিশ্চয় সে-মতে সায় দিতেন না; তবে সম্ভবত এ-ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল ছিলো যে পাশবিকতার সকল স্মৃতি চিত্তপট থেকে মুছে গেলে, শিল্পী হয়তো কলের পুতুল অনায়াসে গড়তে পারে, কিন্তু মাইকেল্ এঞ্জেলো-র প্রতিযোগিতা তার সাধ্যে কুলয় না। সেইজন্যেই ভাষাব্যবহারের সময়েও তিনি অতি-মার্জ্জিত ঔজ্জ্বল্য বাঁচিয়ে চলতেন; এবং তৎসত্ত্বেও তার রচনা অসাধারণ রকমের ওজস্বী ও ঐশ্বর্য্যময় রূপ ধরতো সংযম আর সুব্যবস্থার ফলে।

কারণ আবাল্য ফরাসী গদ্যকারদের পঠন-পাঠনে তিনি শিখেছিলেন যে জীবন্ত ভাষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বেচ্ছাচারিতা নিষিদ্ধ; এবং তাই বিশ্লেষণে দেখা যায় যে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর প্রত্যেক ভগ্নাংশই বৈশিষ্ট্যবিহীন, শব্দগুলি এতই অভিমানবর্জ্জিত যে তদ্দ্বারা নিকৃষ্ট দৈনিকের সংবাদসরবরাহও সহজ ও সম্ভব, শুধু সামঞ্জস্য আর সঙ্গতির সংস্পর্শেই সে-অসার ধ্বনিপিণ্ড সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দ্যোতনা-ব্যঞ্জনার ভারবহনে সক্ষম। এইখানেই ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে রচনারীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; এবং জন্মগত পক্ষপাত পেরিয়ে সামান্যতার সার্ব্বজনীন সঙ্গমে না পৌঁছলে, মানুষ যেমন ব্যক্তিস্বরূপে অধিকার পায় না, তেমনি লৌকিক ভাষা অলৌকিক স্তরে ওঠে বিষয়ের গুরুত্বে অথবা বহিরাশ্রয়ের জোরে। কিন্তু এই আত্মবিসর্জ্জন প্রকৃত বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী নয়: প্রসঙ্গনির্ব্বাচন লেখকের সঙ্কল্পসাপেক্ষ; এবং সঙ্কল্প ব্যক্তির বংশানুক্রমিক সম্পত্তি নয়, স্বোপার্জ্জিত বৈভব।

পক্ষান্তরে মাত্রজ্ঞান আর মূল্যজ্ঞানের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান; এবং রীতি-বিচারে শুচিবায়ু যতই দূষণীয় হোক না কেন, সমালোচকের পক্ষে অবিবেক মারাত্মক। সুতরাং স্ট্রেচি-সম্বন্ধে আধুনিকদের অধিকাংশ অনুযোগ আমার কাছে অগ্রাহ্য ঠেকলেও, আমি তাঁর সঙ্গে একবাক্যে এ-কথা বল্‌তে অপারগ যে অব্যক্ত মহত্ত্বের আবিষ্কারই বৈদগ্ধ্যের প্রথম কর্ত্তব্য, প্রতিষ্ঠার সমাদর বহু পশ্চাতে। এ-সমভাব যে প্রভূত ঔদার্য্যের পরিচায়ক, তা বোধহয় তর্কাতীত। কিন্তু ক্ষুদ্রের ভিতর মহত্ত্বের বিদ্যুদ্বিলাস ক্বচিৎ কখনো দেখা গেলেও, তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ ইহজগতে দুর্লভ; এবং স্ট্রেচি-র মতো বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন এ-সত্য জেনেও উল্লিখিত মন্তব্যপ্রচার করেছিলেন, তখন এমন অনুমান একেবারে পরিত্যাজ্য নয় যে প্রচ্ছন্ন মহত্ত্বের অবগুণ্ঠন-মোচন উপলক্ষমাত্র, তাঁর আসল অভিপ্রায় শিখণ্ডীর আড়াল থেকে ভীষ্মের নিপাতন। বলাই বাহুল্য সে-ভীষ্ম যেখানে শুধু ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক, সেখানে পদ্ধতিটা খুবই প্রশস্ত, এবং শঠের প্রতি শাঠ্যের প্রয়োগে নীতিকারদেরও সমর্থন আছে।

এ-দিক থেকে দেখলে, মেরি বেরি-র হাতে হরেস্‌ ওয়ল্পোল্‌-এর দর্পহরণ যেমন সার্থক, তেমনি শোভন। কিন্তু স্ট্রেচি এতে তুষ্ট নন; ব্যাসকূটের মোহ মাঝে মাঝে তাঁকেও যেন পেয়ে বসে; তখন আর তিনি মনে রাখতে পারেন না যে ফরাসী অমরপরিষদের দ্বার প্রেসিদাঁ দ ব্রোসেস্‌-এর করাঘাতে খোলে নি। সে-নির্ব্বোধের চক্রান্তেই ভল্‌তেয়র-এর মুখে একবার চুণ-কালি পড়েছিলো ব'লে, তিনি তাঁর মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার জোরে তাকে মহানন্দে বাঁচিয়ে তোলেন। দুঃখের বিষয়, এ-রকম বুদ্ধিবিভ্রাট স্ট্রেচি-র শেষ জীবনে

নাতিবিরল। ফলত কোনো কোনো স্ট্রেচি-বিদ্বেষীর বিবেচনায় এলেক্‌জ্যাণ্ডর পোপ্-এর মতোই স্ট্রেচি-র প্রতিভা অসাধারণ হলেও, অনুপকারী; এবং প্রাক্তন প্রগল্‌ভতার প্রেরণায় তিনি কৈশোরান্তেই এমন অকালপক্ক চিত্তবৃত্তি অর্জ্জন করেছিলেন যে পরবর্ত্তী পরিণতির স্বপ্নও আর তাঁকে টলাতে পারে নি, তাঁর জীবনে অবশিষ্ট দিনগুলি কেটেছিলো প্রাথমিক অভিজ্ঞতার চর্ব্বিতচর্ব্বণে।

তবে উক্ত মনোভাবের জন্যে তাঁর চিরকালীন অস্বাস্থ্যও অনেকাংশে দায়ী; এবং অকাল মৃত্যুর অপচ্ছায়ায় জীবনের যাথার্থ্য সচরাচর অগোচরেই থেকে যায়। তাছাড়া অন্য উপায়েও স্ট্রেচি-র দুর্নাম খণ্ডনীয়; এবং প্রতিপক্ষের জবাবে তিনি অনায়াসেই বলতে পারেন যে তাঁর লেখায় প্যারাডক্স্-প্রীতির নামগন্ধ নেই, আছে কেবল সত্যনিষ্ঠা। সত্যের স্বরূপ যে প্রায়ই স্বতোবিরোধী, তা আমরা জানি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও আমাদের অবিদিত নয় যে রবি-বাসরিক পাঠশালাপরিচালনের ভার স্ট্রেচি-র উপরে না পড়াই বাঞ্ছনীয়; কারণ স্ট্রেচি ঐতিহাসিক-রূপে খ্যাতি অর্জ্জন করেন নি, তিনি প্রসিদ্ধ রূপকার হিসাবে। এইখানেই তিনি অনুকরণীয়, এইজন্যেই তিনি ঈর্ষ্যাভাজন; এবং ইতিহাস-রচনা যদিচ কঠিন, তবু সেজন্যে জন্মগত প্রতিভা অনাবশ্যক; ফ্রূড্, ক্রাইটন্, গিজো, যাঁদের নির্ব্বিশেষ অপকর্ষে স্বভাবস্বতন্ত্র স্ট্রেচির অবজ্ঞা ও আক্রোশ অনন্ত, এমনকি তাঁরাও তথ্যানুসন্ধানে তাঁর গুরুস্থানীয়।

স্ট্রেচি মিথ্যাবাদী এমন কথা আমি ঘুণাক্ষরেও বলতে চাই না। কিন্তু প্রয়োজনমতো যাথার্থ্য-অতিক্রমণের ক্ষমতা ধরেন ব'লেই তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও নমস্য। এই শক্তিপ্রয়োগেই তিনি জীবনচরিতকে নীরস ঘটনা-তালিকার মরুভূমি থেকে বাঁচিয়ে অনির্ব্বচনীয় শিল্পলোকে এনেছেন; এবং মানুষ নিয়ে যাদের কারবার, তাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বুঝেছেন যে চরিত্রচিত্রণে সত্য বাদ পড়লেও, হয়তো চলে, কিন্তু সত্তার অভাবে মৃত্যুই অনিবার্য্য। ফলে যেখানে প্রাতিভাসিক সত্য কোনো বিরাট সত্তার প্রতিকূল, সেখানে তিনি সমগ্রতার খাতিরে সত্যবলিদানের পক্ষপাতী। কেননা সঙ্কল্পসিদ্ধির নির্ব্বন্ধে সত্যের গ্রহণ-প্রত্যাখ্যান আর্টিস্ট্‌মাত্রেরই অধিকারগত; এবং মনুষ্যজীবনের দিকে ঐতিহাসিকের অদূরদর্শী চক্ষে না তাকিয়ে স্ট্রেচি যত ক্ষণ রূপদক্ষের অবিকল দৃষ্টিতে দেখেন, তত ক্ষণ তাঁর সঙ্গে কোনো রসিকেরই বিবাদ বাধে না।

কিন্তু মর্য্যাদায় কেবল অবৈকল্যই সত্যের পূর্ব্বগামী; এবং সেই-জন্যেই যখন দেখি যে তাঁর করকৌশলে সত্যও রসাতলে যায় অথচ অখণ্ডতাও অপ্রকাশ থাকে, তখন তাঁর বিরুদ্ধে তরুণদের দুরুক্তিগুলোকে অল্প-বিস্তর অকাট্য ঠেকে। অবশ্য 'কুইন্ ভিক্টোরিয়া'-র মতো 'এমিনেন্ট্

ভিক্টোরিয়ান্স্'-ও প্রায় সর্ব্বত্রই রসোত্তীর্ণ; তাই সেখানে ন্যুম্যান্-এর কাল্পনিক অশ্রুপাত মোটেই অমার্জ্জনীয় নয়; কারণ ম্যানিং-ন্যুম্যান্-এর বিসংবাদে ন্যুম্যান্-এর শ্রেষ্ঠতা এত সুস্পষ্ট যে অবাস্তব কান্নাতেও তাঁর গৌরব কমে না, বরং সংঘর্ষের নাট্যগুণ বাড়ে। কিন্তু রেল্ স্টেশনে অপহৃত ব্যাগের শোকে ক্রাইটন্-এর অধৈর্য্য—সত্য, তথা সমগ্রতা, দু দিক থেকেই সে-ব্যাপার যত বা অপ্রাসঙ্গিক, ততোধিক মূল্যহীন। তবে অসময়ে অপ্রাসঙ্গিকের অবতারণা হাস্যরস-উৎপাদনের সুপরিচিত উপায়; এবং সাধারণ জীবনযাত্রার অসঙ্গতি দেখে হাসতে না পারলে, অহরহ আমাদের কেঁদে কাটতো।

উপরন্তু ভিক্টোরিয়ান্দের সঙ্গে আমার মতো নাড়ীর যোগ সকলের না থাকলেও, এতে কারোই সন্দেহ নেই যে বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়ার মানুষী অভ্যাস সে-যুগে মহামারীর আকার ধরেছিলো; এবং এমন সিদ্ধান্তও আপাতত ভ্রান্ত যে তদানীন্তন স্বর্গ-নরকের বিকল্প ডস্টয়েভ্স্কি-র পদ্ধতি ব্যতীত অবর্ণনীয়। অবশ্য সেজন্যে স্ট্রেচি-র বিদূষকশোভন শ্লেষ বা বক্রোক্তিই হয়তো নান্য পন্থা নয়। কিন্তু এলিজাবীথান্দের সম্বন্ধে কোল্‌রিজ্-এর পদাঙ্কে না চলেও, তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি যেমন সকল শেক্স্‌পীয়র-পাঠকের স্মরণীয়, তেমনি বিগত শতাব্দীর সম্পর্কে স্ট্রেচি-র একদেশদর্শিতা মনে রেখেই আগামী ঐতিহাসিকেরা সে-বকধার্ম্মিক যুগের যথাযথ পরিচয়ে এগোবেন। আমি জানি এ-ভবিষ্যদ্বাণী অতিবাদের নিকটাত্মীয়; কিন্তু স্ট্রেচির মনীষা অলোকসামান্য, তাঁর অবদান অনবতুল এবং অতীতের পুনরুজ্জীবনে তিনি যে-প্রকরণ খাটিয়েছেন, তার উপযোগিতা এতই স্বতঃপ্রমাণ যে জ্ঞানত বিপরীতগামী হলেও, তরুণেরা এখনো স্ট্রেচি-রই অনুকারী।

উইণ্ড্যাম্ ল্যুইস্ ও এজ্রা পাউণ্ড্

প্যারিস্ কম্যুন্-এর তাণ্ডবে ধৈর্য্য হারিয়ে, গুস্তাভ্ ফ্লোবেয়র স্বাবলম্বী শিল্পের আইভরি মিনারে আত্মরক্ষার আয়োজন করেছিলেন। কারণ তাঁর মনে হয়েছিলো যে সে-তনুবাত শিখরে হিমের প্রকোপ যদিও প্রচণ্ড, তবু পারিপার্শ্বিক গ্রহ-নক্ষত্র সেখানে অম্লান, জনতার পাশব চীৎকার সেখানে সুদূরপরাহত। কিন্তু গণতন্ত্রে বীতশ্রদ্ধ হলেও, ফ্লোবেয়র রাজতন্ত্রকে সংশয়ের চক্ষে দেখতেন; এবং বর্ত্তমানের সংসর্গে তিনি যেমন বদ্ধমূল থাকতে পারেন নি, তেমনি ভূত-ভবিষ্যতের স্বপ্নও তাঁকে শান্তি দেয় নি। সেইজন্যেই কলাকৌশলের অতখানি বহিরাশ্রয়িতা সত্ত্বেও তিনি ধ্রুপদী লেখকদের শেষ বংশধর নন, অত্যাধুনিক খেয়ালী সাহিত্যের অগ্রদূত; সেইজন্যেই তিনি নিষ্কাম অথচ বৈনাশিক, নির্লিপ্ত কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক আখ্যার যোগ্য নন; সেইজন্যেই তাঁর নিজের সুবুদ্ধি সুবিখ্যাত বটে, তবু তাঁর মন্ত্রশিষ্য মোপাসাঁ-র মৃত্যু উন্মাদরোগে। আসলে স্বপ্রাধান্যের পরিসমাপ্তি প্রজ্ঞাপারমিত স্বোহংবাদে, যেখানে সঙ্গতি অথবা প্রকৃতিস্থতা নিরর্থ ও নিষ্প্রয়োজন; এবং যুক্তির ধর্ম্ম যেহেতু একাধিক ব্যক্তির মধ্যে ঐক্যস্থাপন, তাই এক ও অদ্বিতীয় ভগবানের মতো নীট্‌শে-র অতিমানুষও ন্যায়বিচারে উদাসীন।

তাহলেও এ-যুগের রূপকার ফ্লোবেয়র-এর পদাঙ্কে চলতে বাধ্য, তাঁর আদর্শ ছাড়া আমাদের হয়তো গত্যন্তর নেই। কেননা সম্বন্ধমাত্রেই আদান-প্রদানের ফল, এবং শিল্পের পক্ষে সমাজশোভনতা যতখানি আবশ্যক, সমাজের শিল্পশোভনতা ততোধিক অপরিহার্য্য। সুতরাং এমন সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই পোষণীয় যে শুধু আত্মাভিমানী কবিরাই আজ সংসারবিবাগী নয়, সঙ্কীর্ণ সংসারও তাদের অপাংক্তেয় করেছে। এই ব্যবধান দিন দিন এ-রকম দুস্তর হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে অচির ভবিষ্যতে সভ্যসমাজ থেকে শিল্পের চির নির্ব্বাসন প্রায় নিঃসন্দেহ। উপরন্তু অনেকের মতে সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে এই বিসংবাদ এমনি সনাতন ও সার্ব্বভৌম যে এ-ক্ষেত্রে মধ্য পথের কল্পনাও হাস্যকর; এবং উইণ্ড্যাম্ লুইস্ বিশদ বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে অধিকাংশ আপাতনিরপেক্ষ লেখকই ভিতরে ভিতরে পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট। কিন্তু স্বয়ং ল্যুইস্ ছাড়া অন্যান্য সাহিত্যিক যদিচ এক বা অপর দলের অন্তর্ভুক্ত, তবু মুখে সে-কথা মানতে সকলেই অসম্মত; এবং এলিয়ট্-আদি ঐতিহ্যনিষ্ঠেরা সমালোচনার সময়ে যতই সমাজসেবা শেখান না কেন, রচনার বেলায় তাঁরা প্রত্যেকেই সেই সমাজকে কেবল বিদ্রূপবাণ হানেন।

অবশ্য সেজন্যে ল্যুইস্ তাঁদের নিন্দনীয় ভাবেন না। কারণ ক্রিশ্চানী হিতোপদেশে ভক্তি না থাকলেও, আদমকৃত আদিম পাতকে তাঁর অগাধ বিশ্বাস; এবং তিনি জানেন বটে যে গ্রীক্ শিল্পের দৃষ্টান্তে আর্টে জীবনের প্রতিবিম্ব খুঁজতে গিয়েই পশ্চিমী ললিত কলা আজ যথাসর্ব্বস্ব খুইয়েছে, কিন্তু মানুষ-সম্বন্ধে গ্রীক্ নাটকের খেদোক্তিতে তাঁর সমর্থন আছে। ল্যুইস্-এর বিবেচনায় মানুষ অভিশপ্ত, তার সমাজে শৃগালের শাঠ্যে সিংহের নিপাত অবশ্যম্ভাবী, তাব গুণ গাওয়া যেমন গর্হিত, তাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া তেমনি প্রশংসনীয়। সেইজন্যেই ব্যক্তি হিসাবে অভিং ব্যাবিট্ তাঁর কাছে মর্য্যাদা পেলেও, ব্যাবিট্-প্রবর্ত্তিত মনুষ্যধর্ম্ম তাঁর চক্ষুশূল। কেননা মানুষের ধর্ম্ম বলতে তিনি বোঝেন অনাচার আর অত্যাচার; তাই মানুষের পূজা দূরের কথা, তার মনোরঞ্জনও তাঁর অসহ্য লাগে। কিন্তু আধুনিক লেখকেরা এমনি কাপুরুষ যে 'বিশ্ববৈরী' ল্যুইস্-এর অনুসরণে তাঁরা পশ্চাৎপদ। দুর্বৃত্তের দুরভিসন্ধি-আবিষ্কারের ভার ফ্রয়েডী ড্রেন-পরিদর্শকের উপরে চাপালে পাছে তাঁদের নিজস্ব আত্মপ্রসাদের ফাঁকি ধরা পড়ে, এই ভয়ে তাঁরা শুধু রূপসৃষ্টিতে সন্তুষ্ট নন, অমূলক মনস্তত্ত্বের পৃষ্টপোষণে মানুষী স্খলন-পতন-ত্রুটির ব্যাপদেশসন্ধানেও তাঁরা বদ্ধপরিকর।

অথচ লেখক আর পাঠক যেকালে ভিন্ন স্তরের জীব, তখন তাদের মধ্যে সন্ধির আশাও বিড়ম্বনা। কাজেই ল্যুইস্-এর বিচারে শতকরা নিরেনব্বই জন লেখকই হয় রূপকারী বিবেকে বঞ্চিত, নয় ঘরের শত্রু বিভীষণ, এবং সমগ্র আধুনিক সাহিত্যই জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অপলাপে পরিপূর্ণ। কিন্তু তার মানে এ নয় যে ল্যুইস্ কলাশুদ্ধির পুরোধা। বরং উল্টো দিকেই তাঁর ঝোঁক; এবং তিনি শুধু রিচার্ড্সী কাব্যার্চ্চনাকেই আক্রমণ করেন নি, হেন্‌রি জেম্‌স্-এর সৌন্দর্য্যবিলাসও তাঁর বিদ্বেষের বস্তু। কারণ ল্যুইস্-এর মতে জেম্‌স্-এর শিল্পপ্রাণতা স্বায়ত্তশাসনের ধার ধারে না, জেম্‌সী বৈদগ্ধ্য নিরুপদ্রব জীবনযাত্রানির্ব্বাহের উপলক্ষমাত্র। হয়তো সেইজন্যেই এ-যুগের উন্নাসিক কাব্যবিবেচকদের কাছে জেম্‌স্-এর অত প্রতিপত্তি! সেই স্বদেশপলাতক স্নবের মতো আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিও নারীসুলভ। তাই আজকালকার সুকুমার বৃত্তি যুক্তিনির্ভর তত্ত্বে, বুদ্ধিপ্রসূত রাজনীতিতে, সঙ্গতিসাধক শিল্পে আর আরাম পায় না; এ-কালের উদ্বাস্ত দৃষ্টিতে ছদ্ম ঐতিহ্যের নির্ব্বিঘ্ন গড্ডলিকাই অগতির গতি। এই মনোভাবের সঙ্গে উনিশ শতকের শেষ দশার সাদৃশ্য এত সুস্পষ্ট যে ল্যুইস্-ও মারিও প্রাৎস্-এর নির্দ্দেশে অধিকাংশ আধুনিক লেখককেই অস্কার ওয়াইল্ড্-প্রমুখ 'সয়তানী' বিকৃত-চেতাদের সগোত্র বলতে প্রস্তুত।

এ-অনুমান যদি মিথ্যাও হয়, তবু হাল আমলের ক্লাসিক্ হাল-চালে তাঁর হাসি আসে। কারণ যে-পরিগ্রহণ প্রাচীন সাহিত্যের পরম সম্পদ, তাতে অর্ব্বাচীনেরা নিতান্ত নিঃসম্বল; দিনগত পাপক্ষয় তাঁদের ধাতে সয় না ব'লেই, তাঁরা প্রুস্ৎ-এর শুচিগ্রস্ত অন্তর্দর্শনের অন্ধ ভক্ত। অবশ্য ল্যুইস্-ও মানেন যে পূর্ব্বসূরীদের উদাহরণ-ব্যতিরিকে শিল্পাভ্যাস অসম্ভব। কিন্তু আদর্শের মূল্যবিচারে তিনি বর্ষগণনার পক্ষপাতী নন, তাঁকে টানে শুধু মানদণ্ডের সময়োপযোগিতা; এবং তাঁর বিবেচনায় বর্ত্তমান মানুষ যেহেতু বীভৎসরসেরই উৎস, তাই সাময়িক সাহিত্যকে তিনি পেটর-এর ছুৎমার্গে চালাতে চান না, স্যুইফ্‌ট্-প্রবর্ত্তিত ব্যঙ্গরচনাই তাঁর বাঞ্ছিত পদ্ধতি। অর্থাৎ ল্যুইস্ বিশ্বাস করেন যে মানুষ দুর্গ্রহের ঝুঁকি নিয়েই জন্মায়; আত্মচরিতকে ট্র্যাজিডির অতিরঞ্জনে রাঙিয়ে তোলার সাধ যদি বা তার থাকে, তবু সে-সাধ্যে সে একেবারে বঞ্চিত। কাজেই পরবশ মনুষ্যজীবন ল্যুইস্-এর কাছে পুতুলনাচের মতো একটা যান্ত্রিক প্রহসনমাত্র; তার মধ্যে অভিপ্রায়ের অন্বেষণ কেবল পণ্ডশ্রম নয়, অমঙ্গলকরও বটে।

উপরে যা বললুম, তাতে যুক্তিসঙ্গতির চেয়ে স্বতোবিরোধই হয়তো বেশি। কিন্তু সেজন্যে সমালোচক ততটা দায়ী নয়, যতটা দায়ী স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্তা। কারণ 'মেন্ উইদাউট্ আর্ট্'-এর* মুখবন্ধে ল্যুইস্ যদিও সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছেন যে সাম্প্রতিক সাহিত্যাচার্য্যদের কুৎসা রটানোয় তিনি অনিচ্ছুক, লেখকবিশেষকে নিদর্শন হিসাবে ধ'রে সাহিত্য-সম্বন্ধে কতকগুলো সামান্য সত্যে পৌছনোই তাঁর উদ্দেশ্য, তবু কার্য্যত সে-গন্তব্যে তিনি যেতে পারেন নি, ছিদ্রান্বেষণের কুটিল পথে একাধিক বার দিশাহারা হয়েছেন। তাহলেও বইটি ভাবুকমাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য; এবং ল্যুইস্-এর মন্তব্য প্রামাণ্য না হলেও, প্রণিধেয়, তাঁর বক্তব্যে তর্কের অবকাশ আছে বটে, কিন্তু শুভ বুদ্ধির অভাব নেই। পক্ষান্তরে ল্যুইস্ যেকালে দার্শনিক নন, মুখ্যত শিল্পী, তখন তাঁর সিদ্ধান্তে ব্যাপ্তি খোঁজা অনুচিত। তিনি যে লোকপ্রসিদ্ধিতে ভয় না পেয়ে সর্ব্বপূজ্য মৃন্ময় মূর্ত্তিগুলির সাক্ষাৎকারে এগিয়েছেন, শুধু এই দুঃসাহসের জোরেই আলোচ্য পুস্তকখানি স্মরণীয়।

কিন্তু এ ছাড়া আরো অনেক গুণে 'মেন্ উইদাউট্ আর্ট্' ঐশ্বর্য্যবান। ল্যুইস্-এর রচনারীতি সত্যই উপভোগ্য, তাঁর শ্লেষবাণের প্রায় প্রত্যেকটিই লক্ষ্যভেদী, তাঁর ধীশক্তি আশ্চর্য্য রকমের সচেতন। তাঁর ভক্তেরা তাঁকে ড্রাইডেন্-এর সমকক্ষ ব'লে ভেবে থাকেন; এবং লুইস্-এর সম্প্রতি প্রকাশিত

---

*Men Without Art—by Wyndham Lewis (Cassell).

পরিহাস-কবিতা প'ড়ে এ-দাবিতে সায় দেওয়া যদিও শক্ত, তবু বাদ-বিতণ্ডায় তিনি বারম্বার যে-দক্ষতা দেখিয়েছেন, তা অষ্টাদশ শতকেরই যোগ্য। উপরন্তু 'মেন্ উইদাউট্ আর্ট্'-এর মূল প্রতিপাদ্যের আমি সমর্থন করি। ল্যুইস্-এর মতোই, শিল্প আমার অবসরবিনোদনের সাথী নয়, চিত্তশুদ্ধির সহায়। তাই আমার নিকষেও বিদূষকের গৌরব বন্দীর অপেক্ষা অধিক। আজকের জগতে যারা হাসতে জানে না, তারা তো শেষ পর্য্যন্ত কাঁদবেই, এমনকি মতিভ্রান্তিও হয়তো তাদের অনিবার্য্য বিধিলিপি।

'মেন্ উইদাউট্ আর্ট্'-এর অভিব্যাপ্ত দুরুক্তি থেকে কেবল এক জন নব্য লেখক অল্পে অব্যাহতি পেয়েছেন; এবং তিনি হচ্ছেন এজ্রা পাউণ্ড্। কিন্তু এই লোভনীয় সম্মান পাউণ্ড্-এর প্রাক্তন সুকৃতির পুরস্কার নয়, সেজন্যে তাঁর ইহলীলার বিশৃঙ্খলাই ধন্যবাদার্হ। যে-জীবন্মুক্তিকে ল্যুইস্ মনীষার তন্মাত্র বলেছেন, অনেকে পাউণ্ড্-এর জীবনে, তথা রচনাবলীর মধ্যে, তার পরাকাষ্ঠা দেখেন। কারণ পাউণ্ড্ কখনো ভুলেও প্রিয়চিকীর্ষার পথে চলেন নি; পঞ্চাশোর্দ্ধে পৌঁছেও তিনি আজ উদ্ভট আর উৎকটের আকর্ষণে আবিষ্ট; পরের মুখে ঝাল খাওয়ায় তাঁর এত আপত্তি যে 'এ-বি-সি অফ্ রীডিং'-নামক পুস্তকে তিনি চসর-কে ঠেলে তুলেছেন শেক্স্পীয়র-এর উপরে। শুনেছি ইংরেজির চেয়ে চীনভাষাতেই তিনি বেশি ব্যুৎপন্ন, স্বদেশের চেয়ে ক্রবাতুর-দের জন্মভূমির সঙ্গে অধিক পরিচিত, তর্কযুদ্ধে মসিব্যয়ে ততটা অভ্যস্ত নন, যতটা সিদ্ধহস্ত অসিচালনে।

তত্রাচ তাঁর সম্বন্ধে বাতুল-বিশেষণটা শব্দের অপপ্রয়োগ; তিনি যথার্থই প্রতিভাবান। পাউণ্ড্ ইদানীন্তন কাব্যকলার উদ্ভাবক; এবং আবহমান রচনারীতির অকৃপণ গুণগ্রাহী। তাঁর সুমন্ত্রণায় শুধু অপরিণত শিল্পীরাই উপকৃত হন নি, য়েট্স্-এর মতো আত্মস্থ কবিও সে-প্রভাবের মূল্য মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। অবশ্য তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা সন্দিহান, কিন্তু সে-বিদ্যানুরাগের বিস্তার সর্ব্ববাদিসম্মত; এবং নানা দেশের গদ্য-পদ্যের যে-সমস্ত অনুবাদ তিনি এত কাল ইংরেজ পাঠককে উপহার দিয়ে এসেছেন, তাতে যদিও ভাষাতত্ত্ববিদের মন ওঠে না, তবু তার প্রত্যেকটিই রসোত্তীর্ণ। পাউণ্ড্ সমালোচক হিসাবেও নমস্য। সত্য বটে তাঁর মত পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুর মতোই অস্থির, এবং তিনি নিশ্চয়ই নিন্দা-প্রশংসা দুয়েতেই শতমুখ; তাহলেও এলিয়ট্, জয়েস্, ল্যুইস্ ইত্যাদি সাহিত্যরথীরা পাউণ্ড্-এরই আবিষ্কার। সুতরাং তাঁর রুচি অমোঘ; এবং যে-কাব্যজিজ্ঞাসার দ্বারা ভাবিকথন সম্ভব, তার একদেশদর্শিতা বাহ্য ও নগণ্য।

পক্ষান্তরে পাউণ্ড্-এর কল্যাণেই ল্যুইস্-এর সঙ্গে আমাদের প্রথম

পরিচয় ঘটলেও, এই দুই দিক্‌পালের মধ্যে আকাশ-পাতালের তফাৎ; এবং গুরু-শিষ্যের প্রকৃতিগত প্রভেদ সুপ্রকট হেন্‌রি জেম্‌স্-প্রসঙ্গে উভয়ের মতদ্বৈতে। অবশ্য পাউণ্ড্-এর বিচারেও জেম্‌স্ অনবদ্য নন। কিন্তু ল্যুইস্ যেখানে তাঁর বিরুদ্ধে গণমনোভাবপোষণের অভিযোগ আনেন, সেখানে পাউণ্ড্ তাঁকে দোষ দেন, আভিজাতিক নিরাসক্তির জন্যে। কারণ পাউণ্ড্ 'অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট্ প্যাটর্ন্'-এ বা বিষয়বিবিক্ত রূপকল্পে আস্থাহীন; হয়তো পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর অনুযোগ নেই, কিন্তু বিগ্রহের মধ্যে তিনি বিগ্রহাতীতের আবির্ভাব খোঁজেন; কাব্যের অভিধাকে রসাত্মক বাক্যে আটকে রাখতে তাঁর সাময়িকতায় বাধে বটে, তবু কবিতা যে আবেগ-প্রভব, তা তিনি নিঃসঙ্কোচে মানেন। সেইজন্যেই তাঁর বিশ্বম্ভর অনুকম্পা থেকে মালার্মে বাদ পড়েছেন; সেইজন্যেই ভালেরি কীর্ত্তিত প্রতীকের স্বাধিকারস্বীকারে তিনি অক্ষম; সেইজন্যেই হৃদয়বান রেমি দ গুর্ম তাঁকে চির দিনের মতো বিস্ময়বিমুগ্ধ ক'রে ফেলেছেন। আসলে অর্জ্জিত বিদ্যায় আধুনিকদের নেতৃস্থানীয় হলেও, পাউণ্ড্ স্বভাবত ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্-পন্থী; এবং তাঁর রচনায় অভিব্যক্তি যদিও সমাদৃত, তবু তাঁর কাব্যের মুখ্য উপজীব্য অভিজ্ঞতা।

তবে হাল আমলে কোল্‌রিজী দীর্ঘসূত্রতার সুযোগ নেই; এবং আজকের দিনে বাক্‌জীবন নাবিক যেমন দুর্লভ, গন্তব্যবিস্মৃত বরযাত্রীও তেমন বিরল। এটা পরিভাষার যুগ; সংসারের বৈচিত্র্য এখন এত বেড়ে গিয়েছে যে সাঙ্কেতিক ভিন্ন তার সময়োচিত প্রকাশ অসাধ্য। কাজেই সংক্ষিপ্ততার খাতিরে পাউণ্ড্-ও আলেখ্যপ্রধান কাব্য লিখতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তাঁর শব্দচিত্র নিরালম্ব নয়, জীবন্ত উপলব্ধির অভিজ্ঞান; তাঁর অলঙ্কার-মাত্রেই রূপক। কারণ পাউণ্ড্ বিশুদ্ধ শিল্পের লোকোত্তর জয়যাত্রায় পরাংমুখ; পদার্থবিদের মতো তিনিও ইন্দ্রিয়ার্থপ্রসিদ্ধির দাস; এবং বিজ্ঞান যেমন অভূতপূর্ব্ব ঘটনার ব্যাখ্যায় উপমিতির শরণ নেয়, তিনি তেমনি তাঁর অপরূপ অভিজ্ঞতার বিবরণে অগত্যা উপমা-উৎপ্রেক্ষাকে প্রশ্রয় দেন। অর্থাৎ পাউণ্ড্-এর মতে কাব্যগত চিত্রকল্প মনোরাজ্যের গূঢ়ৈষণাগ্রন্থির সমতুল্য; এবং ওই শেষোক্ত ক্ষেত্রে যে-অনুভূতিসংমিশ্রণ দেখা যায়, কবির ভাবচ্ছবিতেও তার আভাস মেলে ব'লেই পাউণ্ড্ 'ইমেজিস্ট্'।

উল্লিখিত মতামতের ল্যুইসী টীকা বানানো সহজ; এবং মূল প্রবন্ধাবলী না হোক, 'মেক্ ইট্ নু্য'-এর * প্রক্ষিপ্ত উক্তিগুলি অহঙ্কৃত। কিন্তু ম্যাথ্যু আর্নল্ড্-এর ফিলিস্টিয়া-ভীতির মতো পাউণ্ড্-এর লোকহিংসাও আত্যন্তিক

*Make It New—by Ezra Pound (Faber).

হিতৈষণার ফল, তাতে আত্মম্ভরিতার নামগন্ধ নেই। আজকালকার কোনো কবি যদি মরমী সমর্পণের মানে বুঝে থাকেন, তবে তিনি 'ক্যাণ্টোজ্'-প্রণেতা এজ্রা পাউণ্ড্। কারণ ওই অসমাপ্ত মহাকাব্য বিশ্বমানবের জীবনেতিহাস, তার কোনো নায়ক নেই; এবং তাতে ব্যক্তি দূরের কথা, বিভিন্ন দেশ ও কালের সীমাসন্ধি সুদ্ধ পাউণ্ড্ মানেন নি। তিনিও স্পেংলার-এর মতো প্রগতিবিমুখ, তাঁর চক্ষেও সভ্যতা ঘূর্ণাবর্তের স্বরূপ, এবং এই ভ্রমিজাত সমধর্মী বুদ্বুদগুলোকেই তিনি ব্যক্তি ব'লে ভাবেন। তাই 'ক্যাণ্টোজ্'-এ ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য গ্রাহ্য হয় নি, এবং রিনেসেন্স্-এর ষড়যন্ত্রী ইটালিয়ান্‌রা সশরীরে মার্কনী বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশাধিকার পেয়েছে। এই দিক থেকে 'ক্যাণ্টোজ্'-এর সঙ্গে 'ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড্'-এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এলিয়ট্-এর প্রসঙ্গই শুধু অনাত্ম, এবং পাউণ্ড্ বিষয় ও ব্যঞ্জনা দুয়েতেই নৈর্ব্যক্তিক।

কারণ তাঁর দার্শনিক দৃষ্টি তো স্পেংলার-এর অনুবর্ত্তী বটেই, উপরন্তু অভিজ্ঞতার স্বরূপ-সম্বন্ধে তিনি ক্রোচে-র শিষ্য। হয়তো পাউণ্ড্-ও মনে করেন যে অভিজ্ঞতা নিজের অভিব্যক্তি নিয়েই লোকসমক্ষে আসে, এবং ভাষার দারিদ্র্যে ভাবের অকিঞ্চিৎকরতাই ধরা পড়ে। সম্ভবত সেইজন্যেই তিনি তাঁর মহাকাব্যের প্রকাশিত চল্লিশ সর্গ কেবল অনুবাদ আর উদ্ধারের সাহায্যেই লিখেছেন। মানুষ যখন অভিজ্ঞতার কল্যাণেই স্মরণীয়, তখন ব্যক্তিত্ব একটা উপসর্গমাত্র; এবং বর্ণনা যথাযথ না হলে, অভিজ্ঞতার যেহেতু মানহানি ঘটে, তাই কবির পক্ষে স্বকীয়তাসম্পাদন দোষাবহ, তার কর্ত্তব্য অনুকরণ, অথবা, প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে, সাক্ষী-সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা। এইখানেই এলিয়ট্-এর সঙ্গে পাউণ্ড্-এর বৈষম্য। এলিয়ট্ পরিণামবাদী; ক্ষণপ্রাণ অভিজ্ঞতাকে কর দিতে তিনি কুণ্ঠিত; তাঁর পৃথিবীর মানদণ্ড ধর্ম্মের শাশ্বত নগাধিরাজ। অতএব আবেগের চাঞ্চল্যকে তিনি সইতে পারেন না; তাঁর কাছে মনুষ্যজীবন ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়; মরুভূমির পরপার থেকে তাঁকে ডাকে শুধু সৃষ্টি ও সমালোচনার তীর্থসঙ্গম। পাউণ্ড্ সেই মরীচিকার পিছনে ছুটতে অসম্মত। ফলত তাঁর আর এলিয়ট্-এর মধ্যে বিচ্ছেদ ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

অবশ্য পাউণ্ড্ আলোচ্য পুস্তকে এত কথা বলবার সময় পান নি; এবং 'মেক্ ইট্ ন্যু'-এর বিষয়সূচী এমনি বিপ্রযুক্ত যে তার পৃষ্ঠায় কোনো সুচিন্তিত মতবাদের প্রতিষ্ঠা বা খণ্ডন দুষ্কর ব্যাপার। উপরন্তু অন্যান্য ভূয়োদর্শীর মতো পাউণ্ড্-ও নৈয়ায়িকের উপরে রুষ্ট; তাঁর বিশ্বাস তিনি তত্ত্বপিপাসু নন, তথ্যসন্ধানী। কিন্তু নিঃসম্পর্ক কৈবল্যই যদি তথ্যের লক্ষণ

হয়, তবে তা শুধু অন্বীক্ষারই বহির্ভূত নয়, ভাষারও অতীত। কারণ ভাষা সামান্যবাচক; এবং পাউণ্ড্ যেকালে তাঁর ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ-সম্বন্ধে নীরব নন, অতিশয় বাঙ্ময়, তখন ঐকান্তিক অভিজ্ঞতার অখণ্ড উপভোগ তাঁর আয়ত্তাতিরিক্ত, তিনিও বৈশিষ্ট্যের ধ্যানমূর্ত্তিকে জ্ঞানগোচরে আনেন সাধারণ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। বলাই বাহুল্য যে এরই নাম এলিয়টী ঐতিহ্য; এবং এর স্বপক্ষে পাউণ্ড্-এর কোনো উদ্ধারযোগ্য উক্তি আমার জানা নেই বটে, কিন্তু ডাগ্‌লাসী অর্থবিজ্ঞান-সম্বন্ধে তাঁর দুরূহ উৎসাহ নিশ্চয়ই বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গলের জন্যে। দুঃখের বিষয়, এই দুর্ব্বলতা-স্বীকারে তাঁর দ্বিধা আছে; এবং সেইজন্যে 'মেক্ ইট্ ন্যু'-এ আধুনিক ফরাসী কবিদের তালিকা দিতে গিয়ে তিনি এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত যে সমসাময়িক শিল্পের নির্ব্বাচনক্ষেত্র দ্বিধ্রুবীয়; তার এক পাশে উইণ্ড্যাম্ ল্যুইস্-এর নিঃসঙ্গ গিরিবর্ত্ম, যার যাত্রীরা আত্মসমাহিত, অন্য দিকে জ্যুল্ রোম্যা-র জনাকীর্ণ রাজপথ, যার পথিকরা তদ্‌গতচিত্ত।

আমার বিবেচনায় ওই পথদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ নেই; ও-দুটো বিপরীত-গামী হলেও, ওদের লক্ষ্য এক; অতিমানুষ যেমন অলৌকিক কল্পরাজ্যের অধিবাসী, বিশ্বমানবও তেমনি অন্তর্ভৌম অবচেতনলোকের জীব; এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্মিতার মতো সার্ব্বজনীন সাযুজ্যও একটা অতিবাস্তব প্রত্যয়। এতএব এ-উভয়সঙ্কটে কোনো এক দলে নাম লেখানো নিষ্প্রয়োজন; পাউণ্ড্-এর মতো দু নৌকায় পা রেখেও শিল্পোৎপাদক নৈরাত্ম্যসাধনায় এগোনো যায়। তবে এই রকমের অন্যায় স্থিতিস্থাপকতায় হয়তো দার্শনিক মহলে কুনাম রটে। কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষতি নেই, কারণ নির্লিপ্ত সর্ব্বাস্তিবাদীই যে কাব্যভারতীর প্রিয়পাত্র, তার অজস্র প্রমাণ পাউণ্ড্-এর অসংখ্য কবিতায় বর্ত্তমান। সুতরাং তাঁর আদর্শকে বুঝতে চাইলে, 'মেক্ ইট্ ন্যু'-এর প্রবন্ধ-কটা পর্য্যাপ্ত নয়; সেজন্যে তাঁর সমগ্র রচনাবলী পড়াই বিধেয়। কেননা, পূর্ব্বেই বলেছি, পাউণ্ড্-এর প্রয়োগপ্রবণ মন পরমার্থের প্রতিকূল; ব্যাবহারিক সত্যের তন্ময় উপলব্ধিই তাঁর ব্যক্তি-স্বরূপকে অলোকসামান্য ক'রে তুলেছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতেও সে-গুণ ভূরি পরিমাণে মেলে; তাই অন্তত আমার কাছে এই প্রবন্ধগুলি, মন্ত্রদ্রষ্টার অসম্বদ্ধ সূত্রের মতো, স্বাধীন ভাষ্যের ভিত্তিভূমি।

ঐতিহ্য ও টি-এস্ এলিয়ট্

কবিদের কাণ্ডয় জনসাধারণ যতই হাস্থক না কেন, তবু তার সম্বন্ধে কিংবদন্তীর অন্ত নেই। এই রূপকথাগুলোর মধ্যে যেটা সবচেয়ে দুর্মর ও রহস্যময়, সে হচ্ছে প্রেরণা-নামক এক অলৌকিক শক্তি। যাঁরা কবিতা লেখেন না, শুধু পড়েন, যাঁরা লেখা, পড়া কিছুরই ধার ধারেন না, তাঁরা যদি ভাবেন যে কাব্যরচনার জন্যে বুদ্ধি-বিদ্যা, শিক্ষা-দীক্ষা, সাধনা-সংযম, এ-সমস্তই অনাবশ্যক, প্রয়োজন শুধু অখণ্ড অবসর আর অপার দৈবানুগ্রহ, তবে প্রতিবাদ ক'রে লাভ নেই; কেননা কার্য্য-কারণ-বিধির প্রাত্যহিক ব্যতিক্রমই নৈমিত্তিক জীবনের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু যখন কাব্যরচয়িতা বা কাব্যবিবেচকদের মধ্যেও অনেকে এই উপকথার প্রশ্রয় দেন, তখন কাব্যজিজ্ঞাসুর পক্ষে বিস্ময়বোধই একমাত্র মনোভাব। এ-কথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে শিল্পী ও কারুকর্ম্মী—আর্টিস্ট্ ও আর্টিজ্যান্—এদের উদ্যোগে কোনো মূলগত প্রভেদ নেই, পার্থক্য শুধু এদের মানসিক সংগঠনে। অর্থাৎ কারুকর্ম্ম একটা চিরাচরিত প্রথার নিশ্চিন্ত অনুকরণ, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই, তার গোড়ায় নেই এষণার একাগ্রতা; কিন্তু শিল্পসৃষ্টি উদ্বুদ্ধ চৈতন্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তার প্রত্যেক অঙ্গ সজীব ও অপরিহার্য্য, প্রত্যেক অলঙ্কার বহু পরীক্ষার ফল।

তার মানে এ নয় যে রূপকার আদর্শমুক্ত; বরং উল্টোটাই তার পক্ষে বেশি সত্য। কিন্তু ঐতিহ্য-ব্যতিরেকে—ট্র্যাডিশন্ ব্যতীত—শিল্পসৃষ্টি যদিও একেবারেই অসম্ভব, তবু তার অনুবৃত্তি প্রাণহীন নয়, সঙ্কল্পের সংস্পর্শে সঞ্জীবিত, তার অনুকরণের উদ্দেশ্য উদ্ভাবন। হয়তো সেইজন্যেই কখনো কোনো যথার্থ আর্টিস্ট্‌কে স্বয়ম্ভু ব'লে বোধ হয় না। কিন্তু তার আত্মপরিচয় গোত্রপরিচয়ের মধ্যে নিহিত থাকলেও, তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য পারিবারিক ইতিহাসে রূপান্তর ঘটায়, যে-ঐতিহ্যপরম্পরা তাকে অনুপ্রাণিত করে, তার স্বরূপ বুঝতে গেলে, আগন্তুককে আর বাদ দেওয়া চলে না। এই দিক থেকে দেখলে, কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট কাব্যধারা নদীর সঙ্গে তুলনীয় নয়, তাকে একখানা অসমাপ্ত অট্টালিকার মতো লাগে। এই অট্টালিকার সূত্রপাত মানুষের প্রয়োজনসিদ্ধির খাতিরে, এর বৃদ্ধি মানুষের মর্জ্জিতে, এর ধ্বংসও মানুষের অযত্নে। শুধু তাই নয়, এই অট্টালিকার ভবিষ্যৎ বিস্তার ভিত্তিস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গেই অংশত নির্দ্ধারিত বটে, কিন্তু প্রত্যেক যোগ-বিয়োগে তার অঙ্গসঙ্গতি বদলায়; এবং তার মৌল প্রকৃতি

যেমন সংযোগমাত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি সংযোগমাত্রেই তাতে পরিবর্ত্তন আনে।

উপমাটা উপযোগী কিনা জানি না, কিন্তু এটা নিশ্চয় বুঝি যে সৎ কবিরা অতিচেতন মানুষ, অদৃষ্টের অনুগ্রহে তারা যদিও বঞ্চিত নয়, তবু তাদের কীর্ত্তিতে প্রকৃতির চেয়ে পুরুষকারের প্রসাদই বেশি। এই সত্যকেই ঘুরিয়ে বলতে পারি যে রূপসৃষ্টির অনেকখানিই সমালোচনার অন্তর্গত। কেবল প্রসঙ্গ ও পদ্ধতি-নির্ব্বাচনে দক্ষতা দেখালেই, মহাকবির মর্য্যদা মিলে না, তার জন্যে প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন কাব্য-রচনার যথাযথ মূল্যবিচারও অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ কাব্যের স্বভাব-সম্বন্ধে, সাহিত্যের ইতিহাস ও পরিণতি-সম্পর্কে কবিমাত্রেই স্থির সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য; এবং এই বিশ্বাসের প্রমাণ-স্বরূপ বেন্ জন্সন, ড্রাইডেন্, কোল্‌রিজ্ ইত্যাদির মতো বিশ্ববিশ্রুত কবি-সমালোচকদের সালিশ মানার দরকার নেই, ইংরেজী সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসই আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে; শিশুশিক্ষার কথা স্মরণ করলেই, মনে পড়বে যে অন্ততপক্ষে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে সাহিত্যের নব যুগ কখনো বিনা আয়োজনে প্রবর্ত্তিত হয় নি। অন্য দেশের সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় পরোক্ষ; তাই সে-প্রসঙ্গে জোর গলায় কিছু বলা অশোভন। তবে আরিস্টফেনিস্-এর প্রহসন পড়লে, এ-ভুল চোকে যে গ্রীক্ সাহিত্যের আদর্শ-সম্বন্ধে একা আরিস্টট্‌ল্-ই উৎসুক ছিলেন; এবং গোয়েটে, শিলার, লার্ম'ন্টফ্, টল্‌স্টয়্, ইব্‌সেন্, ষ্ট্রিণ্ড্‌বের্গ্, কাদু'চি, এমনকি টুর্গেনিভ্ ও য়েট্‌স্-এর মতো বিশুদ্ধ শিল্পীরাও, সাহিত্যিক বাদানুবাদের জন্যে প্রসিদ্ধ।

পক্ষান্তরে শেক্স্‌পীয়র-এর মতো দু-এক জন মহাকবি মেলে, যাঁদের শিল্পাদর্শ-সম্বন্ধে কোনো বৃত্তান্তই আমাদের জানা নেই, যাঁরা প্রকাশ্যে কোনো থিওরির বিষয়ে মাথা ঘামান নি, তেমনি অখ্যাত, অনাড়ম্বর ও স্বতঃসিদ্ধ ভাবে অমর কাব্য লিখে গেছেন, যেমন অজ্ঞাতসারে চলে সাধারণ প্রাণীর জীবনযাত্রা। কিন্তু এই নিশ্চেষ্টা ও নির্ভাবনা নিশ্চয়ই আমাদের স্বকপোলকল্পিত। কারণ যে-কবির জিজ্ঞাসা সিনেকা, মেকিয়াভেলি, মতৈঁই-এর মতো বিপরীতধর্ম্মী দার্শনিকদের দুরূহ মতবাদকে অত সহজে পরিপাক ক'রে ফেলেছিলো, যার কৌতূহল প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ব্যবহারশাস্ত্র, জ্যোতিষ, পুরাণ, রূপকথা, যাদুবিদ্যা প্রভৃতি মানুষী সভ্যতার কোনো উপকরণকেই বাদ দেয় নি, মানব-সম্পর্কের গবেষণায় যে-ব্যক্তি সম্ভবত বিকারকে সুদ্ধ নিঃসঙ্কোচে মেনে নিয়েছে, কেবল নিজের জীবিকার মূলানুসন্ধানে সে নিরাগ্রহ, এমন বিশ্বাস কোনোমতেই পোষণীয় নয়। তাছাড়া

শেক্স্পীয়রী কলাকৌশলের অস্থৈর্য্য সুপরিচিত; এবং এই পরীক্ষাপ্রবণতা একমাত্র জিজ্ঞাসু মনেরই লক্ষণ।

তাহলেও এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য্য যে সমালোচনার তাগিদ সকল কালে সমান নয়। শেক্স্পীয়র-এর সময় যতখানি কাব্যবিবেচনা কবিদের পক্ষে আবশ্যিক ছিলো, আমাদের যুগে তার পরিমাণ বহু গুণ বেড়েছে। কলাশুদ্ধির পুরোধারা আর্টের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে যতই বাড়াবাড়ি করুন না কেন, তবু একেবারে জীবন্মুক্ত মানুষ বন্ধ্যাপুত্রের চেয়েও দুর্লভ; এবং জীবন যেহেতু শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার বিকল্পে তরঙ্গায়িত, তাই শিল্পপ্রসূ সামঞ্জস্যসাধনের প্রয়োজন কোনো সময়ে উহ্য, কখনো বা ব্যক্ত। সাহিত্যের মূল সমস্যা আর দর্শনের সনাতন প্রশ্ন, এ-দুটিকে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ঠেকলেও, এদের পার্থক্য কেবল ভাষার, ভাবের নয়। শুধু কবি কেন, আমার বিশ্বাস ভাবুকমাত্রেই যে-রহস্যের উদ্ঘাটনে বদ্ধপরিকর, সে হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের, ব্যষ্টি ও সমষ্টির, বিশেষ ও সাধারণের সম্পর্ক। যে-সময়ে সমাজবন্ধন নিবিড়, যখন লোকোত্তর আদর্শের প্রতি মানুষের ভক্তি অচলা,—যেমন ছিলো মধ্য যুগের য়ুরোপে—তখন কাব্যবিবেচনাকে গৌণ ক'রে, মুখ্যত অনুকরণের সাহায্যেই কাব্যরচনা সম্ভব। কিন্তু যখন উপনিপাত বিশ্বব্যাপারের ছত্রপতি, যখন অতিজীবিত আদর্শকে আঁকড়ে থাকা মারাত্মক,—যেমন আমাদের যুগে—তখন স্রষ্টা আর সমালোচক প্রায় সমার্থবাচক।

এলিজাবেথী ইংলণ্ড এই দুই সীমান্ত প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী। সেখানে কবিত্ব গণ্য, মান্য উপজীবিকাগুলোর অন্যতম ব'লে বিবেচিত হতো না বটে, কিন্তু সুকুমার বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সে-দিনকার সমাজে কবির উপকারিতা শূন্যে এসে ঠেকলেও, নবরত্ন-সভার শিরোমণি হিসাবে সে তখনো সমাদৃত। সে-কালের ভাবুক ন্যায়নিষ্ঠ বিধাতার সম্বন্ধে শুধু শ্রদ্ধাই হারিয়েছে, মনুষ্যজীবন যে দৈবেরই খেয়ালে উপদ্রুত, সে-বিষয়ে সন্দিহান হয় নি। সে-অবস্থায় অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে সাংঘাতিক সংঘাত স্বভাবসিদ্ধ নয়: তখন পঙ্গু সমাজের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা জাগ্রত ব্যক্তির পক্ষে যদিও কষ্টকর, তবু সে-অসঙ্গতির জন্যে সমাজকে কেউ দোষ দিচ্ছে না, বলছে ব্যক্তিই উৎকেন্দ্রিক। আমার বিশ্বাস শেক্স্পীয়র-এর মনোভাবও গোড়ার দিকে এ-মতের বিরুদ্ধে যায় নি। অবশ্য তিনি নাটকের ধ্রুপদী আদর্শে কোনো দিনই আস্থা দেখান নি। কিন্তু এখানে শেক্স্পীয়র আবিষ্কারক নন্, অনুসারকমাত্র। তাঁর কলম ধরার আগে থেকেই ইংরেজী নাটকের নব বিধান এমনি আসর জমিয়ে বসেছিলো যে রূপান্তরের কথাও কারো মাথায় ঢোকে নি। সেইজন্যেই বেন্ জন্সন্ যখন প্রাচীন পদ্ধতির

পঙ্কোদ্ধার করলেন, তখন তাঁর ভাগ্যে সাধুবাদের চেয়ে পরীবাদই জুটেছিলো বেশি।

সে যাই হোক, নাটকের তৎকালীন আদর্শকে শেক্স্পীয়র আমরণ মেনে চলতে পারলেন না। হ্যাম্লেট্-রচনার সময়ে তাঁর মনে নানা বিরোধের উদয় হলো, এবং তারই ফলে অন্তকালে হ্যাম্লেট্ ওথেলো-র চরমোক্তির প্রতিধ্বনি করলে না। কারণ সে ছিলো আধুনিক কালের অগ্রদূত, ব্যক্তিবাদের প্রথম ভয়াবহ বিকাশ; তার মুখ দিয়ে শেক্স্পীয়র এমনি স্বতন্ত্র, এতই স্বকীয় কথা বলতে চেয়েছিলেন যে সে-চরিত্রের রহস্য চির দিনই সাধারণ জ্ঞানের বহির্ভূত থাকবে; এবং একবার এই অনন্যগোচর পথে চলার পরে প্রাক্তন অবস্থায় ফিরতে আর তাঁর মন সরে নি। সেইজন্যেই তাঁর শেষ জীবনের তথাকথিত কমেডিগুলো অত দুর্বোধ্য, অমন বিশৃঙ্খল; কোনো গতানুগতিক কাঠামোয় মূর্ত্তিগঠনের চেষ্টা সেগুলোয় নেই, আছে কেবল স্বকীয়তাপ্রকাশের অসম্বদ্ধ আনন্দ। হয়তো শুধু এই কারণেই অত তিক্ততা, অত হিংস্রতা, অত বৈষম্য সত্ত্বেও, সে-রচনা-কটিকে সমালোচকেরা কমেডিরই পর্য্যায়ে ফেলেছেন।

ষোড়শ শতকেই যখন স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা অত বেড়ে উঠেছিলো, তখন বিংশ শতাব্দীতে পরিবর্ত্তন স্বভাবতই আবশ্যিক। কিন্তু রিনেসেন্স্-এ যে আদর্শবিপর্য্যয়ের সূত্রপাত, সেটা সমগ্র সমাজের ক্রমোন্নতির ফল; এবং এই বিবর্ত্তনের চূড়ান্তে পৌঁছতে যেহেতু প্রায় চার শ বছর লেগেছে, তাই বিপ্লবের আকস্মিক ও আপতিক রূপটা এত দিন পর্য্যন্ত কারো চোখে পড়ে নি, লোকে ভেবেছে ব্যাপারটা পরিবর্ত্তন নয়, পরিবর্দ্ধনমাত্র। উন্নতির এই নাতিচেতন দিকটা সুবিদিত; এবং এরই জন্যে উনিশ শতকের ভাববিলাসী কবিরা রটিয়েছিলেন যে মহৎ কাব্য দুঃখোদ্ভূত, সন্তুষ্টি কবি-প্রতিভার চিরশত্রু। জগতের কাব্যসাহিত্যের আলোচনা করলে, এ-মতকে যদিও অগ্রাহ্য ঠেকে, তবু এ-কথা সত্য যে দুঃখ মানবচৈতন্যকে জাগানোর একমাত্র উপায় না হলেও, প্রকৃষ্ট উপায়।

আমাদের যুগে নিদ্রালু মন্থরতার স্থান নেই; এবং অধুনাতনী ধ্বংস-লীলার ব্যাখ্যায় অভিব্যক্তিবাদের শরণ নেওয়া অসম্ভব। আমরা যে আজ ঐতিহ্যের শাসনমুক্ত, ব্যক্তিকে সমষ্টির ভগ্নাংশ বলতে আমরা যে আজ অনিচ্ছুক, তার কারণ এ নয় যে পুরাতন আদর্শ আমাদের প্রগতির প্রতিবন্ধক, তার কারণ শুধু এই যে আমাদের ইতিহাসে প্রগতি আর প্রলয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। সেইজন্যে যে-আদর্শ এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছে, শুধু তাকে নয়, প্রাচীন-অর্ব্বাচীন, সকল আদর্শকেই

আমরা তফাতে রাখি। সেইজন্যে আজকে আর আমরা কেবল বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গলে বিশ্বাস হারিয়েই থামতে পারি না, সংখ্যা-শব্দটাকেও ভয়ের চক্ষে দেখি। সেইজন্যে আমরা স্বাধীনতা খুঁজি না, চাই মাত্র নির্ব্বিরোধ। কিন্তু এই মনোভাব নিয়ে জীবনযাত্রানির্ব্বাহ যতই সহজসাধ্য হোক না কেন, সৌন্দর্য্যসৃষ্টির, অন্ততপক্ষে কবিতায় সৌন্দর্য্যসৃষ্টির, পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক।

সাম্প্রতিক শিল্পসেবীরা যে-সত্যটা প্রায়ই ভুলে যান, অথচ যেটা কলাবিদ্যার গোড়ার কথা, তা এই যে সুন্দরের উপলব্ধিতে অধিকারভেদ নেই, সে-স্বপ্ন অতিসাধারণ মানুষের দৈনিক অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। কাজেই রূপকারকে যদি মামুলী মানুষের থেকে আলাদা ক'রে দেখাই বাঞ্ছনীয় হয়, তবে অভিজ্ঞতার উপরে জোর না দিয়ে, জোর দিতে হবে অভিব্যক্তির উপরে। কারণ ভিতরে ভিতরে সকল মানুষ—এমনকি সকল প্রাণীই সমধর্ম্মী; তাদের অমিল কেবল রূপে, স্বরূপে নয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে প্রেমের অভিজ্ঞতা সমান ও সার্ব্বজনীন; কিন্তু রাম যেহেতু স্বর্ণলঙ্কাকে উড়িয়ে-পুড়িয়েই প্রিয়বিরহের জ্বালা জুড়োয়, আর শ্যাম তার আবেগ জানায় বেণুবাদনে, তাই রামের প্রেমে আর শ্যামের প্রেমে একটা তফাৎ এসে জোটে, এবং কলাভিজ্ঞেরা বিশ্বাস করেন যে আধেয় শিল্পের সারবস্তু নয়, সে-সম্মান আধারেরই প্রাপ্য। তবে কাব্যের আধার সম্বন্ধেও একটা প্রশ্ন ওঠে। যে-মাল-মসলায় সে-আধার তৈরি, সে হচ্ছে ভাষা; এবং ভাষা মানবসভ্যতার প্রথম ও প্রধান উপকরণ। অতএব কবির পক্ষে অবচ্ছিন্নতা তো দূরের কথা, এমনকি নির্দ্বন্দ্বও প্রায় অসাধ্য। পূর্ব্বে যে-দার্শনিক সমস্যার নাম নিয়েছি—অর্থাৎ ব্যষ্টি-সমষ্টির বিরোধ—এখানেও কবি তারই সমাধানে বাধ্য; ব্যক্তিমানব কী ক'রে বিশ্বমানবের সঙ্গে মিশবে, তার সন্ধানেই কবিপ্রতিভার একমাত্র সার্থকতা।

এই সঙ্গতিসাধন যে-ঐন্দ্রজালিক উপায়ে সিদ্ধ হয়, তার বিবরণ আমাদের অজ্ঞাত; কিন্তু এ-কথা কাব্যামোদীমাত্রেই জানেন যে মহৎ আখ্যার উপযোগী যে-কবিতা, তার ভাষা আর ভাব, এই উভয়ের মধ্যেই একটা নৈর্ব্যক্তিক গুণের আভাস মেলে;—এণ্টনি-র মতো সসাগরা ধরণীপতির প্রণয়ব্যাপারে ফুটে ওঠে মাছিমারা কেরাণীর জীবন। মহাকবিরা নিজেদের ভাষা নিজেরা বানিয়ে যান বটে, কিন্তু সে-ভাষা যখন চূড়ান্তে পৌঁছয়, তখন তার মধ্যে শোনা যায় নিত্যনৈমিত্তিক উক্তি-প্রত্যুক্তির প্রতিধ্বনি, প্রাকৃত ভাষার সবল, সরল ও সজীব পদক্ষেপ, তখন আর শেক্স্‌পীয়র-এর ভাষা ব'লে কিছু থাকে না, ধরা পড়ে যে শেক্স্‌পীয়র জনসাধারণের সাবলীল ভাষা ধার করেছেন। অথচ এতখানি

আত্মত্যাগ সত্ত্বেও শেক্স্‌পীয়র-এর স্বকীয় পরিচয় হারায় না, বরং উজ্জ্বলতর রূপে দেখা দেয়; দুটো-চারটে অসংলগ্ন ছত্র পড়লেই বুঝি, সে-রচনা শেক্স্‌পীয়র-এর কিনা। এই অঘটনসংঘটনে যে দৈবপ্রসাদ নেই, এমন মতপোষণের মতো তথ্য আজও আমাদের আয়ত্তে আসে নি; কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে মহাশিল্পীরা কোনো অলৌকিক শক্তির প্রসাদ পান বা না পান, অন্তত লৌকিক বুদ্ধিতেও তাঁরা নিতান্ত নগণ্য নন্। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সচেতন শিল্পী; এবং শিল্পসৃষ্টির জ্ঞাত উপায় হচ্ছে স্বকীয় উদ্দেশ্যকে চোখের সামনে রেখে, অতীত ও বর্ত্তমানের সমুদ্রমন্থন ক'রে উপযুক্ত উপায়ে সুসঙ্গত অবৈকল্যনির্ম্মাণ।

যে-কাব্যাদর্শের কথা তুললুম, তার জন্মদিন শুধু পুরাবিদেরাই জানেন। কেবল আমাদের যুগ নয়, সকল দেশ ও সকল কাল এই নিয়মেই কাব্য-রচনা ক'রে এসেছে ব'লে আমার বিশ্বাস। কিন্তু নানা কারণে, প্রধানত রুসো-প্রবর্ত্তিত ভাবপ্রবণ ব্যক্তিবাদের কল্যাণে, গত দু শ বছরের কবিরা কাব্য লেখার সময়ে না হলেও, কাব্যচর্চ্চার বেলায় কবিপ্রতিভার সংযোগের দিকটায় জোর না দিয়ে, তার বিয়োগের দিকটাই বাড়িয়ে দেখেছেন। এর ফলে হয়তো আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবিতার বিশেষ কোনো অনিষ্ট ঘটে নি, তবে জনসাধারণের মধ্যে যে কাব্যানুশীলনের ইচ্ছা ক'মে এসেছে, তাতে সন্দেহ নেই। এ-অবস্থার প্রতিকার আছে কিনা, তা তর্কাধীন; কিন্তু গত ত্রিশ বছর ধ'রে চিন্তাশীল কবিরা এই বিসংবাদ-সম্বন্ধে যে আর উদাসীন নেই, এটা নিশ্চয়ই আশাপ্রদ। উনিশ শতকের শেষে অথবা বর্ত্তমান শতকের আরম্ভে যাঁদের কাব্যজীবনের সূত্রপাত, তাঁরা প্রায় সকলেই একবাক্যে মেনে নিয়েছেন যে সম্প্রসারণ ব্যতীত কবিতা আর বাঁচবে না; তার লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার করতে চাইলে, কেবল খেয়ালী কবিদের অনুকরণে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ খুঁজলেই চলবে না, জাতিগত চৈতন্যের আশ্রয়ে আসতে হবে।

এই মহাচৈতন্য কোনো একজন মহাকবির অধিকারে নেই। সুতরাং কবিযশঃপ্রার্থীর পক্ষে কবিবিশেষের নাম জপা বিপজ্জনক। কবিমাত্রেই তার আরাধ্য এবং আলোচ্য; তার কাজ ব্যক্তিবিশেষের অপূর্ব্বতা ও ব্যতিক্রমের বিশ্লেষণে স্বদেশের সাহিত্যিক মূলসূত্রের আবিষ্করণ। কিন্তু এই মূলসূত্র যেহেতু প্রত্যেক নূতন কবির বয়নেই অল্প-বিস্তর বদলে যাচ্ছে, তাই এই বিষয়ে কোনো দু জন অনুসন্ধিৎসুর গবেষণা কখনো একই মীমাংসায় পৌঁছয় না; এবং মীমাংসা যখন আলাদা, তখন সেই মীমাংসার উপরে যে-নবানুষ্ঠান স্থাপিত, তাও চির দিন স্বতন্ত্র। জানি না কথাগুলো যুক্তির দিক

দিয়ে বিচার করলে, হাস্যকর ঠেকবে কিনা। কিন্তু এ-সত্য ভুললে চলবে না যে কবি আর দার্শনিক যখন এক ব্যক্তি নয়, তখন কোনো নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তরে উভয়ের মুখে একই ভাষা শুনতে চাওয়া অনুচিত।

আসলে জগতের বড় বড় সমস্যাগুলোর গুরুত্ব যদিও সকলের কাছেই সমান, তবু তাদের আয়তন-সম্বন্ধে ভিন্ন স্তরের লোক স্বভাবতই ভিন্ন ধারণার বশবর্ত্তী। কাজেই এমন বিশ্বাস অমার্জ্জনীয় নয় যে নৈয়ায়িকের চক্ষে যে-রহস্য দুষ্প্রবিশ্য, সে-ব্যূহভেদের উপায় সাহিত্যিক জানেন জন্মগত অধিকারে। অবশ্য বেরিয়ে আসার কথা আলাদা; এবং বেরোতে না পারলে, অন্য লোক নিয়ে তার ভিতরে ঢোকাও অসম্ভব। অতএব বিশেষ-সাধারণের বিবাদ কবি যত সহজেই মেটান না কেন, তার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা তাঁর কাছ থেকে না পাওয়াই সম্ভব; সেজন্যে হতে হয় দার্শনিকের দ্বারস্থ। কারণ কবিদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃতপক্ষে দুর্বিনীত নন; তাই সচরাচর তাঁরা কোনো ব্যাপক সিদ্ধান্তে না পৌঁছে শুধু তাঁদের নিজস্ব উপলব্ধির কথাই ব্যক্ত করেন। কিন্তু এ-নিয়মেরও ব্যত্যয় আছে; এবং আমাদের কালে যে-ইংরেজ কবির প্রভাব অতিবিস্তৃত, তিনি—অর্থাৎ টি-এস্ এলিয়ট্—কোনো দিন দুরূহতার ভয়ে দার্শনিক মনোভাব ঝেড়ে ফেলেন নি।

এ-কথা ভাবলে, অন্যায় হবে যে কবির দার্শনিক মনোভাব আর কবিতায় তত্ত্ববিচার এক জিনিস। অবশ্য দর্শন-শব্দকে খুব বিস্তারিত অর্থে ধরলে, শুধু কাব্যে কেন, মানুষের সকল প্রক্রিয়াতেই তার প্রসার দেখা যাবে। কিন্তু এই ভাবে অর্থঘন শব্দগুলির পরিসরবৃদ্ধি আমার অনভিপ্রেত। তাই দর্শন বলতে আমি মানবচৈতন্যের সেই দিব্যদৃষ্টিকে বুঝি না, যার, আশীর্ব্বাদে বিশ্লিষ্ট বস্তুবিশ্ব সম্বন্ধশৃঙ্খল প'রে আমাদের বশে আসে, বুঝি মানবমস্তিষ্কের সেই চিন্তাশক্তিকে, যার চেষ্টা বিসংবাদ ঘোচায়, যার অধ্যবসায় বচনবিরোধের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতি আনে। এই অর্থে দর্শন আর যুক্তি অভেদাত্মা; এবং দর্শনের সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক শিথিল। কারণ অনুবন্ধনসৃষ্টি যুক্তির কর্ত্তব্য, ক্যাব্যের প্রাণ অভিজ্ঞতা-উৎপাদন; এবং এ-দুই ধর্ম্ম স্বতোবিরোধী।

অভিজ্ঞতার স্বরূপে যুক্তির সংস্পর্শ নেই, সে নিজেকে পরম্পরার আকর্ষণে সঁপে না, স্বয়ম্ভর অখণ্ডতাই তার বিশেষ গুণ। অবশ্য তাকে চাইলেও, যুক্তির দ্বারে ধর্ণা দেওয়া ছাড়া গতি নেই। তাহলেও সে-যুক্তির শাসন মানে না, যুক্তিই তার কাছে মাথা নেওয়ায়। তখন যুক্তির তপস্যায় প্রীত হয়ে, সে হয়তো একবার বিদ্যুদ্‌বিলাসে চতুর্দ্দিক ঝলসে আবার প্রাগান্ধকারে লুকয়; কিন্তু অধিকাংশ সময়েই এই ক্ষণিকের আনন্দও যুক্তির ভাগ্যে জোটে না, সে অগত্যা সন্তুষ্ট থাকে প্রতিমাপূজায়, সত্তাশূন্য বস্তুরেখার

ধ্যানে। মরমী সাধকেরা বহু পূর্ব্বেই এ-সত্যের সাক্ষাৎ পেয়েছেন; তাই সকল দেশে এবং সকল কালে প্রজ্ঞাকামীদের প্রতি তাঁদের উপদেশ যুক্তির দম্ভকে খর্ব্ব করতে; তাঁরা বলেছেন যে পরমার্থ-সম্বন্ধে শেষ কথা বোঝা নয়, উপলব্ধি। পুরোহিত এবং ঐন্দ্রজালিক, স্রষ্টা এবং মহানুভব, এঁরাই কবির পূর্ব্বপুরুষ; সুতরাং কবির ব্যুৎপত্তি বুদ্ধিতে নয়, উপলব্ধিতে; সুতরাং কবিতা যুক্তিতে একেবারে বঞ্চিত না হলেও, অভিজ্ঞতাতেই তার জন্মগত অধিকার।

কিন্তু এ-অভিজ্ঞতা মুখ্যত লেখকের নয়, পাঠকের। অর্থাৎ কাব্য যদি বিবরণে নিযুক্ত হয়, তবে তার সার্থকতা থাকে না; তার ব্রত উদ্বোধন, পাঠকচৈতন্যের উদ্বোধন। এইখানেই ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের প্রভেদ—ইতিহাস বহির্জগতের বর্ণনাতেই সদা-সর্ব্বদা ব্যস্ত, তা ছাড়া তার অস্তিত্ব নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু কাব্য স্বাবলম্বী, তাতে কাব্যেতর বিষয়ের প্রবেশ ব্যাহত, তার প্রভাবে মানুষ কেন অভিভূত হয়ে পড়ে, তা আমরা হয়তো জানি না, তবে সে-প্রভাব যে বস্তুবিশ্বের প্রভাবের মতোই প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ নয়, সে-সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি যেমন স্বভাবগুণে মানুষের নাড়িতে সংবেদনার স্রোত বইয়ে তাকে অভিজ্ঞতার স্বরাজ্যে পাঠায়, কাব্যও তেমনি স্বাধিকারবশে পাঠকের মনকে মাতিয়ে তোলে।

অনেকের মতে এই অসাধ্যসাধন সম্ভব শুধু ধ্বনির সাহায্যে। কিন্তু আমি মানি না যে কাব্যের ফলাফল শুধু শ্রুতিঘটিত; অন্তত আমার নিজের ক্ষেত্রে কবিতার মায়া কেবল আমার কানকেই মুগ্ধ করে না, তাতে আমার চোখেও লাগে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির অঞ্জন। আমার কাছে কাব্যের প্রতীক ও পৌত্তলিকতা বাহ্য অলঙ্কারমাত্র নয়, বরং অবর্জ্জনীয় সম্পদ। ওইগুলোর জন্যেই কাব্যে ভাব রূপ পায়, অর্থ পরবশতা কাটিয়ে ওঠে, মানসী মানবীর মতো রক্তে, মাংসে, রসে, রেখায়, পুষ্পিত, পল্লবিত হতে পারে। কোনো অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত কারণে মহৎ কাব্যে বাক্য প্রায়ই বস্তুতে বদলে যায়; এবং তার উপাদানে এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটে ব'লেই, তার ফল সার্ব্বত্রিক হলেও, সকল ক্ষেত্রে সমান নয়।

বস্তুজগৎ যদি নির্ব্বিকার হয়, তবে তার নিত্যতা নিশ্চয়ই মনুষ্যনিরপেক্ষ। লৌকিক পরিচয়ে বস্তু বিকারবহুল; এবং দুপুর রোদে যাকে কলাগাছ ব'লে বুঝি, চাঁদের আলোয় তাকেই দেখায় ভূতের মতো। তাছাড়া একই বস্তুর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন। আমার কাছে দেওদার বলাকার কাংস্যক্রেঙ্কারে মুখরিত, অস্তগামী সূর্য্যকিরণে মুকুটিত তার উড্ডীন কেশদাম, তার নিষ্কম্প্র চরণ বিধৌত ঝিলমের বন্দারু স্রোতে।

কিন্তু আমার প্রতিবেশী ছুতোরকে ওই একই গাছ শোনায় শুধু লাভ-লোকসানের কথা। কাব্যের বাহন-সম্বন্ধে যখন এতখানি অনিশ্চয় সম্ভব, তখন কবিতার—বিশেষত ছোট কবিতার—মধ্যস্থতায় কোনো নির্দ্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপনের আশা বিড়ম্বনা। তার চেয়ে নিজেকে ভুলে পাঠকের চৈতন্যকে জাগানোর চেষ্টাই ভালো; কারণ সে-চৈতন্য কী ক'রে জাগে, তা আমরা জানি বটে, কিন্তু জানি না কী উপায়ে তার চৈতন্যে আর আমার চৈতন্যে করকম্পন চলতে পারে।

মনের সঙ্গে মনের সংসর্গ একেবারে দুর্ঘট না হলেও, তা একান্ত দৈবাধীন; কিন্তু দেহের সঙ্গে দেহের সংঘাত শুধু সুসাধ্য নয়, অনিবার্য্যও। সুতরাং মহাকবিমাত্রেই মনোবিনিময়ের পণ্ড শ্রমে কাল কাটাতে অনিচ্ছুক, তাঁদের নিরাকার ভাবনা-বেদনার বহিরাশ্রয়-আবিষ্করণেই তাঁরা বদ্ধপরিকর, ব্যক্তিগত অনুভূতিকে একটা গ্রহণীয় বস্তুরেখার গণ্ডিতে আটকাতে পারলেই তাঁরা সন্তুষ্ট। কারণ সে-উপায়ে মনস্কাম পূরলেও, একের অভিপ্রায় অন্যের সর্ব্বনাশ সাধে না, শুধু পাঠকের জড়িমা লেখকের আজ্ঞাতেই ভাঙে; পাঠকের অভিজ্ঞতার সীমা সে যদিও আপন শক্তির অনুপাতেই মাপে, তবু অনভিজ্ঞ থাকার অধিকার তার আর থাকে না; লেখকের ইসারাই তাকে চালায়, অনুভব করায়। খৃষ্টীয় দাক্ষিণ্যবাদে ভগবানের পরিকল্পনা কতকটা এই রকমের; এবং সেইজন্যেই হয়তো কোনো কোনো ভাবালু বা ভ্রান্ত দার্শনিক বলেছেন যে কাব্যরচনা সৃষ্টিব্যাপারের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

বলাই বাহুল্য ও-ধরণের ভাববিলাসে আমার সহানুভূতি নেই; এবং খৃষ্টীয় বা অন্য কোনো ধর্ম্মোক্ত ভগবান-সম্বন্ধে আমি নিরুৎসুক বটে, কিন্তু বিশ্ববিধাতার সঙ্গে সামান্য কবির তুলনা করতে আমার অবিশ্বাসী মনও কুণ্ঠিত। তৎসত্ত্বেও আমি দাক্ষিণ্যবাদের নাম নিলুম এই আশায় যে ওই উপমাব্যবহারে আমার বক্তব্যের অস্পষ্টতা কাটবে। কবির আজ্ঞাবহ হয়েও পাঠক যে-পরিমাণে স্বাধীনতার সুযোগ পায়, তার সাদৃশ্য মেলে ভগবানপরিচালিত মানুষের পাপপ্রবৃত্তিতে। কবিও ভগবানের মতো পাঠককে একটা চক্রচরণের নির্দ্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত; এবং দৈবানুপ্রাণিত মানুষের মতোই পাঠকও এক জায়গা থেকে বেরিয়ে, আবার ফিরে আসে সেইখানেই। এইটুকু শাসন মানা ছাড়া অন্য সকল বিষয়েই পাঠক স্বেচ্ছাচারী। ঠিক কোন্ পথে সে এগোবে; কোন্খানে জিরোবে, কত বার পড়বে, কখন উঠবে, এ-সমস্তই নির্ভর করে তার নিজের অভিরুচির উপরে। কবি চায় শুধু তার গতি, তার যাত্রারম্ভ ও যাত্রাশেষের সন্নিপাত;

এবং চলতে চলতে সে যদি লক্ষ্য হারায়, তাতেও কবির আপত্তি নেই, যদি সে গোলোকধাঁধায় প'ড়ে ঘুরপাক খেতে থাকে, তবু কবি তাকে বাঁচাতে যাবে না, যদি সে এমন পথে গন্তব্যে পৌছয়, যা কবির নিজেরও অগোচর, তাহলেও সে কবির প্রসাদে বঞ্চিত হবে না, বরং তার কপালে জুটবে অধিকতর সম্মান।

শুধু এই দিক থেকে দেখলেই, খৃষ্টানদের করুণাময় ভগবানের সঙ্গে কবির মিল ধরা পড়বে; অন্যত্র এরা একেবারে আলাদা, এত আলাদা যে প্রথমটি লোকোত্তর হয়েও মানুষের ছাঁচে ঢালা ব্যক্তিস্বরূপের পরম প্রতিমান, এবং দ্বিতীয়টি মর্ত্ত্যচর হয়েও পূরোপূরি নৈর্ব্যক্তিক। এই নির্লিপ্তির উপরে জোর দিলে, কবিকে আর ভগবানের সমগোত্রীয় ঠেকবে না, বোঝা যাবে তার একমাত্র উপমান বিজ্ঞানের নিয়মাবলী। তার নিয়ম সাধারণের উপরে গড়পড়তা হিসাবে খাটলেও, তাতে ক'রে পাঠক-বিশেষের পুরুষকার একেবারে নিষিদ্ধ নয়, শুধু সঙ্কুচিত। তার অধীনে এলে, ব্যষ্টি হিসাবে কোনো পাঠকই আপনার ভাগ্যনির্ব্বাচনের দাবি ছাড়ে না, কেবল তার নির্ব্বাচনক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা হৃদয়ঙ্গম করে। অনিশ্চয়বিধির কল্যাণে বিদ্যুৎকণামাত্রেই যেমন গোটা কয়েক সম্ভবপর অবস্থার যে কোনো একটার আশ্রয়ে স্থিতি পায়, তেমনি শেক্স্‌পীয়র্‌-এর প্রত্যেক পাঠকই মানসিক প্রতিক্রিয়ার নানান স্তর থেকে যে-কোনো একটা স্তরকে বেছে নিতে পারে। কিন্তু তাড়না সত্ত্বেও অপরিবর্ত্তিত থাকা অথবা একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অবস্থার বাইরে যাওয়া বিদ্যুৎকণার পক্ষে যতখানি দুষ্কর, শেক্স্‌পীয়র প'ড়ে সিনেকা-র ধৈর্য্যবাদের মর্ম্মগ্রহণ ততোধিক দুঃসাধ্য।

এই কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা যায় যে বিষয়নির্ব্বাচনে কবির স্বাধীনতা যদিও অনন্ত, তবু বিষয়বৈচিত্র্যের সঙ্গে কবিতার মৌলিকতা বা সাফল্য বিজড়িত নয়। কাব্যের মুখ্য সম্বল আবেগ; এবং আমাদের আবেগ-সংখ্যা যেহেতু অত্যল্প, তাই প্রসঙ্গের দিক থেকে কবিতাবিশেষকে যত অপূর্ব্বই দেখাক না কেন, ফলাফলের বিচারে তার মধ্যে একটা আনু-পূর্ব্বিকতা ধরা পড়বেই পড়বে। এই ধারাবাহিকতার অনুসরণে তথাকথিত সনাতন সত্যসমূহের সন্ধান মিলবে কিনা জানি না; কিন্তু একেই পূর্ব্বোক্ত ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ ব'লে মানলে, নিশ্চয়ই কোনো সাংঘাতিক ভুল হবে না। এই প্রবহমাণ ঐতিহ্যের সঙ্গে স্বকীয় প্রণালীর সঙ্গম-সাধনই অব্যক্তির মরুভূমিতে ফসল ফলানোর একমাত্র উপায়। ব্যক্তিগত অনুভূতি যখন অতিব্যক্তি আবেগের অন্তঃপ্রবেশে রসিয়ে ওঠে, তখনই সে রত্নগর্ভা-পদবীর যোগ্য, শুধু তখনই রূপের জন্ম সম্ভব।

অবশ্য কচিৎ-কদাচিৎ এক-আধ জন লোক খাস কুয়োর জলেও এই অনুর্ব্বর জমিতে চাষ-আবাদ ক'রে গিয়েছে বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাদের পরিশ্রম পণ্ড হয়েছে, নিয়মিত শস্যাবর্ত্তন তাদের ভাগ্যে জোটে নি ; এবং এক দিন না এক দিন অনাবৃষ্টির প্রকোপে তারা মরেছে অনাহারে। সুতরাং যে-ঐতিহ্য ব্যক্তিত্বের অনিবার্য্য উর্ব্বরতা থেকে কবিকে মুক্তি দেয়, তা মানবসভ্যতারই নামান্তর, এমন ভাবলেও কোনো দোষ নেই ; মানুষের ভাবনা-বেদনার যত বিভিন্ন আকার-প্রকার যুগ-যুগান্তরের অবিরত সাধনায় পূর্ণাবয়বধারণ করেছে, উক্ত ঐতিহ্য তারই আশ্রয়। কিন্তু মানবসভ্যতা যেহেতু মানবীয় আবেগের প্রাক্তন পটভূমিতেই লীলায়িত, এবং সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা-বেদনার পরিপুষ্টি অবশ্যম্ভাবী হলেও, অনুভবপ্রসূ আবেগসমূহ যেহেতু নির্ব্বিকার ও নিত্য, তাই অনেকের মতে কবিদের উত্তরাধিকার মানুষিক চিৎপ্রকর্ষের চেয়েও পুরাতন, এত পুরাতন যে তাকে প্রায় অনাদ্যন্ত লাগে।

এই রকম কোনো একটা সুসঙ্গত অভিমতের প্রচ্ছন্ন পৃষ্ঠপোষণেই য়েট্‌স্‌ কবিকল্পিত মানস প্রতীকগুলোকে বস্তুর চেয়েও বেশি বাস্তব আর মানুষ অপেক্ষা অধিক বয়স্থ ব'লে ঘোষণা করেছেন। শত ইচ্ছা থাকলেও, য়েট্‌স্‌-এর মতো ইন্দ্রজালে আস্থাস্থাপন আমার সাধ্যের অতীত ; এবং প্লেটো-প্রবর্ত্তিত অতিমর্ত্ত্য লোক আমার চক্ষে সুন্দর ঠেকলেও, তার স্বপ্নস্বচ্ছ অসারতা আমি কোনো মতেই ভুলতে পারি না। কিন্তু মনের এইরূপ মূলগত পার্থক্য নিয়েও প্রতীকের অবিনশ্বরতাস্বীকার করা আমার পক্ষে শক্ত নয়। কারণ আমি প্রগতি-সম্বন্ধে নিরুৎসাহ ; আমার বিশ্বাস মানুষের মতিগতি তার দেহপরিচ্ছেদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ; এবং এই দেহ যখন কালান্তরেও অভাবনীয় রকমে বদলায় নি, তখন মনের আদিম অবস্থাগুলোও মোটের উপরে অপরিবর্ত্তিত আছে। এই ধারণার স্বপক্ষে য়ুং-এর সাক্ষ্য প্রণিধানযোগ্য ; এবং আধুনিক চিত্তবিকারের বিশ্লেষণে নেমে তিনি বার বার দেখেছেন যে কোনো কোনো মানসিক পীড়ায় বিংশ শতাব্দীর স্ত্রী-পুরুষ অন্তঃপ্রেরণার তাগিদে এমন সব ছবি আঁকে যে সেগুলোর জোড়া খুঁজতে বিশেষজ্ঞদের যেতে হয় দু হাজার বৎসর আগেকার চৈনিক যোগীদের অঙ্কিত কুণ্ডলিনীচিত্রে।

বলাই বাহুল্য যে মতিভ্রান্তদের সঙ্গে যোগীদের উল্লেখ ক'রে আমি যোগ-সম্বন্ধে কোনো হঠোক্তির প্রশ্রয় দিচ্ছি না। যোগের বিষয়ে আমি কিছুই জানি না ; কিন্তু জনশ্রুতি যদি একেবারে অবিশ্বাস্য না হয়, তবে না মেনে উপায় নেই যে অন্তত অবধানের পরিসরসঙ্কোচে মনোরোগীও

যোগীর সমকক্ষ। অন্যত্র উন্মত্ততা ও তপস্যার মধ্যে যতই ব্যবধান থাকুক, এই মনোযোগহ্রাসের দ্বারা, এই একাগ্রতার কল্যাণে, উভয় ক্ষেত্রেই চিৎশক্তির ব্যাপ্তি ঘটে, এবং মানুষ বুদ্ধির দাসত্ব থেকে মুক্তি পায়। ফলে যোগী ব্রহ্মসাযুজ্যে পৌছন কিনা বলতে পারি না; কিন্তু এটা প্রায় নিশ্চয় ক'রেই বুঝি যে উন্মাদেরা অবচেতনের নৈরাজ্যে নিজেদের একেবারে হারিয়ে ফেলে। আমাদের ব্যাবহারিক জীবন প্রধানত বুদ্ধিচালিত; সেইজন্যেই যারা কর্মক্ষেত্রেও অবচেতনার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে না, তাদের আমরা পাগল ভাবি। কিন্তু বস্তুত অবচেতন বা অচেতনের উপদ্রব থেকে কোনো ব্যক্তিরই অব্যাহতি নেই। তবে অবচেতন যেহেতু আমাদের লজ্জাকর আকাঙ্ক্ষার অজ্ঞাতবাস, তাই জাগ্রতাবস্থায় আমাদের সামাজিক বুদ্ধি সাধ্যপক্ষে অবচেতনের সংক্রমণ বাঁচিয়ে চলে।

কিন্তু ঘুমের আবেশে কিম্বা ঐকান্তিক অভিনিবেশের তন্ময়তায় আমাদের ইচ্ছাশক্তি যখন এলিয়ে পড়ে, তখন নির্নিগড় কল্পনা অথবা নিরতিশয় প্রেরণা দুর্লভের বশীকরণে বেরোয়, তখন চিন্তা চিত্রল হয়ে ওঠে, ভাব করে মূর্ত্তিপরিগ্রহ। এই সময়ে যে-সকল আলেখ্য মনের অন্তর্ভৌম দেশ থেকে চৈতন্যের বহিস্তলে এসে জোট পাকায়, সেগুলোতে ব্যক্তিগত অনুষঙ্গের স্পর্শ লাগলেও, তার ধরণ-ধারণ চিরন্তন; এবং ফ্রয়েড্ লেওনার্দো দা ভিঞ্চি-র স্বপ্নবিশেষের বিকলন ক'রে দেখিয়েছেন উক্ত স্বপ্নে যে-বিগ্রহাদি লেওনার্দো-কে পেয়ে বসেছিলো, সেইগুলোই মিসরের ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রচলিত ছিলো তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে। লেওনার্দো-র স্বপ্নটি যে যৌনসম্পর্কিত সে-বিষয়ে ফ্রয়েড্ সন্দেহের অবকাশ রাখেন নি; এবং মিসরী পূজা-পার্ব্বণের মিথুনিক ভিত্তিও আজ তর্কাতীত। সুতরাং এমন সিদ্ধান্তই হয়তো সমীচীন যে কেবল আবেগ নয়, আবেগের প্রকাশভঙ্গিও দেশ-কাল-পাত্রের অতীত; এবং সেইজন্যে, অর্থাৎ প্রতীকমাত্রেই খুব সম্ভব সার্ব্বজনীন ব'লে, মনোবিনিময় কবির সাধ্যে না কুললেও, তার বেদনা পাঠকের গোচরে আসে।

আমার কথার সমর্থনে মালার্মে-প্রমুখ ফরাসী কবিদের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত প্রথায় চিন্তাসম্বদ্ধ কবিতা লেখা ছেড়ে, তাঁরা যখন চিত্রপ্রধান কাব্যরচনায় হাত দিয়েছিলেন, তখন প্রতীকের অনাত্ম স্বরূপই তাঁদের উদ্যোগকে অনর্থের কবল থেকে বাঁচিয়েছিলো। পক্ষপাতশূন্য সমালোচক-মাত্রেই মেনেছিলেন যে সে-রহস্যময় কাব্যের অর্থগ্রহণ সাধারণত দুষ্কর বটে, কিন্তু তার ধাক্কায় জাগা শুধু সম্ভবপর নয়, স্বাভাবিকও। প্রতীকীরা অবশ্য যোগচর্চ্চার ধার ধারতেন না; এবং অবচেতনার গুণকীর্ত্তন সে-দিন পর্য্যন্ত আধুনিকতার অপরিহার্য্য লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায় নি। কিন্তু হিপ্নোসিস্-

ঘটিত সম্মোহের সঙ্গে তাঁদের অল্প-বিস্তর পরিচয় ছিলো। তাঁরা জানতেন যে ছন্দের ও অতিছন্দ ধ্বনিতরঙ্গের সহায়তায় পাঠকের মনে অনুরূপ স্বপ্নাবস্থার উৎপাদন সুসাধ্য; তখন তার সামনে কোনো প্রতীক ফুটে উঠলে, সে যতখানি একাগ্র ভাবে সে-প্রতীকের ধ্যান করতে পারে, তা অন্য সময়ে তার ক্ষমতায় কুলয় না। এর কারণ হয়তো খুব দুর্ব্বোধ্য নয়। জাগরণকালে আমাদের সকল ইন্দ্রিয় বাইরের অবাধ আক্রমণে অস্থির থাকে। ফলে একটার উত্তেজনা আর একটার সঙ্গে মিশে যায়, এবং আমাদের প্রতীতিগুলো হয় অস্পষ্ট ও অস্থায়ী। কিন্তু কোনো উপায়ে কতকগুলো ইন্দ্রিয়কে দাবাতে পারলে, বাহ্য জগতের প্রবর্ত্তনা অন্তর্লোকে প্রবেশের অধিকাংশ পথই বন্ধ দেখে, যে-একটা-দুটো দ্বার খোলা পায়, তারই সামনে ভিড় জমায়, এবং দশের প্রণোদনা একের ভোগে এসে তার গভীরতা বাড়ায়।

সুপ্তাবস্থায় দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ, স্বাদ ইত্যাদিতে প্রায়ই মন্দা পড়ে; তাই সে-অবস্থায় স্পর্শের প্রভাব অত বেশি; তখন ওই এক উদ্বোধকই সকল রকম উপলক্ষ জোগায়। অঙ্গহানির ফলে মানুষের কোনো একটা শক্তির যে-পরিপুষ্টি ঘটে, তার ব্যাখ্যাও বোধহয় এইখানে। যোগের সঙ্গে কাব্যের সাদৃশ্য এই ইন্দ্রিয়নিরোধ-ব্যাপারে; এবং উভয়ের সংযমপ্রণালীতেও বোধহয় বেশি পার্থক্য নেই। উভয় প্রকরণেই পুনরাবৃত্তি অতিব্যবহৃত; প্রাণায়ামে বিধিবদ্ধ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের চেষ্টা যেমন চিত্তবিক্ষেপের অন্তরায়, কাব্যেও তেমনি ধ্বনিতরঙ্গ-অনুসরণের প্রয়াস আত্মসমাহিতির সহায়; এবং উভয় ক্ষেত্রেই একনিষ্ঠা ইন্দ্রিয়বোধের বিস্তার গুটিয়ে আমাদের বহির্মুখী চৈতন্যকে চালায় অন্তর্মুখে। অবশ্য এই দুই পদ্ধতির উদ্দেশ্য আলাদা;—যোগাচারে চৈতন্য শেষ পর্য্যন্ত সমাধির শিখরে পৌঁছয়, এবং কাব্যের সম্মোহনে চেতনা হারায় অবচেতনের নিরুদ্দেশে। তাহলেও পরমাবধি, তা সে উপরেই মিলুক অথবা নীচেই মিলুক, তার প্রকৃতি সর্ব্বত্রই এক; উর্দ্ধগমনের মতো অধোগমনেও মুক্তিই আমাদের লক্ষ্য; এবং শুদ্ধ চৈতন্য আর অচৈতন্য দুই যেহেতু লোকোত্তর, তাই তাদের পদমর্য্যাদা নিয়ে বাদানুবাদ নিতান্ত নিষ্ফল।

আমি জানি আমার বক্তব্য যে-স্তরে এসে পৌঁছেছে, সেখানে নির্ব্বিকল্পতার চেয়ে বিপদের সম্ভাবনাই বেশি। প্রমাণের দিক দিয়ে মনোবিজ্ঞান এখনো পদার্থবিদ্যার পর্য্যায়ে পৌঁছয় নি; এবং অবচেতনায় বিশ্বাস ততটা যুক্তিসাপেক্ষ নয়, যতটা আস্থাপ্রসূত। হয়তো সেইজন্যেই এ-প্রবন্ধ যাঁকে উপলক্ষ ক'রে লেখা, তাঁর কাব্যাদর্শে মনোবিজ্ঞানের পরিভাষা স্থান পায় না। এলিয়ট্

ফ্রয়েড্-পন্থী মনোবিদদের বিদ্রূপবাণে বিঁধেছেন; এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে অবচৈতন্যের সমীকরণে তাঁর সমর্থন নেই। তাঁর বিবেচনায় এই ঐতিহ্য ইতিহাসবোধ ও ধর্ম্মানুরক্তির যোগফল। তিনি ভাবেন যে ইতিহাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না ঘটলে, অনুকরণ আর উদ্ভাবনের মধ্যে কোনো তফাৎ থাকে না। আমাদের যুগে, মানব-সভ্যতার পাঁচ-সাত হাজার বৎসর যখন কেটেছে, তখন স্বকীয়তার সম্ভবপরতা স্বভাবতই যৎকিঞ্চিৎ। বিচার ক'রে দেখলে, আজকের দিনে আর আমূল নূতনের সাক্ষাৎ মিলবে না, পাওয়া যাবে শুধু পুরাতনের ধ্বংসাবশিষ্ট উপকরণে নির্ম্মিত অধুনাতনী অট্টালিকা। কিন্তু এখানেও স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ অত্যল্প; কারণ অট্টালিকার প্রয়োজন এত সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বকালীন যে তার মুখ্য রীতিও আজ অখণ্ডনীয়। নবতর সমাবেশ ও বিন্যাস ছাড়া নূতনত্ববিলাসীর আর গতি নেই।

উপমা বদলালে, এ-কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে আবেগ, যা কাব্যের মূলধন, আমরা তার অংশভাক উত্তরাধিকারসূত্রে; বিনা বাক্যে সে-দানের প্রতিগ্রহই আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য; তবে আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাকে সুদে খাটালে, আমাদের স্ববুদ্ধিই নিশ্চয় ধরা পড়বে। এই সুদ আমাদের ভাবনা-বেদনা; এবং একেই বোধহয় প্রাচীন ভারতে হৃদয় বলতো। এর তটভূমিও যদিচ অবধারিত, তবু যুগ-যুগব্যাপী ভাবস্রোতের প্রবাহে এর প্রস্থ না বাড়লেও, গভীরতা ক্রমশই অতলস্পর্শিতার দিকে চলেছে। এই হৃদয়ই স্বকীয়তার আশয়। কারণ এর পিছনে মানুষের বংশানুক্রমিক সংস্কারমাত্রই উহ্য নেই, তার সমাজ ও রাষ্ট্র, শিক্ষা ও দীক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য, সাধনা ও সংযম, সে-সমস্তই এতে প্রতিফলিত রয়েছে। অতএব কবি তাঁর হৃদয়কে যতখানি ছড়াতে পারেন, তাঁর জাগতিক পরিমণ্ডলের যতখানি তাঁর কাব্যে ছায়া ফেলে, সেই পরিমাণেই তিনি আমাদের নমস্য, সেই পরিমাণেই তিনি মৌলিক।

দুঃখের বিষয়, ব্যাপারটাকে এ-ভাবে বুঝলেও, বিশেষ-সাধারণের বিরোধ ঘোচে না; কারণ অনুভূতি এবং বেদনাব্যঞ্জনা, এ-দুই ক্রিয়া সমান নয়; এদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। এ-কথা এলিয়ট্-ও জানেন, এবং সমস্যা-সমাধানের উপায়নির্দ্দেশে তিনি নিরস্ত থাকেন নি। এ-প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি আমার বক্তব্যের মতো জটিল ও অস্পষ্ট নয় বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব বেশি মতদ্বৈত নেই ব'লেই আমার বিশ্বাস। আমার মতো তিনিও মানেন যে একের সঙ্গে বহুর সালোক্য তখনই সম্ভব, যখন আত্মনেপদী বাক্য পরস্মৈপদে বদলায়, কর্ত্তা কর্ম্মে লোপ পায়, ভাব বিষয়াশ্রিত হয়ে

ওঠে। কিন্তু আমি যেখানে পরমার্থময় বিবেচনায় প্রতীকের ব্যবহার আবশ্যিক ভাবি, তিনি সেখানে ঐতিহাসিকতার খাতিরে উদ্ধার করেন প্রাচীন কবিদের উক্তি। বস্তুত এখানেও কোনো মতবিরোধ নেই, আছে কেবল প্রতীক-শব্দের ব্যাপ্তি নিয়ে তর্ক। আমি সেখানেই প্রতীক দেখি, যেখানে অনেক মিশ্র ভাব একটি ধ্যেয় মূর্ত্তির চার দিকে দানা বাঁধে, যার অনুগ্রহে যুক্তির মধ্যস্থতা এড়িয়েও একের সংস্পর্শ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পথে অন্যের অন্তরে ছড়িয়ে পড়ে, যা আবেগের উদ্বোধনে ব্যক্তিনিরপেক্ষ ভাবে জাগে সকল মানুষেরই মানসপটে।

প্রতীকের অভিধা যদি এই রকম ক'রে বাড়ানো যায়, তবে এলিয়টী বাক্যচৌর্য্যও তার এলাকায় আসতে বাধ্য। কারণ প্রতীকের সাহায্যে বেদনা যেমন নৈর্ব্যক্তিক রূপরেখায় ফুটে দুটি স্বতন্ত্র সত্তার মধ্যে অনুকম্পনের সেতু বাঁধে, তেমনি এলিয়ট্-এর মনোভাব দান্তে-র ভাষাকে অঙ্গীকার ক'রে আপনার সঙ্কীর্ণতা কাটায়। অতএব উদ্ধারসঙ্কুল রচনারীতি আপাতত প্রাঞ্জলতার বিরুদ্ধে গেলেও, সহজতাই তার উদ্দেশ্য; এবং সেইজন্যে অমনোযোগী পাঠকের অভিশাপ কুড়িয়েও এলিয়ট্ এ-প্রত্যাশা ছাড়তে পারেন না যে বুদ্ধির দরজায় খিল লাগালেও, তাঁর কবিতার আবেদন রসিকের তদ্গত চিত্তে পৌঁছবে উপলব্ধির সুড়ঙ্গ বেয়ে। বলাই বাহুল্য এ-দাবি ন্যায়সঙ্গত: অন্ততপক্ষে এর সঙ্গে কোল্‌রিজী কাব্যাদর্শের কোনো প্রভেদ নেই। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীদের বিচারে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত অভ্যাঘাত যেহেতু মানসিক উত্তেজনার পরিপন্থী, তাই প্রাক্তন আত্মীয়তা ব্যতীত কবি-পাঠকের হার্দ্দ্য সংবাদ যত না দুর্ঘট, অবচেতনার বাইরে তাদের নির্ব্বাক বিশ্রম্ভালাপ ততোধিক অভাবনীয়।

অবশ্য এলিয়ট্ এ-কথায় সায় দেবেন না; তিনি বলবেন যে মানুষের সাম্য আদম-কৃত আদিম পাতকের দায়ভাগে। এইজন্যেই তাঁর চক্ষে আগামেম্নন্ ও স্যুইনি সমগোত্রীয়, নোসিকা ও ডরিস্ সমধর্ম্মী; এইজন্যেই 'ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড্'-এ টাইপিস্ট্ আর মসিজীবীর ব্যাভিচার এলিজাবেথ্ ও লেস্টর্-এর প্রেমকাহিনীর সঙ্গে একনিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, পাপের প্রকৃতিতে সকল মানুষ যেমন সমান, পরিত্রাণের উপায়েও তারা অভিন্ন। এই উপায় অনুতাপ আর অগ্নিদীক্ষা; এবং এরই প্রচার-কল্পে ভগবান যিশুর দেহ ধ'রে মর্ত্ত্যসংসারে এসে, কাঁটার মুকুট প'রে ক্রুসে চড়েছিলেন। অতএব মানুষ যদি খৃষ্টপ্রদর্শিত পথ না ভোলে, তবে গন্তব্যের ঐক্যে তার ব্যক্তিত্বের বাধা ঘুচবে। কিন্তু এই রকম্ আদর্শনিষ্ঠা সকল কালেই বিরল; এবং আমাদের নাস্তিক যুগে তার চর্চ্চা একেবারেই অসাধ্য।

এই কারণেই মনের বার্ত্তাবহ হিসাবে বর্ত্তমান সাহিত্যের অপটুতা এত শোচনীয়।

এই যুক্তির সারবত্তা যে অখৃষ্টানদের কাছে অস্বীকার্য্য, তাতে সন্দেহ নেই; এবং তাই প্রসঙ্গত বলা দরকার যে লাইব্‌নিৎস্-এর মতো বিজ্ঞানবিদ দার্শনিকও মানবীয় আদান-প্রদানের ব্যাখ্যায় অনুরূপ মতবাদের শরণ নিয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত স্বতন্ত্র জীবকণাগুলি স্বভাবত পরস্পর-বিরোধী বটে, কিন্তু তারা সকলেই ব্রহ্মপ্রসূত ও ব্রহ্মাভিমুখী; এবং বিয়োগধর্ম্মে সেই জীবাণুরা যদিচ অত্যাধুনিক পরমাণুপুঞ্জেরই প্রতিযোগী, তবু আরম্ভ ও সমাপ্তির সাদৃশ্যবশত তাদের মধ্যে একটা পরোক্ষ সম্বন্ধ শুধু সম্ভবপর নয়, অবশ্যম্ভাবীও। এই অনুমানের পিছনে হয়তো ন্যায়ের চেয়ে নিষ্ঠাই বেশি, তাহলেও এতে কেবল খৃষ্টানী কুসংস্কারের ঘনান্ধকার দেখা অন্যায়। সকল সভ্য দেশের ধর্ম্মানুভূতির মূলেই এই অন্ধ বিশ্বাসের প্রকারান্তর মেলে; এবং ধর্ম্ম-শব্দের অর্থে এলিয়ট্ মুখ্যত ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়ের মতামতকেই বুঝলেও, উপনিষদ, বৌদ্ধধর্ম্ম, কন্‌ফিউসিয়স্-এর উপদেশাবলী, মিসরী পূজাপদ্ধতি, এমনকি প্রাগৈতিহাসিক আচার-ব্যবহার থেকে তিনি একই মহাবাণী সংগ্রহ করেছেন।

আসল কথা, বিনা আদর্শে, শুধু কাব্যরচনা কেন, কোনো কার্য্যই সাধ্য নয়, এবং এই আদর্শের শাখা-প্রশাখা নিয়ে যদিও অনেক তর্ক আছে, তবু এর স্বরূপ-সম্বন্ধে আস্তিক-নাস্তিক সকলেই প্রায় একমত। তবে আস্তিকেরা ব'লে থাকেন যে এই আদর্শের সূত্রগুলি বিভিন্ন ধর্ম্মের আপ্তবাক্যে বাসা বেঁধেছে; এবং নাস্তিকেরা ওই সকল আপ্তবাক্যের মহার্ঘ্যতা মেনে নিয়েও দাবি করেন যে উক্ত উপদেশাবলী আধিজৈবিক নয়, ওর তলায় তলায় লক্ষ লক্ষ বৎসরের জৈবিক ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। এই দুই দলের কোনো একটাতে কবি যোগ দিতে পারেন; কিন্তু একটা যেমন তেমন মূল্যজ্ঞানের আনুগত্য ছাড়া তাঁর গত্যন্তর নেই। কারণ যে-পথেই প্রতিমানে পৌছনো যাক্, সাহিত্যে তার ফল অবিকল এক রকমের;—তারই সাহায্যে স্থূল অভিজ্ঞতা সূক্ষ্ম অনুভূতির স্তরে ওঠে, তারই শাসনে আবেগ বেগ হারিয়ে আধারের বশ্যতা মানে। অভিজ্ঞতা কেবল অভিজ্ঞতা হিসাবেই স্মরণীয় বা বরণীয় নয়; তার মধ্যে লোকে কেবল সেইটুকুই মনে রাখে আর বুঝতে চায়, যেটুকু সর্ব্বসাধারণের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়ক।

সুতরাং উক্ত শ্রেয়োবোধ কোনো কালেই নিষেধাত্মক নয়, অথবা তাতে শুধু কূপমণ্ডূকেরা প্রশ্রয় পায় না; বরং তার পরেই নূতন অভিজ্ঞতার অনুসন্ধান অনিবার্য্য ঠেকে, বোঝো যায় যে সাধারণ মানুষের জীবনবেদ

এমনি সঙ্কীর্ণ, তার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র এত অপরিসর, এমন অনেক অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়ে সে এ-রকম অশিক্ষিত যে সাহিত্যের কল্যাণে তার অবিদ্যা না কাটলে, সে নিতান্ত নিরুপায়। ফলত কবির পক্ষে শুধু বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রসাদবিতরণ যথেষ্ট নয়, অনেক সময়ে তিনি কাল্পনিক অভিজ্ঞতার উদ্‌ভাবনেও বাধ্য, যাতে পাঠকের দৃক্‌শক্তি বাড়ে, সে জীবনের আর্য্যসত্যগুলোকে স্পষ্টতর ক'রে চেনে। অর্থাৎ উপরোক্ত মূল্যজ্ঞানের প্ররোচনায় কবি মাঝে মাঝে অভিনয়ে মাতেন; এবং তখন তিনি যে-ভূমিকায় নামেন, তার সঙ্গে তাঁর বা দর্শকের চাক্ষুষ পরিচয় থাকে না। কিন্তু মহানুভবতা ও নৈর্ব্যক্তিক চৈতন্যের জোরে, বিশ্ববীক্ষা ও অন্তর্দর্শনের গুণে, এই অঘটনসংঘটনেও তিনি সম্ভাব্যতার সীমা ভোলেন না, কল্পনাবিলাসের মধ্যেও সত্যবত্তা বজায় রাখেন।

এলিয়ট্ বোধহয় ওই ধরণের কবি নন; অন্ততপক্ষে তাঁর কাব্য এখনো তর্কাতীত উৎকর্ষে উঠতে পারে নি। কিন্তু তাঁর মূল্যজ্ঞান-সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা আছে; যে-দার্শনিকতা কাব্যের উপকরণ না হলেও, কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাতে তিনি বিশেষ ভাবে বিত্তবান, এবং তাঁর বিদ্যা প্রগাঢ় ও বুদ্ধি অকুতোভয়। তাঁর কাব্যাদর্শে ছিদ্র অনেক; কিন্তু সে-আদর্শের প্রধান গুণ এই যে তাকে বা তার থেকে উৎপন্ন কবিতাকে বুঝতে গেলে, কাব্যের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে সমস্ত সমস্যার পুনরুত্থাপন অনিবার্য্য লাগে। এই অন্বেষণের পরে তাঁর সঙ্গে আমাদের মতান্তর ঘোচে কিনা, সেটা গণ্য নয়; এইটাই স্মরণীয় যে তিনিই আমাদের মূর্চ্ছাগ্রস্ত বিচারবৃত্তিকে জাগিয়ে দেন। কাব্য জীবনের সমালোচনা—আর্নল্ড্-এর এই বিখ্যাত মন্তব্যের প্রতিবাদে এলিয়ট্ যদিও অনেক হঠোক্তি-উচ্চারণ করেছেন, এবং রিচার্ড্স্-এর বিজ্ঞানসম্মত কাব্যার্চ্চনায় তিনি যদিও আস্থাহীন, তবু তাঁর গদ্যে-পদ্যে যতখানি জিজ্ঞাসার সন্ধান পেয়েছি, তা আধুনিক কালে একান্ত দুর্লভ। হয়তো এইজন্যেই বর্ত্তমান ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর প্রভাব এত পরিব্যাপ্ত, হয়তো এইজন্যেই তিনি ভবিষ্যতের পূজা পাবেন।

ডব্‌ল্যু-বি য়েট্‌স্‌ ও কলাকৈবল্য

ইংরেজী প্রবচনের মতে সত্য স্বপ্নের চেয়েও অদ্ভুত; এবং যেহেতু প্রবাদ-মাত্রেই শুধু ভূয়োদর্শনের ফল, তাই তার ব্যাপ্তি কম, ব্যতিক্রম বেশি। কিন্তু এ-ত্রুটি হয়তো শব্দেরই প্রকৃতিগত: অন্ততপক্ষে পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিকথাতেও বহুলাঙ্গ অতীতের যথাযথ প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে না, একটা কঙ্কালসার যুগের এক টুক্‌রো অস্থিই কৌতূহলীর কল্পনা জাগায়; এবং সম্ভবত বস্তু আর বাক্যের সামান্যতা যৎকিঞ্চিৎ ব'লে, এই নির্ব্বিকার বিশ্বে থেকেও আমরা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি অস্বীকার করি। তাহলেও বাক্য ছাড়া সংসারযাত্রা অচল; এবং যোগীদের সাযুজ্যসিদ্ধি বাদ দিলে, বাক্য শুধু জ্ঞানবিনিময়ের নয়, জ্ঞানার্জ্জনেরও অনন্য পন্থা। এই দিক থেকে দেখলে, উল্লিখিত জনশ্রুতিকে আর অব্যবহার্য্য লাগবে না, বোঝা যাবে যে চমৎকারিত্বে সত্য স্বপ্নের অগ্রগণ্য না হলেও, সমকক্ষ বটে।

উদাহরণত উনিশ শতকের পশ্চিম য়ুরোপ স্মরণীয়; এবং ফরাসী বিপ্লবের ভাববিলাসে তলিয়ে গিয়ে সেখানকার মানুষ যখন শতাব্দীর মাঝামাঝি আবার পায়ের নীচে কঠিন মাটির স্পর্শ পেলে, তখন বস্তুকে অপরি-চয়ের বিস্ময়ে সাজিয়ে সে ভাবলে রূপকথা নিতান্ত নিন্দনীয়। কিন্তু ফলিত বিজ্ঞানের প্রথমাবস্থায় যে-বিশ্বাস খুবই স্বাভাবিক ঠেকেছিলো, যন্ত্রশিল্পের বহুল প্রচারে তার একদেশদর্শিতা ধরা পড়লো; এবং সমাজ-রক্ষার জন্যে ভারসাম্য এমনি আবশ্যকীয় যে কান্তবিদ্যাবিশারদেরা অবিলম্বে পদার্থবিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলেন। উইলিয়ম্‌ বট্‌লর য়েট্‌স্‌ এই প্রতি-ক্রিয়ার পরম পুরোধা ছিলেন; এবং সহকারীদের মতো তিনি যদিও শিল্পের নামে যথেচ্ছাচারের সুযোগ খোঁজেন নি অথবা মিথ্যার প্রশস্তি গান নি, তবু গণিতশাস্ত্রের চেয়ে কেল্‌টিক্‌ পুরাণই তাঁকে বেশি টেনেছিলো, তিনি মেনেছিলেন যে সত্য আশ্চর্য্যময় হোক আর নাই হোক, স্বপ্নই সারবান ও সনাতন।

দুঃখের বিষয়, শেষোক্ত সিদ্ধান্তও পক্ষপাতদুষ্ট; এবং বিজ্ঞানসম্মত বিষয়াসক্তির অবসান যেমন সাম্রাজ্যবাদের নৃশংসতায়, তেমনি কলাকৈবল্যের পরিসমাপ্তি ওয়াইল্‌ড্‌ ইত্যাদির অধঃপতনে। কেননা স্থিতিস্থাপকতা শুধু সমাজের পক্ষেই অবশ্যমান্য নয়, আতিশয্যের ফলে ব্যক্তিও রসাতলে যায়। কিন্তু সে-কথা বোঝার সময় তখনো আসে নি; এবং যদিও ফরাসী প্রতীকীদের প্রভাব কখনো ইংরেজী কাব্যের ধাতে বসে নি, তবু কি ফরাসী,

কি ইংরেজ, সকল সাহিত্যিকের মনেই তখন এই ধারণা বদ্ধমূল ছিলো যে তাঁরাই নূতন ধর্ম্মরহস্যের প্রবক্তা, পুরাতন অমৃতনিকেতনের প্রতিহারী, অনাগত নরনারায়ণের অগ্রদূত। কাজেই সে-সময়ে আত্মবিদ্ য়েট্স্ পর্য্যন্ত স্বকীয় অদর্শের সঙ্কীর্ণতা-সম্বন্ধে সচেতন হন নি; এবং যেহেতু স্বাবলম্বীরা স্বুদ্ধ আগে যুগের দাবি মিটিয়ে, তবে নিজের খেয়ালে চলতে পারে, তাই অকাল মৃত্যু, আত্মহত্যা, পানাসক্তি প্রভৃতি কারণে তাঁর বন্ধুদের একে একে হারিয়েও তিনি স্বভাবতই ভেবেছিলেন যে সেই সর্ব্বনাশের দায়িত্ব ততটা তাদের নয়, যতটা প্রতিবেশের।

খুব সম্ভব এ-বিশ্বাস শুধুই অতিরঞ্জিত, একেবারে ভিত্তিহীন নয়। অন্তত নেপোলিয়ন্-এর যুগ থেকে বাণিজ্যলক্ষ্মীই ইংলণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; এবং ইংরেজী কাব্যের সর্ব্ববাদিসম্মত উৎকর্ষ বাণীপ্রসাদেরই নিদর্শন বটে, কিন্তু সেখানে দেবীর বরপুত্রেরাও শুল্কসঙ্কোচের আন্দোলনে যে-উত্তেজনা দেখিয়েছেন, শিল্পস্বাতন্ত্র্যের সমর্থনে সে-উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। অবশ্য এজন্যে তাঁরা নিন্দাভাজন নন; হয়তো সাধারণ গ্রাসাচ্ছাদনের অপেক্ষাকৃত সুব্যবস্থাই তাঁদের মাতৃভূমিকে এত দিন ধ'রে প্রগতির পুরোভাগে রেখেছে; এবং স্বদেশের জল-হাওয়া সরস্বতীপূজার প্রতিকূল ব'লে, যত ইংরেজই স্বেচ্ছানির্ব্বাসন ব'রে থাকুন না কেন, তবু আজও ইংলণ্ডই উৎপীড়িত উদারনীতির অন্তিম আশ্রয়।

তবে ইংরেজী তিতিক্ষা বোধহয় ন্যায়পরায়ণতার ধার ধারে না; তার উৎপত্তি হয়তো বা সে-জাতির শ্লেষ্মাপ্রধান চারিত্র্যে; এবং সেইজন্যেই সেখানকার সমাজ যদিচ আবহমান কাল ব্যক্তিগত বাতিকের প্রশ্রয় দিয়েছে, তবু উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বরূপ সে-দেশে কোনো দিন প্রতিভার খাতিরেও সমাদৃত হয় নি। এই দিক থেকে তাকালে, তাদের সঙ্গে হিন্দুদের সাদৃশ্য ফুটে উঠবে; এবং বাইরে অনুষ্ঠান বজায় রাখলে, আমরা যেমন ভিতরে মানসিক নাস্তিকতার অনুমতি পাই, তেমনি প্রকাশ্যে চিরাচার বাঁচিয়ে চল্‌লে, তারা তাদের ভদ্রাসনকে নির্ব্বিবাদে স্বৈরতন্ত্রের দুর্গ বানাতে পারে। বলাই বাহুল্য যে এ-মনোভাবের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ কপটতা থাকলেও, এরই কল্যাণে ইংরেজ জাতি একাধিক উপনিপাতের পাশ কাটিয়ে গেছে; এবং কুসীদজীবীর অর্থের মতো সুপ্রযুক্ত সামর্থ্যও যেকালে ব্যয়ে বাড়ে বই কমে না, তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রসার ও পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উনিশ শতকের জনমত যে প্রায় অসাধ্যসাধনের ক্ষমতা ধরবে, তাতে বিস্ময়বোধের কারণ নেই।

কিন্তু প্রতিক্রিয়াবর্জ্জিত ক্রিয়া কষ্টকল্পনা; আদেশের উত্তর অবাধ্যতা,

এবং প্রকৃতি ও পুরুষের দ্বৈরথযুদ্ধে উভয়পক্ষ সমবল ব'লেই, মর্ত্ত্যধামও মোটের উপরে স্থিতিশীল। সুতরাং উনিশ শতাব্দীর শেষ দশকে সেই সর্ব্বশক্তিমান লোকাচারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত বিদ্রোহ যে হঠাৎ যুগ-যুগান্তের আগল ভাঙবে, তাতেও আশ্চর্য্যের অবকাশ নেই। সত্য বলতে কি, এই প্রতিবাদের আরম্ভ পেটর-এর সময়ে নয়, তাঁর সগোত্র ম্যাথ্যু আর্নল্ড্‌-ই এর উদ্যোক্তা; এবং অত্যধিক ব্যসনাসক্তিই ডাউসন্‌ প্রভৃতির সর্ব্বনাশ সেধেছিলো বটে, কিন্তু ব্রাউনিং-এর বহুপ্রশংসিত প্রগতিসেবাও পুঁথিগত পাতকবিলাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সম্ভবত সেইজন্যেই ওয়াইল্ড্‌-এর ভাগ্যে ইংরেজী অনীহার আনুকূল্য জোটে নি, আপামর সাধারণ ন্যায়ত তাঁকে অসামাজিক আন্দোলনের প্রতিভূ-রূপেই দেখেছিলো; এবং তাই যে-বিকৃতি ইংরেজদের মধ্যে নাতিদুর্লভ, সে-অপরাধের বোঝা বয়েছিলেন তিনি একলা।

স্বভাবগুণে য়েট্‌স্‌ কখনোই ওয়াইল্ড্‌-স্তাবকদের অন্যতম ছিলেন না; এবং ওয়াইল্ড্‌-এর কৃত্রিম জৌলস ও অতন্দ্র আত্মবিজ্ঞাপন চির দিনই তাঁর খারাপ লাগতো। তাহলেও ওয়াইল্ড্‌-সম্বন্ধে আবালবৃদ্ধবনিতার বিদ্বেষে তাঁর স্বকীয় অশ্রদ্ধার প্রতিবিম্ব দেখে তিনি খুশী হলেন না, বরং বুঝলেন যে পার্নেল্‌-এর মহত্ত্ব সইতে না পেরে ইংলণ্ড যেমন কুৎসার চাপে সেই অতিমানুষকে পিষে মেরেছিলো, তেমনি ওয়াইল্ড্‌-নির্য্যাতনের পিছনেও আছে অসামান্যের প্রতি সর্ব্বসাধারণের ঈর্ষ্যা। ফলত লণ্ডন্‌-এর হাওয়া হঠাৎ তাঁর কাছে বিষাক্ত ঠেকলো, স্মরণে এলো যে সাত্ত্বিক শিল্পী মরিস্‌ আর ইহলোকে নেই, তাঁর রূপদক্ষ অন্তরঙ্গেরা একে একে ধ্বংসের অভিমুখে এগোচ্ছে, এবং জনমন থেকে মহাপ্রাণ হেন্‌লি-কে ঠেলে ফেলে তাঁর জায়গা জুড়ে বসেছেন রডিয়ার্ড্‌ কিপ্লিং। অতএব য়েট্‌স্‌ স্বদেশে ফেরা ঠিক করলেন।

পুনরাবিষ্কৃত কেল্‌টিক্‌ ঐতিহ্য ইতিপূর্ব্বেই তাঁকে মজিয়েছিলো; এবং এই সময়ে লেডি গ্রেগরি-র সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তিনি ভাবলেন যে নাগরিক সভ্যতাই আধুনিক জগতের ঘুণ ধরিয়েছে; সে-মারীর বীজ যেখানে ছড়ায় নি, যেমন কৃষিপ্রধান আইরিশ্‌ জাতির মধ্যে, সেখানে মানুষ এখনো হয়তো অতিমর্ত্ত্য আত্মার সাড়া শোনে; গ্রামবাসীরা সকাল-সন্ধ্যা দিব্যযোনিদের সাক্ষাৎ পাক বা না পাক, মুক্ত প্রকৃতির সান্নিধ্যে বেড়ে উঠে তারা অন্তত স্থানমাহাত্ম্য মানে; তাদের স্বজ্ঞা যেহেতু কুশিক্ষায় বিগড়ে যায় নি, তাই তারা জানে যে পর্ব্বত ও সমুদ্র তো অসীমের প্রতীক বটেই, এমনকি অতীত মহাপুরুদের অমর সংস্পর্শে নিত্যনৈমিত্তিক মাঠ-ঘাট-বাট সুদ্ধ অলৌকিকের অখ্যাত আশ্রয়। যেখানে মানুষ স্থানসংক্ষেপবশত গড্ডলিকার

মতো গায়ে গায়ে ঠেসে থাকতে বাধ্য নয়, সেখানে তার পশুত্বপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কম; সেখানে সে নিজে স্বতন্ত্র, অতএব অন্যের মানরক্ষায় তৎপর; এবং সেইজন্যে যে-অধিকারভেদের অভাবে, শুধু শিল্প বা সাহিত্য নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রও আজ ম্রিয়মাণ, তার পুনরুজ্জীবন আয়ার্লণ্ডের মতো অনুন্নত দেশেই সহজ।

কারণ আইরিশ্ জাতি চির দিনই স্বপ্রাধান্যে বিশ্বাসী; এবং তাদের মজ্জাগত ব্যক্তিবাদ, যা আইরিশ্ স্বাধীনতার যুগে গেলিক্ কাব্যকে বিশুদ্ধ বীররসের আধার বানিয়ে রেখেছিলো, তা বর্ত্তমান কালে প্রাতঃস্মরণীয়দের নাম জ'পেই উপস্থিত পরাধীনতার অপমান ভুলতে চায়। সেইজন্যেই আঠারো শতকের বিশ্বসভ্যতায় জন্মেও বর্ক্লি তাঁর জাত্যভিমান ছাড়তে পারেন নি, লক্-এর সাধারণবোধ্য দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে বলেছিলেন যে সকল আয়ার্লণ্ডবাসীর মতো তিনিও অদ্বৈতের উপাসক; এবং ইংরেজদের রাষ্ট্রজীবনের সঙ্গে সুইফ্ট্ আর বর্ক্-এর সম্পর্ক যদিও অতিঘনিষ্ঠ ছিলো, তবু গণতন্ত্রের সময়োপযোগী মাহাত্ম্যকথন তাঁদের জিভে বাধতো। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রজ্ঞা ও পরিমিতি বিংশ শতাব্দীর আয়ার্লণ্ডেও সুলভ নয়; এবং প্রাচীনদের বীর্য্য ও আত্মনির্ভরতা অর্ব্বাচীনদের ক্ষেত্রে হয়তো ঈর্ষ্যা, কলহ, আর বাগ্‌বাহুল্যের রূপ ধরেছে।

তাহলেও য়েট্‌স্ দম্‌লেন না, ভাবলেন যে নেতৃনির্ব্বাচনেও যে-দেশ যোগ্যতা, কর্ম্মনিষ্ঠা বা কূট বুদ্ধিকে ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনে না, সহৃদয়তা ও স্বার্থত্যাগের পরিমাণেই ব্যক্তিত্বের মূল্য বোঝে, সে-দেশের সংস্কার নিশ্চয়ই অনায়াসসাধ্য, বাইরের রাজনৈতিক নির্য্যাতন থেকে অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্ত-শাসনের দিকে চাইলেই, এরিন্-এর হৃত গৌরব ফিরে আসবে। দিন-ক্ষণের গণনাতেও মুহূর্ত্তটাকে তাঁর অনুকূল লাগলো। পার্নেল্-এর পদচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে আইরিশ্ জাতির বৈধ আন্দোলনে পূর্ণচ্ছেদ পড়েছিলো। অতঃপর সারা দেশ জুড়ে সশস্ত্র বিপ্লবের গুপ্ত প্রচেষ্টা চল্‌লেও, সেখানকার নিরবলম্ব জাতীয়তা বাহ্যত ছুটেছিলো ভাবলোকের দিগ্বিজয়ে। উপরন্তু আন্তর্জ্জাতিক ঐক্যের ধরতাই বুলি তখনো চরমপন্থার বীজমন্ত্র হয়ে ওঠে নি। কাজেই তরুণ য়েট্‌স্-এর কাছেও স্বদেশী ঐতিহ্যের অনুশীলন মর্য্যাদাবান ঠেকেছিলো, তিনি মেনেছিলেন যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ব্যক্তি ও জাতি, উভয়েরই কাম্য, এবং বহির্জগৎও যেকালে ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়ার্থের দ্বারাই গঠিত, তখন নিজেদের চিনলেই, আমরা বিশ্বকে চিনবো।

অথচ বিশ্ববীক্ষা আত্মজ্ঞানেরই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, তার সঙ্গে অহঙ্কারের কোনো সম্পর্ক নেই; এবং অবগতি, হৃদয় বা বুদ্ধি, যে-পথ দিয়েই

আসুক না কেন, নির্ম্মম নিরপেক্ষতাই তার চিরপরিচিত লক্ষণ। অবশ্য মনোবিজ্ঞান নৈরাত্ম্যসিদ্ধিতে বীতশ্রদ্ধ; কিন্তু বেণ্টাম্-আদি হিতবাদীরা পরমার্থের শূন্যেও স্বার্থের প্রতিধ্বনি শুনেছিলেন; এবং এই প্রসঙ্গে ফ্রয়েড্ ব্যতীত অপর মনস্তাত্ত্বিকদের অনুমোদন থাক আর না থাক, অভিজ্ঞ মানুষমাত্রেই জানে যে অত্যাসক্তিও নিরাসক্তির মতো অমায়িক, সে কখনো প্রিয়পাত্রদের দোষ ঢাকতে চায় না, বরং ত্রুটির অসংখ্যতা ভালো-বাসাকে অনন্তে পাঠায়। বস্তুত এই বৈপরীত্য শুধু প্রেমের সম্বল নয়, প্রবল সংরাগ সদা-সর্ব্বদাই স্বতোবিরোধী; এবং এলিজাবেথী নাটকে সেনেকা-র দান কতখানি, তার বিচারে নেমে এলিয়ট্ দেখিয়েছেন যে তখনকার ট্র্যাজিক্ নায়ক-নায়িকারা আত্মধিক্কারের অগাধে তলিয়েই আত্মরতির শুক্তি কুড়তো। রিচার্ড্স্-ও অনুরূপ সিদ্ধান্তের পরিপোষক; এবং তাঁর শিষ্য এম্প্‌সন্-এর মতে নিজের নিন্দা ছাড়া আত্মশ্লাঘার উপায়ান্তর নেই ব'লেই, মানুষের অসারতা মনুষ্যধর্ম্মের মুখ্য উপজীব্য।

এই মন্তব্যে যে সাম্প্রতিক দ্ব্যর্থপ্রীতির আভাস নেই, তা প্রাচীন দর্শনের সকল অনুরাগীই মানবেন। কারণ নেতিবাদ ন্যায়শাস্ত্রের সুপ্রাচীন পদ্ধতি; এবং প্রাক্‌হেগেলীয় তাত্ত্বিকেরাও অস্তি-নাস্তির তাৎকাল্যে আস্থাবান ছিলেন। সম্ভবত সক্রেটিস্-ই এই আর্য্যসত্যের আবিষ্কর্ত্তা; অন্ততপক্ষে আরিস্টটল্-এর গুরুনিপাতনী স্বকীয়তায় এর অভিব্যাপ্তি অবিসংবাদিত; এবং অন্য সব বিষয়ে তাঁর ভ্রান্তি বুঝে প্লোটাইনাস্ যদিচ আবার প্লেটো-তেই ফিরে গিয়েছিলেন, তবু বিশেষের সামান্যতা অথবা সামান্যের বৈশিষ্ট্য-স্বীকারে তিনি একবারও দ্বিধা করেন নি। বোধহয় কৈশোরে হিন্দু দর্শনের চক্রান্তে প'ড়ে য়েট্‌স্ চির দিনই প্লোটাইনাস্-এর অনুগামী; এবং সেইজন্যে আত্মোপলব্ধি আর বিশ্বোপলব্ধির মধ্যে তিনি কখনো ব্যবধান রাখেন নি, সার্ব্বভৌম সাধকসম্প্রদায়ের নির্দ্দেশে ভেবেছেন যে সম্ভাব্যতার অনুপাতে উপস্থিতের বৈকল্য জেনেই মানুষ দিনে দিনে, যুগে যুগে, হয়তো বা জন্মে জন্মে, নিঃশ্রেয়সের দিকে আস্তে আস্তে এগোয়। কেননা সান্ত আর অনন্ত, বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ, আত্মা আর অনাত্মার সালোক্যই পুরুষ-সিদ্ধির অদ্বিতীয় পন্থা; এবং ভাবাভাবের সেতুবন্ধ যে শুধু মরমী ব্যাসকূটের পুনরাবৃত্তি নয়, বৈজ্ঞানিক তথ্যেরই মর্ম্মোদ্‌ঘাটন, তার প্রমাণ অধুনাতনী জ্যামিতি, যাতে অসীমের বাইরেই সমান্তরের মিলন সুসাধ্য, এবং ব্যস্তবাগীশেরাও শ্রময়সাশ্রয়ে সরল রেখা এড়িয়ে চলেন।

সে যাই হোক, উক্ত নিঃশ্রেয়স যে ভূমা বা ভগবান নয়, এ-বিষয়ে য়েট্‌স্ আজ নিশ্চিত, এবং যৌবনসুলভ অধ্যাত্মনিষ্ঠার দিনেও এতে তাঁর

যথেষ্ট সংশয় ছিলো। কারণ তাঁর ব্যক্তিবাদ লাইব্‌নিৎস্‌-এর চেয়েও উগ্র, এত উগ্র যে সাধিতপূর্ব্ব সাম্য দূরের কথা, তিনি যুক্তির সার্ব্বজনীনতা মান্‌তেও অনিচ্ছুক। তাঁর মতে অন্বীক্ষা সত্য-আবিষ্কারের পন্থা নয়, সত্যবত্তা-উৎপাদনের যন্ত্র, তার পিছনে সাধনার নম্রতা বা অতিক্রান্ত প্রতর্কের উৎকণ্ঠা নেই, আছে ব্যাবসায়িক ধূর্ত্ততা আর জ্ঞানপাপীর নিশ্চিন্ত প্রাগল্‌ভ্য। সেইজন্যেই তর্কযুদ্ধে পরাজয় দুঃসহ এবং বিজয় অকিঞ্চিৎকর ; তার সমস্তটাই যেকালে একটা চিরাচরিত পদ্ধতি, একটা নিরর্থ অভ্যাস, তখন তাতে বৈফল্য শুধু প্রতিকার্য্য অসতর্কতার পরিণাম, সাফল্য কেবল জাগ্রত স্মৃতিশক্তির প্রসাদ ; এবং এই দোষ-গুণের একটাও সহজ নয়, প্রত্যেকটাই আপতিক। কিন্তু আবেগ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ; তার কমঠবৃত্তি মনোবিজ্ঞানীরও অবশ্যস্বীকার্য্য ; সে দেশ-কালের তোয়াক্কা রাখে না, আপন চালে চলে, নিজের প্রয়োজনে থামে, এবং তার মূল জন্মান্তরে, অন্ততপক্ষে পুরুষান্তরে, প্রোথিত।

সুতরাং তার সঙ্গে ব্যক্তিস্বরূপের কোনো বিবাদ নেই ; এবং সম্বেগের সংঘাতে চারিত্র্য যদিও অনেক সময়েই নিপাতে যায়, তবু তাতে আত্মোপলব্ধির বাধা ঘোচে। কেননা, কথাগুলো অদ্ভুত শোনালেও, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আর ব্যক্তিস্বরূপের মধ্যে আকাশ-পাতালের প্রভেদ ; এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যেখানে বর্ত্তমানকে অসংপৃক্ত ভাবে, ব্যক্তিস্বরূপ সেখানে দেখে ভূত-ভবিষ্যতের বের্গসনী অন্তঃপ্রবেশ। অবশ্য পঞ্জিকার সাহায্যে এই কালের গণনা অসাধ্য ; একে সার্ব্বিক বলা কষ্টকল্পনা ; এর সঙ্গে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ খাপ খায় না, খুব জোর কর্ম্মবাদের তুলনা চলে। তাহলেও এর ত্রিসীমানায় নীট্‌শে-র পদার্পণ নিষিদ্ধ ; এই পরিমণ্ডল থেকে ব্যক্তির পলায়ন অভাবনীয় ; এবং এর ভিতরে সুকৃতি-দুষ্কৃতির কোনো লোকোত্তর প্রতিমান নেই বটে, কিন্তু দায়িত্বমুক্তির আশাও বিড়ম্বনা। এইজন্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বরূপ নির্ব্বিকল্প নির্ব্বাণের সমকক্ষ ; আত্মম্ভরিতা উভয়ত্রই ইষ্টলাভের অন্তরায় ; এবং সকল চিত্তবৃত্তির মধ্যে একা আবেগই যেহেতু নিষ্কাম ও নৈর্ব্যক্তিক, তাই বৌদ্ধ মতে তার পরিহার অত্যাবশ্যক হলেও, তার কাছে আত্মসমর্পণই, য়েট্‌স্‌-এর বিবেচনায়, কৈবল্যপ্রাপ্তির অন্যান্য উপায়।

য়েট্‌স্‌-এর উপরোক্ত উপদেশ যে অযৌক্তিক, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই ; এবং যে-বিরোধবোধ তাঁর পরাবিদ্যার ভিত্তি, তা নিশ্চয়ই ন্যায়াতিরিক্ত, কিন্তু কোনো মতেই নিরবচ্ছিন্ন নয়। সত্য বলতে কি, এই নিরুপাধিক বৈপরীত্যও একটা পারিভাষিক পদার্থ ; য়েট্‌স্‌ একে যদিও তত্ত্বসন্ধানে

বেরিয়ে আবিষ্কার করেন নি, কাব্যাদর্শ খুঁজতে খুঁজতেই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তবু আবেগসর্ব্বস্বতাও বুদ্ধিবাদের মতোই নিরপেক্ষ নিষ্কর্ষণের ফল; এবং সার্ব্বজনীন চিন্তাপদ্ধতি যেমন যাথার্থ্যশূন্য, ঐকান্তিক হৃদয়সংবেদ্যতাও তেমনি নিরর্থক। বুদ্ধিবিদ্বেষী হলেও, য়েট্‌স্‌ যেহেতু নির্ব্বোধ নন, তাই এ-কথা জানতে তাঁর দেরি লাগে নি। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি দেখেছিলেন যে কাব্যের পরাকাষ্ঠা ট্র্যাজেডি; এবং সাহিত্যের সেই নাতিনূতন বিভাগটার আবাল্য আলোচনা তাঁকে অনায়াসে বুঝিয়েছিলো যে নাটকের মধ্যস্থতায় আরিস্টটলী চিত্তশুদ্ধি ঘটাতে গেলে, পাত্র-পাত্রীর স্বসীম বৈশিষ্ট্যের নিটোল ভাস্কর্য্য ততটা প্রয়োজনীয় নয়, যতটা আবশ্যিক আবেগের অবিমিশ্রতা।

এইখানেই শিল্পের সঙ্গে সংসারযাত্রার প্রভেদ; এবং আবেগই জীবন্ত মানুষকে কর্ম্মপ্রবর্ত্তনা জোগালেও, লাভ-ক্ষতির আশা-আশঙ্কায় দৈনন্দিন আবেগ দ্বিধাদুর্ব্বল ও অপবিত্র। কাজে কাজেই প্রাত্যহিক মানুষের ইতিহাসে দুঃখ আছে, ট্র্যাজেডি নেই, দৈন্য আছে, সর্ব্বনাশ নেই; সে ঠ'কে লোক হাসাতে পারে, কিন্তু ভুল ক'রে প্রমিতির বার্ত্তা রটাতে পারে না। অতএব সাধারণ মানুষ কমেডির নায়ক, তার উদ্দেশ্য লোকরঞ্জন; এবং যে-কবি আমাদের অবসরবিনোদনের সাথী, তাঁর পক্ষে নামরূপের ধ্যানই যথেষ্ট। কিন্তু যিনি লোকশিক্ষার জন্য ব্যগ্র,—এবং ট্র্যাজেডির প্রধান কর্ত্তব্য আত্মার উন্নতিসাধন,—তিনি জাতিরূপের অন্বেষণে বাধ্য, প্রতিবিম্বে তাঁর আশ মিটে না, তিনি চান প্রতীক।

এই প্রতীক সাধারণের হিতার্থে পরিকল্পিত; এর সংগঠনে মালার্মে-পন্থী দুরূহতার স্থান নেই; এবং তাঁর "ট্রেম্ব্লিং অফ্‌ দি ভেল্‌"-উপাধেয় আত্মজীবনীর নামকরণে সেই কবির প্রতিধ্বনি যদিও ইচ্ছাকৃত, তবু ফরাসী প্রতীকীরা য়েটস্‌-এর থেকে পৃথক। অন্ততপক্ষে মালার্মে-র চোখে স্বপ্নই একমাত্র সত্য; এবং স্পর্শনীয়, দর্শনীয় দৈনিক সংসার তাঁর কাছে এমন অবাস্তব লাগতো যে মানুষী ভাষায় অতীন্দ্রিয় আত্মোপলব্ধির প্রকাশ-চেষ্টাকেও ব্যর্থ জেনে তিনি প্রায়ই বলতেন যে কবিপ্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ শাদা কাগজের নিষ্কলঙ্ক মৌনিতায়। এ-মতে য়েটস্‌-এর সমর্থন নেই। হয়তো "কৃচ্ছ্রসাধনের মোহ" তাঁকে কৈশোরেই মজিয়েছিলো; এবং তিনি প্রাক্তন সংস্কারের কল্যাণে বুঝেছিলেন যে সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্যাসকূট সহজ-সাধ্য, প্রাঞ্জলতাই প্রাণপাত পরিশ্রমের ফল। হয়তো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আলেখ্যশিল্পের প্রভাব তিনি এড়াতে পারেন নি, এবং প্রথম জীবন পৈত্রিক বিদ্যাভ্যাসে কাটিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে ভালো ছবি বাগর্থের

অতীত হলেও, প্রকৃতির পদানুসরণে তার অনিচ্ছা থাকলেও, আপন গঠন-সৌষ্ঠবের গুণে অসীমকে, অমূর্ত্তকে, কাল্পনিককে দৃষ্টিগোচরে এনেই সে চরিতার্থ।

সেইজন্যেই যৌবনারম্ভে "রাইমার্স্ ক্লাব্"-এর সভ্যতালিকায় নাম লিখিয়ে তিনি অল্প বয়স থেকে বিজ্ঞের মতো ভাবতে শিখেছিলেন বটে, কিন্তু অচিরে জে-এম্ সিং আর লেডি গ্রেগরি-র সংসর্গে এসে তিনি সেই ভাবের অভিব্যক্তির জন্যে যে-ভাষা, যে-চিত্রকল্প, যে-বহিরাশ্রয় বেছে নিয়েছিলেন, তাতে ইবসেনী উন্নাসিকতার বা উইস্মানী বৈদগ্ধ্যের লেশমাত্র ছিলো না; গ্রীক্ নাট্যকারদের মতো সকল রকম আধিক্য বাঁচিয়ে সহজ, সরল, পৌরাণিক বা পুরাণতুল্য আখ্যায়িকার পটে বিশ্বমানবের স্বরূপ ফুটে উঠলেই, তাঁর মনে প্রসাদ জাগতো। ফলত তাঁর কবিতায় নিরাকার প্রত্যয় আদর পেতো না; তাঁর পৃষ্ঠপোষণে বিদ্যাভিমানীর আত্মগৌরব বাড়তো না; তাঁর অনধিকার চর্চ্চায় দার্শনিকের অন্ন-জল ঘুচতো না; সে-কাব্য আশাপথ চাইতো শুধু সঙ্গীতপ্রিয় শ্রোতার আর সঙ্গতিপ্রেমিক দর্শকের।

অর্থাৎ য়েট্স্ বস্তুকে উড়িয়ে দিলেন না; তাকে শুধু তাঁর অস্থায়ী লাগলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটাও বুঝলেন যে স্বপ্নকে ততোধিক অবিনশ্বর ব'লে ভাবার কোনো সঙ্গত হেতু নেই। সুতরাং তিনি প্রয়োগের সাহায্যে প্রমাণ করতে চাইলেন যে অতিবস্তুও বস্তুর মতোই সত্য; এবং মানুষ যদি পৃথিবীতে বাসা বাঁধতে পারে, তবে ভূত-প্রেত, অপ্সর-গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ছুৎমার্গ অচল। তবু যে আমরা তাদের মানতে অনিচ্ছুক, তার কারণ বিশ্বচরাচরের সম্পূর্ণ উপলব্ধি আমাদের নেই; এবং প্রত্নতত্ত্ব নখদর্পণে না এলে, আমরা যেমন প্রাক্কালীন অস্ত্র-শস্ত্রকে লোষ্ট্র বিবেচনায় অন্যমনে ঝেড়ে ফেলি, তেমনি বিদেহ নগরের সাক্ষাৎ পরিচয়েও আমাদের চোখ ফোটে না অবিদ্যারই অনুগ্রহে। কিন্তু অজ্ঞান কেবল অশরীরী-সম্পর্কেই অন্ধতা আনে না, প্রত্যক্ষও সমান দুর্জ্ঞেয়; সেখানেও ইন্দ্রিয়লব্ধ বিগ্রহের মধ্যে বিগ্রহাতীতকে না খুঁজে আমরা খেলায় মাতি অভিজ্ঞতা-নামক পাষাণপ্রতিমা নিয়ে।

অতএব বিজ্ঞানের দম্ভ আঁকড়ে থাকলে, আর চলবে না; অভিজ্ঞতার করাঘাতে মনের দরজা খুলতে খুলতেই বলতে হবে যে সে-আগন্তুক যে-দেশের দূত, তার আক্রমণ মারাত্মক বটে, কিন্তু তার অভিপ্রায় অবেদ্য, অভেদ্য, অনর্থময়। এর পরে অদ্বিতীয় অভিজ্ঞতা মূল্যহীন, বরঞ্চ অতি-সাধারণই বরণীয়; এবং তার সম্বন্ধে আর কিছু না জানলেও, অন্তত এই-টুকুর খবর আমরা রাখি যে মর্ত্ত্যধামে তাকে ফিরে ফিরে পাঠিয়ে মানুষের ভাগ্যবিধাতা তার প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখাচ্ছেন। কিন্তু বিধাতা-শব্দের

ব্যবহারে হয়তো য়েট্‌স্‌-এর আপত্তি আছে; কেননা অদৃষ্টের পরিকল্পনায় তিনি কোনো বিরাট পুরুষের শরণ নেন নি। তাঁর মতে বৈদান্তিক ব্রহ্মের মতো একটা স্বতোবিরোধী উদ্বাস্ত চৈতন্য স্বভাববশে দানা বেঁধে মাঝে মাঝে ব্যক্তির আকার ধরে; এবং তাই তিনি মানুষের খলন-পতন-ত্রুটি কোনো ক্রমে সয়ে যান। সেইজন্যেই নাটকেও তিনি চরিত্রচিত্রণে উদাসীন, তাঁর রঙ্গরচনায় প্রাধান্য পায় চরিত্রগত আবেগ, আবেশ ও অনুভূতি।

পক্ষান্তরে য়েট্‌স্‌ রোমান্টিক্‌ নামেই খ্যাত; এবং সেই খেয়ালী দলের কাছে আকস্মিক উন্মাদনার মূল্য আজন্ম অভ্যাসের চেয়ে বেশি; তাঁদের কর্ম্মপ্রবৃত্তি ততটা সাধনার অনুকূল নয়, যতটা প্রেরণার মুখাপেক্ষী; আত্মজ্ঞানকে দাবিয়ে অহঙ্কারকে বাড়াতে তাঁরা সকলেই সিদ্ধহস্ত। অবশ্য এ-নিয়মের ব্যতিক্রমেই রোমান্টিক্‌ সাহিত্য উৎকর্ষে পৌঁছেছে; এবং নিঃসম্পর্ক নৈমিষে চির নির্ব্বাসিত থাকতে চান কি ব'লেই, ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ্‌ মহাকবি। কিন্তু কোনো আন্দোলনের বিচারে তার মুখ্য পাত্রদের বাদ দেওয়াই বিধেয়; এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মতে সার্ব্বজনীন নিয়ম কবিকল্পনামাত্র, যা আসল, তা একটা ঝোঁক, একটা অনির্দ্দিষ্ট সমষ্টির অনিশ্চিত ঐকাচরণ। এ-সিদ্ধান্ত অন্যায় ঠেকলেও, অন্তত এটা অবিসংবাদিত যে উনিশ শতকের শেষ কবিরা আর ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্‌-কীর্ত্তিত নিরুদ্বেগ স্মৃতির সাহায্যে কাব্য লিখতেন না, উপস্থিত উত্তেজনার উচ্ছৃঙ্খল প্রকাশই তাঁদের সাহিত্যসেবার মূল মন্ত্র হয়ে উঠেছিলো; সুতরাং স্বজাতি প্রথমটা য়েট্‌স্‌-কে সন্দেহের চক্ষেই দেখলে; এবং আইরিশ্‌ আত্মরতিকে আত্মবেদে বদলানোর যে-স্বপ্ন তাঁকে জন্মভূমিতে ফিরিয়ে এনেছিলো, তা অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বপ্নই রয়ে গেলো।

সে-মনোমালিন্যের জন্যে কোনো এক পক্ষ দূষণীয় নয়; এবং তার ফলে য়েট্‌স্‌ যদিও তখন তখন জাতীয় জীবন থেকে স'রে দাঁড়ালেন, তবু আজ তিনি না মেনে পারেন না যে তারই কল্যাণে তাঁর উপস্থিত আত্মসমাহিতি অন্য সব কবির চেয়ে বেশি। বস্তুত উদ্দীপনার বিচারে য়েট্‌স্‌-এর সাময়িক উষ্মা হয়তো আইরিশ্‌ জাতির তদানীন্তন অসহিষ্ণুতার অপেক্ষা অধিক অহৈতুক; এবং ইতিপূর্ব্বেই নিঃসংশয় প্রতিভার জোরে ইংরেজ মনীষীদের মহলে তাঁর পসার জমাতে আয়ার্লণ্ডবাসীরা স্বভাবতই ভেবেছিলো যে অপ্রিয় সত্য-সম্বন্ধে তিনি অতখানি স্পষ্টবাদিতা দেখালে, এরিন্‌ অচিরেই অবশিষ্ট বিদেশী বন্ধু-কটিকে হারাবে। উপরন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রত্যুষেই ফ্রয়েডী গবেষণার ফসল ফল্‌লেও, মনোবিকলনকে কেউ তখনো নিত্যব্যবহার্য্য বিলাসবস্তুর অন্তর্ভুক্ত করে নি; এবং সে-দিনে অনেকেই নিরীশ্বরবাদের দিকে ঝুঁকেছিলো বটে,

কিন্তু সে-কালের নাস্তিকেরা সুদ্ধ জানতো যে আস্তিকদের বিশ্বাস তাদের মতোই সরল ও স্বতঃপ্রকাশ।

ফলত য়েট্‌স্‌-এর প্রথম নাটক 'দি কাউণ্টেস্ ক্যাথ্‌লিন্‌' কোনো দলেরই মন পেলে না। ক্রোধান্ধ ক্যাথলিকেরা স্বভাবতই বল্‌লে যে সে-দয়াবতী যদি সয়তানের কাছে আত্মা বেচেও অক্ষয় স্বর্গে ঢুকতে পারে, তাহলে এত অনাচার, অত্যাচার সয়ে চার্চ্চের হিতৈষণা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন; এবং অসন্তুষ্ট অধার্ম্মিকেরা ন্যায়ত রটালে যে মোক্ষ যখন সুকৃতির পুরস্কার নয়, সদিচ্ছার সাক্ষ্য, তখন ভগবান সত্য সত্য থাকলে, সবাইকেই সমান সৌভাগ্য বর্ত্তাতো, এবং তা যেহেতু দুর্ঘট, তাই বিধাতা নেই, মানুষ অন্ধ নিয়তির ক্ষণিক খেলনা। য়েট্‌স্‌-এর পরবর্ত্তী নাটিকা 'ক্যাথ্‌লিন্‌ নি হুলিহান্‌' ঝগড়াটাকে আরো পাকিয়ে তুল্‌লে। তাতে অবশ্য ধর্ম্ম-সম্পর্কে কোনো কটাক্ষ ছিলো না, ছিলো জনসাধারণের দেশভক্তি-সম্বন্ধে সন্দেহ; এবং সে-ইঙ্গিত যথার্থ ব'লেই, সকলের কাছে দুঃসহ ঠেকলো।

সাধারণ পুরুষ স্বাধীনতার চেয়ে টাকাকে বেশি ভালোবাসে, সাধারণ নারী আদর্শনিষ্ঠা ছেড়ে সুখের সংসার আঁকড়ে ধরে, এ-অভিযোগের সারবত্তা বুঝেই আবালবৃদ্ধবনিতা ক্ষেপে উঠলো; এবং অতঃপর য়েট্‌স্‌-প্রতিষ্ঠিত 'আইরিশ লিটেরারি থিয়েটর'-এ সিং-এর প্রাকৃত নাটকাদির অভিনয় আইরিশ আত্ম-প্রসাদে ঘৃতাহুতি ঢাললে না, দেশব্যাপী দাঙ্গা-হাঙ্গামের উপলক্ষ জোগালে। এত দিন পর্য্যন্ত য়েট্‌স্‌-এর কপালে ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের অভাব ঘটে নি; কিন্তু এইবার তাঁর অন্তরঙ্গেরাও স'রে দাঁড়িয়ে দৈনিক গালি-গালাজের সঙ্গে সুর মেলালেন; দারিদ্র্য, নৈরাশ্য ও দুরারোগ্য রোগে জে-এম্‌ সিং অকালে মারা গেলে, স্বদেশী বিদগ্ধমণ্ডলী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন; এবং যে-দু-তিন শ দর্শকের মুখ চেয়ে 'আইরিশ্‌ ন্যাশনল্‌ থিয়েটর' স্বপ্নপ্রয়াণে বেরিয়েছিলো, অল্পে অল্পে তাদের সুদ্ধ খুইয়ে য়েট্‌স্‌ শেষ পর্য্যন্ত এমন নাটক লিখতে লাগলেন যা শুধু তাঁর বৈঠকখানায় একান্ত আপন জনের সামনেই অভিনেয়।

বারম্বার দেখা গিয়েছে যে তথাকথিত শুদ্ধ শিল্পের শামুকে ঢুকে অনাদৃত দাম্ভিকেরা পারিপার্শ্বিক উপেক্ষার জ্বালা জুড়োয়; এবং সেইজন্যেই মার্ক্‌স্‌-বাদী সমালোচকদের তুলামূল্যে আমাদের আস্থা না থাকলেও, শিল্পী-বিশেষের সম্পর্কে তাঁদের মারাত্মক মন্তব্য আমরা অনেক সময়েই অগত্যা মানি। কিন্তু প্রকৃত পবিত্রতা শুধুই দুঃসাধ্য, একেবারে অসাধ্য নয়; এবং যেখানে তার সাক্ষাৎ মেলে, সেখানে তার অভিনন্দন কোনো রকম আত্মীয়তার অপেক্ষা রাখে না, নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বী স্বেচ্ছায় সাময়িক বিসংবাদ উৎরিয়ে এক দিন না এক দিন তার পায়ে মাথা নোওয়ায়। য়েট্‌স্‌-এর

বেলাতেও এ-নিয়ম খাটে; এবং তাঁর রূপকারী বিবেক যেহেতু নিন্দুকদের বাক্যবাণে বিষিয়ে ওঠে নি, বরঞ্চ নৈঃসঙ্গ্যের পরিপোষণে তাঁর হৃদয়ের গভীরতা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য বেড়েছে, তাই 'অ্যাট্‌ দি হক্‌স্‌ ওয়েল্‌'-প্রমুখ নাটিকাগুলির সচেতন শুচিবায়ুও আজ আর জনতার সাধুবাদকে ঠেকাতে পারে না; সকলেই জানে যে বিশ্বসাহিত্যে আয়ার্লণ্ডের নিজস্ব দান এই চরিত্রচিত্রহীন, অদৃশ্য, দুস্পৃশ্য, সম্বেগসর্ব্বস্ব নাট্যরচনা।

অবশ্য 'হক্‌স্‌ ওয়েল্‌'-এর মধ্যে য়েট্‌স্‌-প্রতিভার কোনো অপ্রত্যাশিত উন্মেষ আমি দেখতে পাই না; এবং তাঁর আকস্মিক পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধে আধুনিকেরা আজকাল যত বাক্যব্যয় করেন, তার অধিকাংশই আমার অমূলক লাগে। কারণ এক হিসাবে য়েট্‌স্‌-এর চেয়ে সুপরিপক্ক লেখক বোধহয় ইংরেজী ভাষায় আগে কখনো কলম চালায় নি; এবং তাঁর প্রথম বয়সের 'ক্রস্‌ওয়েজ্‌' যেমন নিখুঁৎ রূপের ঝলকে আজও আমাদের চমকে দেয়, তেমনি গত শতাব্দীতে লেখা তাঁর প্রবন্ধাদি না পড়লে, শেষ জীবনের 'দি টাওয়ার' অথবা 'দি ওয়াইণ্ডিং স্টেয়ার্স্‌' বোঝা যায় না। সুতরাং বিনয় ও ঔদার্য্যের আধিক্যবশত তিনি নিজে এ-কথা ভাবলেও, এটা সত্য নয় যে ছন্দস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি সাম্প্রতিক গুণগুলোর জন্যে য়েট্‌স্‌ এজ্রা পাউণ্ড্‌-এর কাছে ঋণী। আসলে উৎকর্ষের বিচারে তিনি চির দিনই অপ্রতিদ্বন্দ্বী; এবং কাব্যকলার বিষয়ে তাঁকে কখনো কেউ কিছু শেখায় নি, উলটে অনেকেই তাঁর দানসত্র থেকে বিনা রসিদে আপন আপন ব্যবসায়ের মূলধন নিয়ে গেছে।

তাহলেও তাঁর বর্ত্তমান প্রতিপত্তির জন্যে শুধু পাঠক-সাধারণের উন্নততর রুচিই প্রশংসনীয় নয়, তাঁর নিজের পরিবর্ত্তনও উল্লেখযোগ্য; এবং সে-পরিবর্ত্তন যদিও এমনি সঙ্গত ও আশানুরূপ যে তাকে পরিবর্দ্ধন বলাই বিধেয়, তবু তার ফলে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপেরই বাধন ছেঁড়ে নি, বিশ্ববীক্ষার অবৈকল্যও সম্পূর্ণ হয়েছিলো। এক হাতে যখন তালি বাজে না, তখন কবি-পাঠকের দোটানায় একা পাঠকই দায়ী নয়; এবং এ-অনুযোগ ঠিক বটে যে প্রাক্‌সামরিক পাঠকের অন্ধকার অবিদ্যাই য়েট্‌স্‌-এর যশোরবিকে অনেক দিন পর্য্যন্ত ছেয়েছিলো, কিন্তু তাঁর ও মূর প্রভৃতি সহকর্ম্মীদের অনাবশ্যক ঔদ্ধত্য ও ভেদবুদ্ধিই যে বহু অনুকম্পায়ীকে ফিরিয়ে পাঠিয়েছিলো, তাও প্রায় নিঃসন্দেহ। তবে ইতিহাস কারো হাত ধরা নয়, এমনকি সোহংবাদী য়েট্‌স্‌-ও সে-প্রভুত্বে বঞ্চিত; এবং ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধ, ১৯১৬ সালের ইস্টর বিদ্রোহ ও ১৯১৯ সালের গৃহবিচ্ছেদ যেমন জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিকে সাহিত্যিক মতান্তর থেকে রাষ্ট্রনৈতিক মনান্তরের দিকে

ফেরালে, তেমনি য়েট্‌স্‌-ও বুঝলেন যে এই রক্তগঙ্গায় যারা ডুবেছে বা স্নান সেরে এসেছে, তাদের কেউ কেউ তাঁর পূর্ব্বতন শত্রু হোক আর নাই হোক, তারা সকলেই মহৎ, সকলেই উদার ও শ্রদ্ধার্হ, আত্মসমাহিত শিল্পজগতে তাদের প্রবেশাধিকার না থাকলেও, শিল্পোত্তর অমৃতলোকে তাদের পদার্পণ অব্যাহত।

তাই ব'লে তিনি তাঁর আজন্মের সাধনা বা চির জীবনের বিশ্বাস মুহূর্ত্ত-মধ্যে ঝেড়ে ফেললেন না। কিন্তু এর পরে তাঁর উপরে সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ কেমন যেন ক'মে গেলো; অন্ততপক্ষে তিনি না মেনে নিস্তার পেলেন না যে ছুৎমার্গে চ'লে কদর্য্যের কুসঙ্গ এড়ালেই, সুন্দরের সন্দর্শন মেলে না, সেজন্যে রূপদক্ষের হাতে কুৎসিতের সাক্ষাৎ পরাভব অপরিহার্য্য। অবশ্য তত্ত্ব হিসাবে এ-সত্য য়েট্‌স্‌ বহু পূর্ব্বেই অঙ্গীকার করেছিলেন; এবং তাঁর দার্শনিক মতামতের মূল কথা এই যে বিপরীতের সঙ্গে নিজের সমীকরণেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা গ'ড়ে ওঠে। কিন্তু এ-সকল মীমাংসা এত দিন পর্য্যন্ত তাঁর বুদ্ধির শিখরে বাসা বেধেছিলো, তাঁর সত্তার শিকড়ে, তাঁর অনুভূতির মর্ম্মে নামতে পারে নি। ১৯১৬ সালে সে-বাধা হঠাৎ এক দিন ঘুচলো; নিষ্ফল বিপ্লবে প্রাণ হারিয়ে অতিসাধারণ মানুষও এক ভীষণ সৌন্দর্য্যের জন্ম দিলে; এবং সেই সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেমিকদের ক্ষমা ক'রে, তাদের কীর্ত্তিগাথা গেয়ে, তাদের ও নিজের প্রেতার্ত্ত অতীতের স্মরণার্থে য়েট্‌স্‌ এই সময় থেকে যে-কাব্য লিখতে লাগলেন, তা মাধুর্য্যে হয়তো তাঁর প্রাক্কালীন কবিতাসমূহের চেয়ে নিকৃষ্ট, কিন্তু মর্য্যাদায় সেগুলোর বহু উর্দ্ধে।

আগেই বলেছি যে অন্তত আমার মতে য়েট্‌স্‌-এর কোনো পরিবর্ত্তনই অপ্রত্যাশিত নয়; এবং যাঁরা বিনা মনোযোগেও তাঁর গ্রন্থসমূহ পড়তে গেছেন, তাঁরা সুদ্ধ দেখে থাকবেন যে ইদানীং তিনি যে-সব বিষয়ে কবিতা লিখছেন, ইতিপূর্ব্বে সেই সকল প্রসঙ্গই তাঁর প্রবন্ধাদির উপজীব্য ছিলো। কিন্তু আমার অনুসারে প্রসঙ্গ কাব্যের বহিরঙ্গমাত্র, তার তন্মাত্র রূপ; এবং কোনো কৃত্রিম কলাকৌশলের উপরে এ-রূপের ভিত্তি নয়, এর মূল রূপকারের স্বায়ত্তশাসনে। অবশ্য উৎকৃষ্ট গদ্যসাহিত্যেও লেখকের যথেচ্ছাচার অচল; কিন্তু সেখানে বিষয় বিষয়ীর জন্মদাতা; এবং কাব্যের ধর্ম্ম ঠিক এর উল্‌টো, এখানে প্রকার প্রকারীর প্রবর্ত্তক। অতএব য়েট্‌স্‌-এর অর্ব্বাচীন কাব্যে প্রাচীন প্রবন্ধের পুনরুক্তি শুনে তাঁকে নির্ব্বিকার ভাবা অনুচিত; এ-ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তই সমীচীন যে এত কাল ধ'রে তিনি হৃদয় আর বুদ্ধির মধ্যে যে-ব্যবধান রেখেছিলেন, আজ তা সেতুসংযুক্ত; এবং আজকাল তিনি

বুদ্ধির সাহায্যে উপলব্ধি আর হৃদয়ের সাহায্যে বিচার করতে পারেন ব'লেই, তাঁকে আর বাছাইএর জন্যে মাথা ঘামাতে হয় না, সব কিছু, এমনকি সাবেকী গুরুগম্ভীর গদ্যও, আপনা আপনি রসস্বরূপ পদ্যে বদলে যায়।

এ পর্য্যন্ত তাঁর পদ্য শুধু অনুভূতির উচ্ছ্বাস বইতো; তাছাড়া বাকী সমস্তকে অসুন্দর জেনে তিনি সে-বোঝা চাপিয়েছিলেন গদ্যের কাঁধে। তাই ইস্টর বিদ্রোহের পূর্ব্বে তাঁর গদ্য-পদ্যের বিবাদ মেটে নি; একটা অপরের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁর সমগ্র রচনাবলীকে এক রকম ভারসাম্য জোগাতো বটে, কিন্তু রচয়িতার দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিস্বরূপে তাতেও কোনো মতে জোড়া লাগতো না। এইবার হঠাৎ তাঁর বীভৎসভীতি ভাঙলো; তিনি নিজেকে এতখানি বশে আনলেন যে পশুত্বের পুনরাবর্ত্তনেও তাঁর আপত্তি রইলো না। বরং তিনি বুঝলেন যে বৈপরীত্যসিদ্ধি একা ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়, সেইটাই সভ্যতারও ব্রত। কাজেই যদি খৃষ্টানী আপ্তবাক্যের ফল ফলেই, তবে আর নরদেবতার প্রত্যাগমন ঘটবে না, আমাদের আত্মপ্রদক্ষিণ থামবে প্রাকপৌরাণিক নরপশুর পুনরুত্থানে।

আমি জানি যে কাব্যবিবেচনা দর্শনালোচনার ক্ষেত্র নয়। বিশেষত য়েট্‌স্‌-এর মতো সংকবির বেলায় তথ্য ও তত্ত্বের, পুরাবৃত্ত ও পরাবিদ্যার এ-রকম জটিল সংমিশ্রণ একেবারে অমার্জ্জনীয়। তাহলেও তাঁর তুল্য মিতভাষী লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে খানিকটা দুর্ব্বোধ্যতা অনিবার্য্য; এবং দর্শনের পরিভাষার মতো সাহিত্যের সাঙ্কেতিকও যত গর্জ্জায়, তত বর্ষায় না। দৃষ্টান্ত হিসাবে "পিওর পোয়েট্রি"-নামক কলাকৈবল্যের উল্লেখ এখানে অবান্তর নয়; এবং অলস মনে পড়লে, তাঁর অনেক কবিতাতেই সেই অমানুষিক লক্ষণ দেখা যাবে। কিন্তু নিরপেক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কাব্যপ্রণয়নে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অন্তত ইংরেজী কাব্যে বিরল হলেও, তাঁর রচনায় সুইনবর্ন্‌-এর মঞ্জুল বাক্‌সর্ব্বস্বতা নেই, তাঁর গ্রন্থাবলী শেক্সপীয়রী নাট্যসমষ্টির ন্যায় পরম্পরাশ্রয়ী; এবং চরমোৎকর্ষের নিকষে উভয়ের অনেক লেখাই যদিও অবিশুদ্ধ, তবু সেগুলোর একটাকে বাদ দিয়ে বাকী কটার মূল্যনির্দ্ধারণ বা যথাযথ রসগ্রহণ অসম্ভব। আমার বিশ্বাস এই ধারাবাহিকতা, এই পৌর্ব্বাপর্য্যবোধ মহাকবিদের সামান্য লক্ষণ; এবং লি-পো-র মতো এই সার্ব্বভৌম মহত্ত্ব নিয়ে জন্মালে, চীনা কবিতার গতানুগতিক চার লাইনেও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ছায়াচ্ছবি ফুটে ওঠে।

য়েট্‌স্‌-এর বেলাও এ-নিয়মের ব্যত্যয় নেই; এবং তাঁর একাগ্রতাও যেহেতু অন্তর ও বাহিরের সাযুজ্যসম্ভূত, তাই তাঁর যে-কোনো পুস্তকের তাৎপর্য্য ধরতে চাইলে, তাঁর দেশ ও কালের, বৃত্তি ও বুদ্ধির, সাধ ও সাধ্যের

ইতিহাস অবশ্যস্মর্ত্তব্য। নচেৎ তাঁর ভাষা এত সাবলীল যে তার নিগড়ে ভাব কখনো স্বাচ্ছন্দ্য হারায় না; শব্দব্রহ্মের সহজ সৃজনীশক্তির উপরে তাঁর আস্থা এমনি অগাধ যে তিনি কোনো দিন বর্ণনার প্রয়াস পান না, সর্ব্বদাই নিজেকে ব্যঞ্জনার চেষ্টায় ব্যস্ত রাখেন, এবং সেইজন্যে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু কারো কারো কাছে রহস্যাবৃত ঠেকলেও, সে-কাব্যের আবেদন সার্ব্বজনীন। কারণ জাতিগত সংস্কৃতি-ব্যতিরেকেও বিদেশীরা কখন পরদেশী সাহিত্যের মানে বোঝে, তখন সাহিত্যের অর্থ নিশ্চয়ই সার্থকতার নামান্তর; এবং সেই ধরণের সাহিত্যরস অনেক সময়ে শুধু বিলাসিতার অনুপান জোগালেও, স্বভাবসৌন্দর্য্যের অনটনে যেমন পূর্ব্বপুরুষের পরিশীলন-সম্পদও উত্তর পুরুষের অবজ্ঞাভাজন, তেমনি য়েট্‌স্‌-এর কবিতাও সার্ব্বজনীন অনুকম্পায় অধিকারী কেবল স্বসমুখ রূপের জোরে।

তত্রাচ রূপ আর কলাকৌশলের প্রকৃতি বিভিন্ন; এবং শেষোক্তের অভাবে শিল্পসেবা যদিও বিড়ম্বনা, তবু রূপের আশীর্ব্বাদেই ললিত কলা কারুকার্য্যের অগ্রগণ্য। কারণ কলাকৌশলের শেষ উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহারে; উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে উৎপাদক ও খাদকের যে মানসিক কোনো সম্বন্ধ থাকতে পারে, এমন সন্দেহও তাকে টলায় না; অবাধ্য উপকরণকে বশে এনে, তার কাঠামোয় রচয়িতার স্বকীয়তা ফুটিয়ে তোলাব ভার রূপের উপরে চাপিয়ে সে যথাসম্ভব যান্ত্রিক উপায়ে নির্ম্মিত সামগ্রীর দোষনিরাকরণেই ব্যস্ত। সেইজন্যে কলাকৌশলের উন্নতিকল্পে অভ্যাস ও উৎকৃষ্ট উদাহরণই যথেষ্ট, কিন্তু রূপের পরিপুষ্টি সমগ্র জীবনের মুখাপেক্ষী; এবং চারিত্র্য আর ব্যক্তিস্বরূপের মধ্যে হর্বর্ট্‌ রীড্‌ যে-বৈলক্ষণ্য দেখেছেন, আমার মতে রূপ ও কলাকৌশলের মধ্যেও সেই ব্যবধান বর্ত্তমান।

আসলে কলাকৌশল চারিত্র্যের অভিব্যক্তি আর রূপ ব্যক্তিস্বরূপের; এবং চরিত্রগুণ একবার আয়ত্তে এলে, তাকে হারানো যখন শক্ত, তখন কলা-কৌশল শিল্পসৃষ্টিকে সংহতি ও স্থৈর্য্য জোগায়; প্রাণসঞ্চার রূপের কাজ। উপরন্তু চারিত্র্য অনুকরণের ফল; আত্মীয়-বন্ধুর উপদেশ, প্রতিবেশের শাসন ও কুলসংক্রমণ, এই তিনের ঘাত-প্রতিঘাতেই মানুষ চরিত্রবান। কিন্তু ব্যক্তিস্বরূপ জন্মায় আত্মজিজ্ঞাসার উদ্যোগে। অতএব তার সঙ্গে অভিজ্ঞতার সম্পর্ক নিকট; এবং অভিজ্ঞতা আত্মজিজ্ঞাসার সহচর, ব্যক্তিগত উপলব্ধির সঙ্গে চির প্রথার বিরোধ না বাধলে, প্রতর্কের সুযোগ মেলে না। তাহলেও ব্যক্তিস্বরূপ অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি নয়; বরং তাকে অভিজ্ঞতার নিকষ বলাই বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিস্বরূপও একটা প্রতীক, ব্যক্তির প্রবর্দ্ধমান সত্তাই তার পটভূমি, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে

ছাড়িয়ে একটা অবিচ্ছিন্ন বিশ্বব্যাপী দর্শনে উপনীত হওয়াই তার উদ্দেশ্য।

কাজে কাজেই চারিত্র্যের মতো কৃপণ বা দ্বৈপায়ন-উপাধি তাকে সাজে না; দৈবাগত সম্পত্তি খোয়ালেও, তার যেহেতু প্রাণসংশয় ঘটে না, তাই পান্থশালাকে দুর্গে পরিণত করার প্রলোভন তার নেই; সে আনন্দ পায় চলে; স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়ানোই তার বৈশিষ্ট্য। এ-কথা য়েট্‌স্-ও জানেন; এবং সাধনার চেয়ে সিদ্ধিতেই তাঁর আগ্রহ বেশি; কেবল অনবদ্য কলাকৌশলে তাঁর সাধ মেটে না, তিনি প্রতিনিয়ত খোঁজেন রূপের পরিপক্বতা। কিন্তু রূপ আর জীবন হরিহরাত্মা। ফলত য়েট্‌স্-এর সাহিত্যসেবা শুধু গ্রন্থাগারে আবদ্ধ নয়; সমাজে ও সংসারে, রাষ্ট্রনীতিতে ও হিতৈষণায়, প্রচারকার্য্যে ও সংগঠনে নিজের প্রতিভা ও প্রজ্ঞার নিষ্কুণ্ঠ বিতরণে তিনি তাঁর ব্যক্তিতার সীমা বারম্বার পেরিয়ে যান; এবং তাঁর ক্ষুদ্রতম কবিতার অমৃতলোকে আধুনিক মন ও বর্ত্তমান যুগ চিরন্তন রেখায় ফুটে ওঠে।

ক্রোচে-জেন্তিলে-র বিবেচনায় ইতিহাস আর আষাঢ়ে গল্প একই বিকল্পনার এ-পিঠ আর ও-পিঠ; এবং ব্যক্তিবাদীমাত্রেই অবগত আছেন যে বিষয় বিষয়ীরই আত্মবিস্মৃতি। অতএব উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হয়তো একদেশদর্শী, তাতে নিশ্চয়ই আমার নিজস্ব রুচি-অরুচি, ভয়-ভাবনা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব য়েট্‌স্-এর স্বকীয় সমস্যাগুলোর বিকার ঘটিয়েছে; এবং যাঁরা বয়সে আমার চেয়ে বড় বা ছোট, যাঁদের জন্ম বাংলা দেশের বাইরে অথবা ভারতবর্ষের সীমান্তরে, যাঁদের ব্যক্তিগত ক্ষয়-বৃদ্ধি কোনো জাতীয় আন্দোলনের প্রসার-সঙ্কোচের কিম্বা উত্থান-পতনের সঙ্গে দুশ্ছেদ্য সূত্রে জড়িয়ে যায় নি, তাঁদের পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত ঘটনাঘটন স্বভাবতই একেবারে অন্য রকম দেখাবে। কারণ তত্ত্ব আর তথ্যের আত্মীয়তা শুধু আক্ষরিক বা শ্রুতিগোচর নয়, অর্থগতও বটে; এবং শব্দ-দুটির অভিধা-বিশ্লেষণে ধরা পড়বে যে প্রকৃতিকৃপণ প্রামাণিকদের অনুমানই উদারচেতা জনসাধারণের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ।

বলাই বাহুল্য সে-প্রামাণ্য আমার লেখনীকে মানায় না; এবং য়েট্‌স্-এর যে-অবৈকল্যে আমি নিরন্তর মুগ্ধ, তা যেকালে অধিকাংশ মানুষেরই আয়ত্তে, তখন সুস্থ ও সবল কাব্যামোদীর পক্ষে তাঁর জীবনবৃত্তান্তের আলোচনা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন; এ-ধরণের নীরস তত্ত্বজিজ্ঞাসায় কান না পেতে সোজাসুজি তাঁর রূপসাগরে ডুবতে পারলেই, তাঁরা বেশি লাভবান হবেন। কিন্তু আমার সে-স্বাধীনতা নেই; এবং তাঁকে আমি মহাকবি হিসাবে

চিনেছি ব'লেই, তাঁর অনিন্দ্য কাব্যকলার অবান্তর গুণকীর্ত্তন আমার কাছে হাস্যকর ঠেকে, আমি তাঁর লেখার ভিতরে এমন একটা জীবন-নির্ব্বাহনীতির দৃষ্টান্ত খুঁজি যা আমাদের ঐতিহ্যভ্রষ্ট যুগকে শক্তি ও শৌর্য্যের, শান্তি ও ধৈর্য্যের অপচিত উত্তরাধিকার ফিরিয়ে দেবে। তবে এ-অন্বেষণও পক্ষপাতদুষ্ট, এর উপকারিতা তর্কসাপেক্ষ; এবং প্লেটো, প্লোটাইনাস্ ও শঙ্করাচার্য্য, ভিকো, সোরেল্ ও মার্ক্‌স্, ব্লেক্, শেলি ও কেল্‌টিক্ সাহিত্যের সমন্বয়ে য়েট্‌স্ যে-সর্ব্বতোভদ্র বিশ্ববীক্ষা গ'ড়ে তুলেছেন, একটা নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধেও তার মানচিত্র আঁকার চেষ্টা যেমন দুঃসাহসিক, তেমনি অনিষ্টকর।

জেরার্ড্ ম্যান্লি হপ্কিন্স্

স্বতন্ত্র প্রতিভার আবশ্যিক নিগ্রহই যদিচ হতভাগ্য কবিযশঃপ্রার্থীদের একমাত্র আশ্বাস, তবু সাহিত্যের ইতিহাসে স্বকীয়তার প্রাধান্য অবিসংবাদিত; এবং শেক্স্পীয়র-উপেক্ষার যে-উপকথা এক দিন উদীয়মান লেখকদের ভাবপ্রবণ বক্তৃতার বিষয় জোগাতো, অধুনাতনী গবেষণা তার ছায়াটুকুও অবশিষ্ট রাখে নি; সেই উনিশ শতকী উৎকেন্দ্রিক বিকল্পনা ঝেড়ে ফেলে আধুনিক পণ্ডিতেরা বরং বলতে স্বরু করেছেন যে অত অল্প সময়ের মধ্যে ও-রকম সর্ব্বতোমুখী সাফল্য শেক্স্পীয়র ছাড়া আর কারো কপালে জুটেছিলো কিনা সন্দেহ। অবশ্য চ্যাটর্টন্ ও কীট্স্-এর প্রতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমালোচকদের অবিচারেই এখনো অপদার্থ সাহিত্যিকের আত্মপ্রসাদ প্রশ্রয় পায়। কিন্তু কাঁচা বয়সে চলনসই কবিতা লিখেছিলেন ব'লে, আজ আর আমরা চ্যাটর্টন্-সম্বন্ধে কৌতূহলী নই, ওয়ল্পোল্-এর মতো পাকা মানুষকে ঠকাতে পেরেই তিনি আমাদের ঔৎসুক্য জাগান: এবং কীট্স্-সম্পর্কে সাবেকী মনোভাব কেবল তাঁর কাব্যের গুণেই বদ্লায় নি, একে একে তাঁর বিক্ষিপ্ত পত্রাবলী কুড়িয়ে ম্যাথ্যু অর্ন্ল্ড্-এর পরবর্ত্তীরা ক্রমশ বুঝছে যে এ-মহাকবি চারিত্র্যেও সেই খাম্খেয়ালী আবেষ্টনের বহির্ভূক্ত।

উপরন্তু চ্যাটর্টন্ বা কীট্স্-এর জন্ম শ্রমবিভাগের আগে; তখনো সংবাদসরবরাহের উপর একটা বিশেষ পেশার ছাপ পড়ে নি। অর্থাৎ সে-যুগের সকল মানুষই অবসরবিনোদনের খাতিরে গুজব রটাতো বটে, কিন্তু ক্যামেরা বাগিয়ে, পেন্সিল শাণিয়ে বাণীর সন্ধানে কেউ দেশে দেশান্তরে ছুটে বেড়াতো না। ফলত সে-কালের মূক মিল্টন্-রা অখ্যাতির অন্তরালেই মরতো; সুন্দরীরা রূপের ঋণ অপরিশোধনীয় জেনে সাবানওয়ালাদের দপ্তরে হাতচিঠি পাঠাতো না; প্রাত্যহিক ছবিতে ও সাক্ষাৎকারে অনাবশ্যক নির্ব্বুদ্ধিতা না ফুটলেও, রাষ্ট্রনেতাদের অমিত প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকতো। কিন্তু অর্ব্বাচীন পরিমণ্ডলে সেই অনিকাম ঔদাস্যও অসম্ভব; ধ্বনিতরঙ্গের সনাতনী গয়ংগচ্ছে ধৈর্য্য হারিয়ে আমাদের পরচর্চ্চা ইদানীং বেতারের শরণ নিয়েছে; এবং যে-দূত সেকেণ্ডে সাত বার পৃথিবী ঘুরে আসে, সে যেকালে স্বভাবতই দিগ্বিদিক্জ্ঞানশূন্য, তখন কেবল মল্লবীরের মুখে প্রাচীন সাহিত্যের গুণকীর্ত্তন শুনেই সাম্প্রতিকদের নিস্তার নেই, সাল্সার বিজ্ঞাপনে সাহিত্য-রথীদের হস্তলিপি দেখতেও তারা বাধ্য।

উল্লিখিত অবস্থায় প্রতিভাবানের অজ্ঞাতবাস তো অভাবনীয় বটেই,

এমনকি মাধ্যমিক মানুষের পক্ষেও উচ্চকিত বাইরন্-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সহজ ; এবং কবি হিসাবে জেরার্ড্ ম্যান্লি হপ্কিন্স্ সর্ব্বোচ্চ স্তরে স্থান পান বা না পান, তাঁর অদ্বিতীয় চমৎকারিতা যেহেতু তর্কাতীত, তাই যারা তাঁকে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত লোকচক্ষুর অগোচরে লুকিয়ে রেখেছিলো, তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। কে বলতে পারে, হপ্কিন্স্-এর রচনাবলী সময়মতো লেখক ও পাঠকদের হাতে পড়লে, এলিয়ট্ কাব্য ভুলে প্রত্নতত্ত্বের প্রলোভনে প্রাক্সামরিক মরুভূমি খুঁড়তেন কিনা? তবে প্রতিভা অনেকের মতে কালোপযোগিতার নামান্তর ; এবং হপ্কিন্স্ যখন টেনিসন্-এর আমলে জন্মে শেক্স্পীয়র-এর পদাঙ্কে চলেছিলেন, তখন তাঁর মনীষা প্রশংসনীয়, কি উচ্ছৃঙ্খলতা দণ্ডযোগ্য, তা হয়তো অনিশ্চিত। কিন্তু এ-কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা যে সে-দিনকার সাহিত্যে দুর্ব্বোধ্যতা একা হপ্কিন্স্-এরই একচেটিয়া সম্পত্তি ছিলো।

কারণ মালার্মে তাঁর সমসাময়িক ; এবং সেই ফরাসী কবি যদি ছন্দের অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন, ভাষার ধাতুগত প্রয়োগ, জটিলতার অপর্য্যাপ্ত অপব্যবহার সত্ত্বেও রাসীন্-পন্থীদের সাধুবাদ কুড়িয়ে থাকেন, তবে ঐতিহ্য-ভ্রষ্ট ইংলণ্ডে, ব্রাউনিং ও মেরিডিথ্-এর প্রতিবেশে, ডান্-এর বংশধর হপ্কিন্স্-এর ভাগ্যে অতখানি লাঞ্ছনা অহৈতুক। অবশ্য ব্রাউনিং বা ফ্রান্সিস্ টম্প্সন্ শুধু উৎকট বিষয়কে উদ্ভট ছন্দে বেঁধে দুষ্পাঠ্য কবিতা লেখাতেই হাত পাকান নি, বাগ্বিস্তারেও তাঁদের প্রতিযোগী মেলা ভার ; এবং হপ্কিন্স্ উচ্ছ্বাস অপছন্দ করতেন, সংযম ও চিত্তশুদ্ধিকে কাব্যের অপরিহার্য্য লক্ষণ ব'লে ভাবতেন, কায়মনোবাক্যে মানতেন যে কবির কাছে অবিকল অকপটতা লোকরঞ্জনের অগ্রগণ্য। কিন্তু এই স্বাবলম্বন ও সংক্ষিপ্ত রচনারীতির জন্যেই তিনি বিস্মৃতির বিবরে তলিয়ে যান নি, তাঁর বন্ধুস্থানে গ্রহঋষ্টি ঘটাতেই, অনুকম্পায়ীরাও আজ অবধি তাঁর পূর্ণ পরিচয়ে বঞ্চিত।

অথচ কবিরাজ ব্রিজেস্ হপ্কিন্স-এর হাতে-গড়া মানুষ। হপকিন্স্-এর উপদেশেই তাঁর বাচালতা কাব্যের পর্য্যায়ে উঠেছিলো। হপ্কিন্স্-এর বরাভয় ও বন্ধুবাৎসল্যই তাঁকে সংশয় ও নৈরাশ্য থেকে বাঁচিয়েছিলো। হপ্কিন্স্-এর দৃষ্টান্তেই তিনি শিখেছিলেন বিনয় ও ক্ষমা, নিরাসক্তি ও আত্মবেদ, বিচার ও বদান্যতা ইত্যাদি বহুপ্রচলিত শব্দের আসল অভিধা কী। কিন্তু সংসর্গগুণে স্বভাব বদলালেও, কবিপ্রতিভার অনটন মেটাতে পারেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ; এবং ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে অপ্রতিম হলেও, হপ্কিন্স্ যেহেতু অসাধ্যসাধনের মন্ত্র জানতেন না, তাই বিশ বৎসরের অধ্যাপনায়

তিনি ব্রিজেস্‌-এর কলাকৌশলই শুধরেছিলেন, অন্তঃপ্রেরণার দৈন্য ঘোচান নি। তবে অনবদ্য কলাকৌশলও খুব সুলভ নয়; এবং দ্বৈপায়ন আত্মরতির প্রকোপে ফ্লোবেয়র-এর নাম সুদ্ধ তদানীন্তন ইংলণ্ডে অপ্রচারিত থাকাতে, ব্রিজেস্‌-এর কোনো সমবয়সীই শিল্পের সঙ্গে সঙ্কল্পের সহোদর-সম্পর্ক ধরতে পারেন নি, সকলেই ভেবেছিলেন উদ্বেল হৃদয়াবেগই সৌন্দর্য্যের একমাত্র উপকরণ। সুতরাং ব্রিজেস্‌-এর নিখুঁৎ কারুকর্ম্মও সুবিবেচকের বরণীয় লেগেছিলো; এবং এ-কথা সম্ভবত সত্য যে রসবস্তুর অতখানি অভাবে ও-রকম লোভনীয় রূপের আরোপ সংস্কৃত সাহিত্যের বাইরে আজ পর্য্যন্ত ঘটে নি।

কিন্তু নির্ব্বাণ আর মোক্ষের মধ্যে বাছতে দিলে, সাধারণ মানুষের মন কোন্ দিকে ঝুঁকবে, তা সহজেই অনুমেয়; এবং সেইজন্যেই ব্রিজেস্ অবিলম্বে বুঝেছিলেন যে লোকে একবার হপ্‌কিন্স্‌-কে চিন্‌লে, তাঁর নিজের প্রতিপত্তি আর মুহূর্ত্তকাল টিঁকবে না। কাজে কাজেই হপ্‌কিন্স্‌-এর অকাল মৃত্যুর পরে সেই কবির প্রায় সমস্ত লেখাই হাতে পেয়েও তিনি সেগুলির প্রকাশে বিন্দু-বিসর্গ উৎসাহ দেখান নি। সৌভাগ্যক্রমে হপ্‌কিন্স্ ব্রিজেস্ ছাড়া আরো পাঁচ-জনকে চিঠি পত্র পাঠাতেন, এবং সেইসঙ্গে তাঁর দু-চারটে কবিতার প্রতিলিপিও কয়েক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিলো। ফলত তাঁর মৃত্যুর চার বছর পরে যখন মাইল্‌স্‌-এর সম্পাদনায় উনবিংশ শতাব্দীর বিরাট কাব্যসঞ্চয় বেরোয়, সে-সময় তার থেকে হপ্‌কিন্স্‌-কে একেবারে ছেঁটে ফেলা ব্রিজেস্‌-এর সাধ্যেও কুলয় নি। তাহলেও সরল রসপিপাসুরা যাতে হপ্‌কিন্স্‌-এর কুহকে না মজে, সে-চেষ্টা ব্রিজেস্ একাধিক বার করেছিলেন; এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি বিগত বন্ধুর বিবিধ কাব্যসংগ্রহের প্রস্তাবনায় যে-সমস্ত মারাত্মক কথা লিখেছিলেন, তা প'ড়েও আমাদের ঔৎসুক্য যেকালে বেড়েছে বই কমে নি, তখন হপ্‌কিন্স্‌-এর উৎকর্ষ নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহ।

অবশ্য আমি আবাল্য ব্রিজেস্‌-বিদ্বেষী এবং সহজাত বৈরিতার প্রাদুর্ভাবে যাঁরা আপাতত আমার মতো একদেশদর্শী নন, যেমন চার্লস্ উইলিয়মস্ অথবা কলিয়র অ্যাবট্—তাঁরা এজন্যে ব্রিজেস্‌-এর দোষ ধরেন নি, উল্‌টে তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি ও অব্যর্থ কালজ্ঞানের গুণ গেয়েছেন। তাঁদের বিবেচনায় মৃত বন্ধুর ছিদ্রান্বেষণে জীবন কাটিয়ে, এবং তাঁর ছন্দ-সংক্রান্ত আবিষ্কারসমূহকে সকলের অজ্ঞাতসারে নিজের নিরাপদ কবিতাবলীর মধ্যে আশ্রয় দিয়ে ব্রিজেস্ নাকি স্বার্থসংরক্ষণের প্রয়াস পান নি, হপ্‌কিন্স্‌-এর জন্যেই আসর জমাচ্ছিলেন। নচেৎ 'দি স্পিরিট্ অফ্ ম্যান্'-এর পারিজাত-

কাননে হপ্‌কিন্স্‌-এর মতো জেসুইট্‌ পিশাচের নির্ব্বিবাদ প্রবেশ তিনি অম্লান বদনে সইতেন না। নতুবা হপ্‌কিন্স্‌-কাব্যের ভূমিকায় স্বরচিত সনেট্‌ জুড়ে পরবর্ত্তী কবিতাগুলিকে "প্রীতির উত্তরাধিকার" বলার সার্থকতা থাকতো না। নয়তো চল্লিশ বছর আগেকার ছেঁড়া কাগজ ঘেঁটে হপ্‌কিন্স্‌-এর একতরফা চিঠি-পত্রপ্রকাশের ভার পড়তো না অধ্যাপক অ্যাবট্‌-এর উপরে।

তত্রাচ কোনো অচেনা কবির রচনাসম্পাদনের সময়ে সহজ কবিতা-কটা স্বেচ্ছায় ছেঁটে ফেলে, তার প্রথম পরিচয়ে এ-কথা লেখা নিশ্চয়ই অন্যায় যে তাকে বুঝতে চাওয়া পণ্ডশ্রম, তার অবদান এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ; এবং এই মন্তব্য যদি শুধু পরিপক্ব জীবন্মুক্তির চিহ্ন হয়, তবুও চার্লস্‌ উইলিয়ম্‌স্‌-এর ন্যায় একজন নাতিপ্রৌঢ় সম্পাদকের পক্ষে এ-রকম ইঙ্গিত নিছক সত্যভাষণের খাতিরেও মার্জ্জনীয় নয় যে 'এপিথেলেমিয়ন্‌'-নামক কবিতাখণ্ডের স্নাতক কাপড় ছাড়ার আগে জুতো খুলে প্রমাণ করেছে যে তার মানসপিতার দৃষ্টি সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু অভ্রান্ত নয়, আর সেইজন্যেই হপ্‌কিন্স্‌ মহৎ পথে চললেও, কখনো মহত্ত্বে পৌছন নি। উপরন্তু ব্রিজেস্‌-এর উভয় অনুগামীই এ-প্রসঙ্গে একমত যে তাঁর পৃষ্ঠপোষণ ব্যতীত হপ্‌কিন্স্‌-এর কোনো কীর্ত্তিস্তম্ভই দাঁড়াতে পারে না, সুতরাং ব্রিজেস্‌-এর পদলেহন প্রত্যেক হপ্‌কিন্স্‌-ভক্তের আদ্যকৃত্য।

হয়তো সেই কারণেই অ্যাবট্‌ সাহেব হপ্‌কিন্স্‌-এর চিঠির সঙ্গে ব্রিজেস্‌-এর দু-দুখানি ছবি ছেপেছেন; এবং তাঁর পাদটীকায় যেমন পত্রোক্ত ব্যক্তিদের য়ুনিভার্সিটি ডিগ্রীর ফর্দ্দ ছাড়া আর বিশেষ কোনো খবর নেই, তেমনি তাঁর পরিশিষ্টে ব্রিজেস্‌-প্রশস্তি দুস্তর ও ক্লেশকর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আসল চিঠিগুলির প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য এই মনোভাবের বিরুদ্ধে; এবং সেগুলি যাঁকে উৎসর্গিত, তিনি যে দাম্ভিকশিরোমণি, তার উত্তর সাক্ষ্য ব্রিজেস্‌-এর তৎকালীন কবিতার বর্ত্তমান রূপে। শুনলে অবাক লাগে, তবু না মেনে উপায় নেই যে হপ্‌কিন্স্‌-এর জীবদ্দশায় তাঁর প্রস্তাবিত যত সংশোধন ব্রিজেস্‌-এর অহংজ্ঞানে বেজেছিলো, তাঁর দেহান্তের পরে সেগুলোর অঙ্গীকারে ব্রিজেস্‌-এর মিতভাষী বিবেক কোনো আপত্তি তোলে নি। অতএব আমার কাছে হর্বর্ট্‌ রীড্‌-এর অনুমানই সমীচীন ঠেকে; অর্থাৎ আমিও ভাবতে প্রস্তুত যে নিজের ক্ষুদ্রতা ঢাকতেই ব্রিজেস্‌ তাঁর দিকের পত্রাদি পুড়িয়েছিলেন; এবং বাহ্যত তাঁর আত্মপ্রসাদের খোরাক না জোগালে, হপ্‌কিন্স্‌-এর চিঠিগুলোকে তিনি জমিয়ে রাখতেন কিনা বিবেচ্য।

বলাই বাহুল্য, এতখানি অন্যায় তিনি জ্ঞানত করেন নি; এবং মনো-বিকলনের যুগে অবচেতন পরশ্রীকাতরতার অপরাধে কোনো মানুষের শাস্তিবিধান হঠকারিতার পরাকাষ্ঠা। তৎসত্ত্বেও আমি এই পরীবাদ এড়িয়ে যেতে পারলুম না; কারণ আমার ধ্রুববিশ্বাস যে স্বকীয়তার আসল মূল্য যাই হোক না কেন, সেজন্যে অন্তত সাম্প্রতিক কবিদের কেউ কখনো উপেক্ষার বোঝা বন নি; এবং হপ্‌কিন্স্-এর ছন্দস্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যাকরণবিভ্রাট রসেটি, হল্ কেন্, গস্ প্রভৃতি ভদ্রলোকেদের, মন পায় নি বটে, তবু তাঁর পরীক্ষাদি সমস্তই যেহেতু সদুদ্দেশ্যে—অর্থাৎ স্যুইন্‌বর্নী অতিস্ফীতি থেকে প্রকৃত কব্যের উদ্ধারকল্পে, তাই সাধারণ পাঠকের পক্ষপাত স্বভাবতই তাঁর দিকে। কিন্তু হপ্‌কিন্স্-এর কাছে শুধু সে-কালের কাব্যই কৃত্রিম ঠেকে নি, তিনি বুঝেছিলেন যে সাময়িক সমাজও কপটতার উপরে প্রতিষ্ঠিত; এবং কবিরা যেমন লৌকিক ভাষার বহিরাবরণ বজায় রেখেও তার অভ্যন্তরীণ যাথার্থ্যে ঘুণ ধরিয়েছেন, তেমনি সমাজপতিরাও সমাজরক্ষার অছিলায় সাধারণ্যের সর্ব্বনাশ সাধছেন। ফলত তিনি প্রায় কৈশোরান্তেই কাব্যকৈবল্যের মোহ কাটিয়ে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ ঐক্যসাধনের প্রয়াস পান, এবং বিস্তর আত্মজিজ্ঞাসার পরে স্বধর্ম্মে নিধন অধর্ম্মের চূড়ান্ত বিবেচনায় অগত্যা ভয়াবহ পরধর্ম্মেরই শরণ নেন।

কেননা হপ্‌কিন্স্ কথা আর কাজের বৈষম্য সইতে পারতেন না; এবং উভয়সঙ্কটে পড়লে, তাঁকে যদিও প্রজ্ঞাই চালাতো, তবু তাঁর আবাল্য অভ্যাস ছিলো সর্ব্বান্তঃকরণে অভিপ্রেত কর্ত্তব্যপালন। কাজে কাজেই তাঁর বুদ্ধি ও বিশ্বাস আদর্শ আর আচারের চিরন্তন ব্যবধানে সায় দিলে না; ক্যাথলিক্‌দের মধ্যেও একা জেসুইট্‌রাই কায়মনোবাক্যে নির্দ্বন্দ্ব ব'লে, তিনি স্বেচ্ছায় সেই সুশাসিত সংঘের অধীনে এলেন। কিন্তু যুক্তরাজ্যে শুধু আধ্যাত্মিক একাগ্রতাই বিধিবিরুদ্ধ নয়, সেখানকার কর্ম্মজীবনে ঐকান্তিক ন্যায়নিষ্ঠারও প্রবেশ নিষিদ্ধ; এবং অনীহা ইংরেজদের এমনি মজ্জাগত যে ন্যুম্যান্-এর বিশ্বাসঘাতকতা সাময়িক সমাজে পরচর্চ্চার বন্যা বওয়ালেও, ভিক্টোরিয়া-র পরিতৃপ্ত প্রজারা ভাবতে পারে নি যে তাঁর দৃষ্টান্ত আবার কাউকে মাতিয়ে তুলবে। উপরন্তু নরকযাত্রীদেরও মাত্রাজ্ঞান হারোনো অনুচিত; এবং বিবেকের কুমন্ত্রণায় ধর্ম্ম বদ্‌লালেই, লোকায়ত আর লোকাত্তরের মাল্য-বিনিময় অবশ্যম্ভাবী নয়। সেইজন্যেই হপ্‌কিন্স্-এর এক চিঠিতে সাম্যবাদের অঙ্কুরোদ্গম দেখে রক্ষণশীল ব্রিজেস্ তিন বছর নিরুত্তর থেকেছিলেন। সেইজন্যেই তাঁর বিজ্ঞানসচেতন মনে ধারণা জন্মেছিলো যে হপ্‌কিন্স্-এর ক্যাথলিক্ কুসংস্কারগুলো আন্তরিক নয়, মৌখিক। সেইজন্যেই 'ডয়েট্‌স্‌লাণ্ড্'

তাঁর অনুকম্পা জাগায় নি, তিনি ঠাউরেছিলেন যে নৈর্ব্যক্তিক কবির পক্ষে অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞার অভিব্যক্তি নিতান্ত নিন্দনীয়।

তবে ইংরেজমাত্রেই জন্মান্ধ নয়। অন্তত যারা বিগত মহাযুদ্ধের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে নিজেদের নাম দেখতে অনিচ্ছুক, তারা অনেক ঠেকে আজ শিখেছে যে শ্রমবিভাগে বিধ্বস্ত ও অধিকারভেদে বিকল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যদি ব্রিজেস্-এর মতো আত্মম্ভরি অভিভাবকদের হাত থেকে বাঁচে, তাহলেই রোমন্ চার্চ্চের অন্তর্ভৌম ষড়যন্ত্র তাকে রসাতলে পাঠাবে। তাই উত্তরসামরিক ইংরেজ আর জেস্যুইট্‌দের কুটিল সম্প্রদায়কেও ভয় পায় না, বোঝে যে তাদের ঐকান্তিক বিশ্ববীক্ষার আশীর্ব্বাদেই হপ্‌কিন্স্ সঙ্কীর্ণ দেশ-কালের গণ্ডিমুক্ত। অবশ্য এই বিশ্ববীক্ষাই যে অভ্রান্ত এমন বিশ্বাসপোষণে সে অপারগ। কিন্তু এ-সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ যে নেই মামার চেয়ে কাণা মামাও ভালো, এবং কোনো ধর্ম্মে আস্থা রাখলে, সে-ধর্ম্মের সার্ব্বত্রিক নিয়োগেই সাধুতা সার্থক। সেইজন্যেই সে আর হপ্‌কিন্স্-কে শুধু রবর্ট্ ব্রিজের-এর বন্ধু হিসাবেই শ্রদ্ধা করে না, অথবা ক্যাথলিক্ চক্রান্তের নিমিত্তমাত্র ব'লে করুণাযোগ্য ভাবে না, সে জানে তিনি নিজ গুণেই আমাদের নমস্য এবং প্রায় সকল সমসাময়িক সাহিত্যিকের অগ্রগণ্য। কারণ তিনি আকস্মিক আবেগের বশে গোটা-কয়েক মর্ম্মস্পর্শী কবিতা লিখেই খুশী হন নি, মিল্‌টন্-আদি প্রাতঃস্মরণীয়দের মতো সমগ্র সত্তা ও আমরণ সাধনার দ্বারা সারা জগৎকে কাব্যশৃঙ্খলায় বেঁধেছিলেন কিম্বা বাঁধতে চেয়েছিলেন।

সে-বিশ্ববিলোকন যে নেহাৎ সহজ নয়, তা বলা নিষ্প্রয়োজন; এবং বিধাতা হপ্‌কিন্স্-কে অক্ষয় পরমায়ু দিলেও, তাঁর অমেয় সংযোজনার অধিকাংশই কূপমণ্ডূকের কাছে আতিশয্যময় ঠেকতো। সুতরাং হপ্‌কিন্স্-এর আধুনিক ভক্তেরা তাঁর দুরূহ রচনারীতির দায় আর অকাল মৃত্যুর উপরে চাপায় না, হপ্‌কিন্স্-কাব্য হাতে নিয়ে পল্লবগ্রাহিতার লোভ ছাড়ে; এবং আশ্চর্য্য এই যে মানসিক আলস্য কাটার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজেস্-বিজ্ঞাপিত ব্যাস-কূটগুলোও তাদের সুবোধ্য লাগে, তারা মানে যে পরিবৃদ্ধির খাতিরে যে-কবি নিজের একাধিক লেখা নির্ম্মম হৃদয়ে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, আমাদের নিরবকাশ অবধানে তাঁর দাবি অবশ্যস্বীকার্য্য। এর পরে এ-কথা বলতে তাদের জিভে বাধে যে হপ্‌কিন্স্-এর অনুর্ব্বরতা জেস্যুইট্ শোষণের অমোঘ পরিণাম; বরং তারা বিস্মিত চোখে সে-অনুষ্ঠানের দিকে তাকায়, যার আনুকূল্যে হপ্‌কিন্স্ বাক্যবাগীশ উনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যন্তে জন্মেও সংযমে সতেরো ও আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ কবিদের সমকক্ষ।

সম্ভবত সেইজন্যেই হপ্‌কিন্স্-এর সর্ব্বশেষ সম্পাদক হম্‌ফ্রি হাউস্ তাঁর

সঙ্কলনগ্রন্থখানি* জেসুইট্ সংসদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। উপরন্তু হপ্‌কিন্স-এর জীবনবৃত্তান্ত ও রচনাসমষ্টির গবেষণায় নেমে তিনি দেখেছেন যে হপ্‌কিন্স্-প্রতিভার বাদ সাধা দূরের কথা, সাম্প্রদায়িক সহকর্ম্মীদের তত্ত্বাবধানে না এলে, তাঁর ধর্ম্মবিষয়ক সন্দর্ভসমূহ, অলঙ্কারসংক্রান্ত বক্তৃতাদি, এমনকি অনেকগুলি কবিতাও, স্বাধীনচেতা বন্ধু-বান্ধবদের অযত্নে হয়তো একেবারে হারিয়েই যেতো; এবং এ-সব লেখা হপ্‌কিন্স্-এর পূর্ণ পরিচয়ের পক্ষে যেমন অপরিহার্য্য, সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবেও তেমনি অত্যুৎকৃষ্ট। উদাহরণত তাঁর সর্মন্ উল্লেখযোগ্য; এবং সেগুলির বিষয়বস্তু যদিচ এতই মধ্যযুগীয় ও খৃষ্টানভাবাপন্ন যে তাতে আমার মতো বাঙালীর প্রবেশ স্বতোব্যাহত, তবু তাঁর প্রভাস্বর গদ্যের ওজ আর প্রসাদ, ন্যায় আর ঋজুতা, সম্বেগ আর বাহুল্যবর্জ্জন অন্তত কিছু কাল কোল্‌রিজ্-বর্ণিত উপায়ে নাস্তিকেব প্রতর্ককেও ঠেকিয়ে রাখবে।

আসলে এগুলির সঙ্গে তাঁর কাব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ; এবং তিনি শুধু সেই কবিজাতির অন্তর্গত নন, যাদের সকল সৃষ্টিই একটা বৃহত্তর সামঞ্জস্যের অংশভাক, অধিকন্তু নিদ্রায় জাগরণে, সুখে দুঃখে, চিন্তায় কর্ম্মে, ঐশী মহিমার সঙ্কীর্ত্তনই ছিলো তাঁর অবিচল লক্ষ্য। এই অন্তরতম দৈবানুগত্যই তিনি তাঁর গদ্যে ও পদ্যে একই প্রকারে ফুটিয়েছেন; উপমার জীবন্ত জৌলসে, প্রতীকের অনির্ব্বচনীয় গৌরবে, প্রচ্ছন্ন পাণ্ডিত্যে, অপ্রযুক্ত শব্দের হৃদয়-সংবেদ্য বিলাসে, অভাবনীয় ছন্দকৌশলের চমৎকার অভিঘাতে এই অলৌকিক উপলব্ধির বিচিত্র ব্যঞ্জনাই তাঁর সাহিত্যজীবনের মূল সূত্র। এ-সত্য হাউস্ সাহেবের সুবিদিত; এবং হপ্‌কিন্স্-এর সাহিত্যসাধনায় ফাদার লেহি-র মতো তিনি কেবল জেসুইট্ কীর্ত্তিকলাপের নির্ঘণ্ট খোঁজেন নি বটে, তবু আক্রোশের বশে অধ্যাপক অ্যাবট্-এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে এমন মিথ্যাও তিনি রটান নি যে হপ্‌কিন্স্-এর শোকাবহ ট্র্যাজেডি হচ্ছে পরিপুষ্ট পুরোহিতের নিষ্পেষণে অপরিণত কবির অপঘাত।

পক্ষান্তরে হাউস্ জানেন যে হপ্‌কিন্স্-এর সৃজনীশক্তি অনেক সময়েই তুচ্ছ কাজের ভিড়ে চাপা পড়তো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও তাঁর অজ্ঞাত নয় যে এই আত্মত্যাগের পথে হপ্‌কিন্স্ নির্ব্বিচারে পৌঁছন নি, এবং কাব্যামোদী বন্ধুদের সনির্ব্বন্ধ প্রতিবাদের উত্তরে তিনি নিজেই বার বার লিখেছিলেন যে কবিতা তাঁর শোচনীয় ব্যসনমাত্র, তাঁর ব্রত প্রত্যাদিষ্ট কর্ত্তব্যপালনে নিরবশেষ আত্মসমর্পণ। এর পরে হপ্‌কিন্স্-প্রসঙ্গে আর

* The Note-Book and Papers of Gerard Manley Hopkins—Edited with Notes and a Preface by Humphry House (Oxford).

এ-রকম ব্যর্থ প্রশ্ন-উত্থাপনের কোনো মানে নেই যে তাঁর মতিগতি বদ্‌লালে, তিনিও বন্ধু ব্রিজেস্‌-এর মতো কাব্যলক্ষ্মীকে বিশ্ববিধাতার শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে বৃদ্ধ বয়সে আধিজৈবিক মর্য্যাদাবোধের বন্দনা গাইতেন কিনা; এবং হাউস্‌ সাহেবও সে-ধরণের অযথা একদেশদর্শিতায় পাতা ভরান নি, প্রথিতযশা সম্পাদকদের উদ্বৃত্ত কুড়িয়ে নির্লিপ্ত ভূমিকা ও সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্য সমেৎ যে-সঙ্কলনখানি আমাদের সামনে ধরেছেন, তা অবিলম্বে হপ্‌কিন্স্‌-পরিচিতির প্রমাণ্য গ্রন্থ-রূপে পরিগণিত হবে।

অথচ বইখানি হপ্‌কিন্স্‌-এর জীবনচরিত নয়, তাঁর উপেক্ষিত রচনারাশির সুনির্ব্বাচিত নিদর্শন; এবং এতে যদিচ হপ্‌কিন্স্‌-এর রোজ্‌নামা স্থান পেয়েছে, তবু সে-দিনলিপি এতই নিরহঙ্কার যে তা দেখে হাউস্‌ সাহেবও সম্পাদকসুলভ আত্মশ্লাঘার মোহ কাটিয়েছেন। ফলত সুলিখিত মুখবন্ধে অগ্রজের প্রতিধ্বনি ক'রে তিনি একবারও বলেন নি বটে যে মিত্রাক্ষরের লোভ সাম্‌লাতে পেরে তাঁর নিসর্গনিরীক্ষা হপ্‌কিন্স্‌-এর চেয়ে সূক্ষ্মতর, কিন্তু পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় হপ্‌কিন্স্‌-এর অসাধারণ লিখনপদ্ধতির সবিশেষ পরিচয় দিয়ে, কৌতূহলীর না হোক, জিজ্ঞাসুর জ্ঞানপিপাসা তিনি কার্পণ্য-ব্যতিরেকে মিটিয়েছেন। উপরন্তু এই সঙ্কলন থেকে হপ্‌কিন্স্‌-প্রতিভার কোনো বিকাশই বাদ পড়ে নি; এবং তাঁর জীবনরহস্য যেহেতু মুখ্যত আধ্যাত্মিক, আদৌ আধিভৌতিক নয়, তাই তাঁকে পুরোপুরি চেনার জন্যে এই সঞ্চয়ন ব্যতীত অন্য কোনো অভিজ্ঞানপত্র অনাবশ্যক।

তাহলেও হাউস্‌-সম্পাদিত সংগ্রহে ধর্ম্মরচনা অপ্রচুর, দিনানুদৈনিক সংসারযাত্রার খুঁটি-নাটিই বেশি; এবং হপ্‌কিন্স্‌-সম্বন্ধে ধর্ম্মাত্মা-বিশেষণটা যদিও বিশেষ ভাবে প্রয়োজ্য, তবু তিনি আগে কবি, তার পরে সাধক। সুতরাং তাঁকে ক্র্যাশ, ভন্‌, ব্লেক্‌, এমনকি এমিলি ব্রণ্টি-রও, পর্য্যায়ে ফেলা অন্যায়; এবং পারমার্থিক রহস্যকথনে তিনি অনেক সময় রামপ্রসাদ বা কবিরের মতো সাধারণ জীবনের সাজ-সরঞ্জামকেই রূপকার্থে ব্যবহার করতেন বটে, কিন্তু তাঁর শেষ জীবনের বিখ্যাত সনেটসমূহের সঙ্গে মরমী গীতিকবিতার কোনো আত্মীয়তা নেই, সেগুলির প্রতিমান ডান্‌-এর আধ্যাত্মিক কবিতাবলী। অবশ্য ডান্‌-এর প্রতিপত্তি আমাদের জীবদ্দশাতেই সুরু হয়েছে; এবং হপ্‌কিন্স্‌-এর পুঁথি-পত্রে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যা সেই শেষ এলিজাবীথান্‌-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধের সাক্ষী। তবুও এঁদের রচনারীতিই সমধর্ম্মী নয়, এঁদের চরিত্রগত সাদৃশ্যও বৈসাদৃশ্যের চেয়ে স্পষ্টতর। ডান্‌-এর ইন্দ্রিয়পরায়ণতা আর ইন্দ্রিয়ার্থের

উপরে হপ্‌কিন্স্-এর অগাধ বিশ্বাস, ডান্-এর বুদ্ধিবাদ আর শ্রুতি-স্মৃতির টীকা-টিপ্পনীতে হপ্‌কিন্স্-এর দুর্দ্দমনীয় স্বাতন্ত্র্য, উভয়ের উপরে বৈরাগ্যের নিরন্তর আকর্ষণ, চিরাচারের প্রতি উভয়ের সফল অবজ্ঞা, উভয়ের দর্শনানুরাগ ও গাম্ভীর্য্য—এ-মিলগুলো একবার মানলে, এমন সিদ্ধান্তের সমর্থন খুবই শক্ত যে নির্ব্বিকল্প সমাধি নিরুপাধিক জেনেই হপ্‌কিন্স্ লক্ষণাবৃত্ত ছেড়ে ব্যঞ্জনাবৃত্ত ধরেছিলেন অথবা উপমার বদলে উৎপ্রেক্ষা চালিয়েছিলেন।

বস্তুতই তিনি ঐশ্বর্য্যময় পৃথিবীকে ভালোবাসতেন; তাঁর সমস্ত অবসর কাটতো এই মর্ত্ত্যমহিমার বিস্মাপনব্যাখ্যানে; এবং সেইজন্যে যেমন এক দিকে তাঁর কৃতজ্ঞ হৃদয় এই অনন্ত বৈচিত্র্যের সৃষ্টিকর্ত্তাকে মুহূর্ত্তেকও ভুলতে পারতো না, তেমনি অন্য দিকে তাঁর জাগ্রত বুদ্ধি সৌন্দর্য্যবিনাশী যন্ত্রশিল্পের বিপুল বিসর্পণে প্রতিনিয়ত ভয় পেতো। আমার বিশ্বাস এই অন্তর্দ্বন্দ্বই তাঁর বিশিষ্ট ধর্ম্মানুরক্তির প্রাণ ও কারণ; এবং এ-রকম দোটানা যখন আধুনিক সভ্যতারই দরুণ দুর্লক্ষণ, তখন পুরাকালীন সুসমঞ্জস সমাজব্যবস্থায় জন্মালে, তিনি হয়তো সংসারের ভিতরেই সত্য, শিব, সুন্দরের আকাশবাণী শুনতেন। কিন্তু তা ঘটে নি ব'লেই, বর্ত্তমানের বেসুর বিশৃঙ্খলা থেকে তিনি দূরে স'রে গিয়েছিলেন ব'লেই, তাঁর উপরে ভীরু-নামের আরোপ ন্যায়সঙ্গত নয়; এবং যে-পলায়নপ্রবৃত্তি এক দিন উইস্‌মা-কে ক্যাথলিক্ চার্চ্চে এনেছিলো অথবা এলিয়ট্-কে আজ রোমের সকাশে পাঠিয়েছে, হপ্‌কিন্স্-এর কর্ম্মঠ জীবনে সে-দুর্ব্বলতার হিমস্পর্শ কখনো লাগে নি। তিনি আবাল্য বুঝতেন যে শুধু মুখের কথায় চিঁড়ে ভেজে না, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সকাল-সন্ধ্যা লাঙল ধরলে, তবেই মরুভূমিতে ফসল ফলে। হয়তো সেইজন্যেই আজকালকার বামাচারী ইংরেজ কবিদের উপরে এই জেসুইট্ পুরোহিতের প্রভাব এত প্রবল।

সে যাই হোক, অন্তত এতে সন্দেহ নেই যে হপ্‌কিন্স্-এর সেবা-ধর্ম্ম থেকেই "স্প্রাং রিদম্"-এর উৎপত্তি; এবং ইংরেজী ছন্দ-সম্বন্ধে বিদেশীর বাক্যব্যয় যদিচ অসমসাহসিক অনধিকার চর্চ্চা, তবু পূর্ব্বেই বলেছি যে প্রচলিত কাব্য তাঁর কাছে অবাস্তব ঠেকাতেই, হপ্‌কিন্স্ সে-কলার শোধনে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তিনি জানতেন সাহিত্যের এই বিভাগটাই প্রাচীনতম, প্রাথমিক মনুষ্যগোষ্ঠীর ঐকাত্মিক সুখ-দুঃখই আগে নৃত্য ও তার পর নৃত্যজনক ধ্বনিবিন্যাসে প্রকাশ পেয়েছিলো। সেইজন্যে এই শিল্পে মুষ্টিমেয় বিদ্যাভিমানীর উদ্ধত একাধিপত্য তিনি সইতে পারেন নি, ধারাবাহিক কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত্তি দাবিয়ে, আট বছর ধ'রে বিভিন্ন

লোকসাহিত্যের মধ্যে প্রাকৃত ছন্দের স্বরূপ খুঁজেছিলেন; এবং ফলে তাঁর মনে হয়েছিলো যে ইংরেজী ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান অক্ষর বা 'সীলেব্‌ল'-গণনার মুখাপেক্ষী নয়, তার ভিত্তি 'স্ট্রেস্' বা স্বরাঘাত। কারণ ভাষা ক্ষিতিজ ভাবের প্রতিবিম্ব, এবং দেশে ও কালে ভাবের প্রলেপ সমমাত্রিক নয়, বিষয়বিশেষে তার গভীরতার তারতম্য ঘটে। সুতরাং বাক্যের মধ্যে সেই শব্দসমূহই সজোরে উচ্চারণীয়, যেগুলোর অর্থগৌরব স্বভাবত বেশি; এবং প্রথাসিদ্ধ উপায়ে পদ্যের ছন্দোলিপি বানিয়ে সমাক্ষর চরণের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঘা মারলে, নির্ব্বাক পাঠকের চাক্ষুষ অভিনিবেশ হয়তো চিড় খায় না, কিন্তু উৎকর্ণ সহানুভূতির তাল নিশ্চয়ই ভেঙে যায়।

এখানে মানা ভালো যে ইংরেজী ছন্দের এই মূলগত কৃত্রিমতা একা হপ্‌কিন্স্-এর কাছেই ধরা দেয় নি; এবং পাশ্চাত্ত্য কাব্যসমুদ্র ছেঁকে তিনি 'স্প্রাং রিদম্'-এর যত উদাহরণ জমিয়েছিলেন, তা হাউস্-সম্পাদিত সঙ্কলনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। কিন্তু হপ্‌কিন্স্-এর কারয়িত্রী প্রতিভা এই নেতিবাচক আবিষ্কারে থামে নি, তাঁর বিবর্ত্তনবুদ্ধি পূর্ব্বগামীদের ব্যতিক্রমগুলোকে নিয়মের নিগড়ে বেঁধেছিলো; এবং তিনি বুঝেছিলেন যে দুটো স্বরাঘাত পর পর এলে, ইংরেজদের কান যখন মধ্যবর্ত্তী অক্ষরবিলোপে আপত্তি তোলে না, তখন অর্থের ইমারতে গোলা পায়রার জন্যে খোপ খালি রাখা অনাবশ্যক, তাতে পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গের লক্ষ্মীশ্রী বাড়ে না, জঞ্জালের বহর দেখে আমন্ত্রিতেরাই দূরে পালায়। তবে পাকা বাড়িতে জনসমাগম নিরাপদ, বিশেষ উপলক্ষে এক জনের স্থান সেখানে দশ জনে নেয়; এবং সাহিত্যের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার মতো পদ্যেরও প্রধান কর্ত্তব্য যেহেতু অতিথিসৎকার, তাই স্থিতিস্থাপকতাই তার অঙ্গের ভূষণ, অবস্থানুরূপ ব্যবস্থায় সেও গদ্যের প্রতিপক্ষ।

তথাপি গদ্য ও পদ্য কখনো এক নয়; এবং ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্-এর প্রতি সহজ পক্ষপাত সত্ত্বেও হপ্‌কিন্স্ পঠদ্দশাতেই কোল্‌রিজ্-এর নির্দ্দেশে মেনেছিলেন যে শব্দসমূহের শ্রেষ্ঠ বিন্যাসই যদিও গদ্য-পদবাচ্য, তবু কাব্যের উদ্ভব শ্রেষ্ঠ শব্দাবলীর পরম সমন্বয়ে। সেইজন্যেই তাঁর লঘুতম রচনা থেকেও ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্-এর জলবৎ তারল্য চিরনির্ব্বাসিত। কারণ হপ্‌কিন্স্ যেমন সাধারণ পাঠকের উদ্দেশেই কাব্য লিখতেন, তেমনি মানুষ-সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা-সমাদরের অন্ত ছিলো না; তিনি জানতেন যে সুবিধার অভাবেই ইতর-অবরদের হৃদিস্থিত বররুচি আজ পর্য্যন্ত জেগে ওঠে নি, সুযোগ পেলেই, অন্ত্যজের উপনয়নে অপ্রাকৃত জাতিবিচার ঘুচবে। উপরন্তু তিনি বুঝতেন যে ব্যক্তিস্বরূপ স্তরভেদের পোষ্যপুত্র নয়, এবং জগতের মূল যতই

অবিভাজ্য হোক না কেন, বিশ্ব আর বৈচিত্র্য সমার্থবাচক। সুতরাং অভিজ্ঞতার আত্মনেপদকে পরস্মৈপদে পরিবর্ত্তনের চেষ্টাও তাঁর কাছে হাস্যকর লাগতো, তিনি ভাবতেন যে ভাবের পিছনে যেকালে সর্ব্বগোচর বস্তুসংসার বিদ্যমান, এবং তার সামনে লৌকিক ভাষার অবাধ প্রসার, তখন ঐকান্তিক উপলব্ধির আদান-প্রদান তো নিশ্চয়ই সুসাধ্য, এমনকি স্বগত অনুভূতি বেঁটে বেঁটে সভ্যতার বিস্তার বাড়ায় ব'লেই শিল্পীরা সমাজের অগ্রণী।

তৎসত্ত্বেও স্বকীয়তা আর জন্মান্তররহস্য পৃথক ধাতুতে গঠিত; এবং ঘরে ব'সে চোখ বুজলে, চর্ব্বিতচর্ব্বণ অনায়াসে চলে বটে, কিন্তু নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্তে আসে না। সেজন্যে দরকার উন্নিদ্র চৈতন্য ও অক্লান্ত অধ্যবসায়; এবং কী পরিমাণ দৃকৃশক্তির সঙ্গে কতখানি কল্পনা মিশলে, তথ্য ও তত্ত্বের, ভাব ও ভাষার, সংবেদনা ও অনুষঙ্গের, অধুনা ও অতীতের কোন্ রকম সংমিশ্রণ ঘটলে, মুখ্য কবিদের সমপংক্তিতে পাদপীঠ মেলে, তার চরম নিষ্পত্তি হপ্‌কিন্স্-এর দিনপঞ্জিকা। গত বছর শেক্স্‌পীয়র-এর চিত্রকল্প-সম্পর্কে অধ্যাপক স্পর্জন্-এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বইখানি না বেরোলে, হয়তো সে-দিক্‌পতিকেও সর্ব্বভুক কৌতূহলে হপ্‌কিন্স্-এর নীচে নামাতে হতো; এবং আজ আর তেমন আধিক্যের অবকাশ না থাকলেও, এমন অনুমান আদৌ অসঙ্গত নয় যে এই ডায়ারি-কটি প'ড়ে কেবল সাহিত্যব্যবসায়ীদেরই চোখ ফুটবে না, সঙ্গীতসেবী, স্থপতি ও চিত্রকর, প্রত্নতাত্ত্বিক ও নিরুক্তকার, উদ্‌ভিদ্‌শাস্ত্রবিদ ও বায়ুবিজ্ঞানী, ভৌগোলিক ও ভূতবিদ্যাজ্ঞ, এঁদের সকলেই সমান উপকার পাবেন। ধন্য হাউস্ সাহেবের পাণ্ডিত্য যে তাঁর বিশ্বকোষী পাদটীকা এই সর্ব্বমুখী দিনলিপির অগণ্য অলি-গলিতে আমার মতো দিশাহারার যাতায়াতও সুকর ক'রে দিয়েছে।

হপ্‌কিন্স্-এর সাহিত্যসেবা মিল্‌টনী একনিষ্ঠার প্রতিযোগী; তাঁর কবিতা ডান্-প্রণীত অধ্যাত্ম কাব্যের সদৃশ; তাঁর চিঠিগুলি কীট্‌স্-লিখিত পত্রাবলীর অনুরূপ; এবং উভয়ের দৈনন্দিন রচনা থেকে তুল্যমূল্য পাঠোদ্ধার ক'রে হাউস্ সাহেব দেখিয়েছেন যে হপ্‌কিন্স্-এর ডায়েরি আর কোল্‌রিজ্-এর নোটবুক্ এক সূত্রে বাঁধা, একই জিজ্ঞাসায় অনুপ্রাণিত। এ ছাড়াও খুঁজলে দুজনের আরো অনেক মিল বেরোবে: যথা কাব্যসৃষ্টির জন্যে বুদ্ধি ও কাব্যপাঠের পক্ষে বোধির প্রয়োজন-সম্বন্ধে উভয়ের মতৈক্য, এবং কাব্যপিপাসুর মনে আবেশ ও অর্থের পৌর্ব্বাপর্য্য-সম্পর্কে দুজনের নিরুক্তি; প্রচলিত ছন্দশাস্ত্রের উপরে উভয়ের অনাস্থা, এবং নূতন ছন্দঃপ্রকরণে অন্তত খানিক দূর—অর্থাৎ 'ক্রস্টাবেল্' পর্য্যন্ত—দু জনের সহগমন; এক একটা কবিতার উপাদানসংগ্রহে উভয়ের বহু বৎসরব্যাপী প্রযত্ন, এবং আরব্ধ কর্ম্মের সমাধানে

দু জনের অক্ষমতা। এতগুলো মিল নিশ্চয়ই দৈবাৎ নয়; এবং শ্রেষ্ঠ কবিদের নিগূঢ় সামান্যতা বুঝলেও, এ-সমীকরণের রহস্য চোকে না।

তবুও হপ্‌কিন্স্‌ সম্ভবত কোল্‌রিজ্‌-এর সহধর্ম্মী নন; এবং সুন্দরের অভ্যাঘাতে উভয় মনে সমানুপাতিক বিস্ময়বোধ জাগতো বটে, কিন্তু কোল্‌রিজ্‌-এর ক্ষেত্রে যেটা ধরতো স্বয়ংসম্পূর্ণ তন্ময়তার আকার, হপ্‌কিন্স্‌-এর বেলা সেটা বোমার মতো ফেটে তাঁর শুদ্ধ চৈতন্যকে দিতো বস্তুবিশ্বের সঙ্গে মিশিয়ে। হয়তো সেইজন্যেই হপ্‌কিন্স্‌ নিজে ওয়ল্ট্‌ হুইট্‌ম্যান্‌-কেই তাঁর দোসর বলেছেন; এবং যে-কবি অজস্র অনুচিন্তন ও অসংখ্য পরিবর্ত্তন-ব্যতিরেকে সামান্য দিনপঞ্জিকা সুদ্ধ লিখতে চাইতেন না, তাঁর সঙ্গে সেই মার্কিনী বাগ্‌জীবনের তুলনা যদিচ আপাতত অগ্রাহ্য, তবু এমন ধারণা বোধহয় পোষণীয় যে হুইট্‌ম্যান্‌-এর বিরাট সাধনা—প্রত্যক্ষ পৃথিবীর অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারে বিশ্বমানবের উদ্বোধন—সে-সাধনা একা হপ্‌কিন্স্‌-এর কাব্য-রচনাতেই সিদ্ধ। হয়তো বা এই মর্ম্মান্তিক বিষয়াসক্তির জন্যেই হপ্‌কিন্স্‌ আজ ধ্যানরসিক য়েট্‌স্‌-এর বিচারে নিন্দনীয়; এবং রুচিভেদের কথা না তুললে, এ-সিদ্ধান্ত মোটেই অস্বীকার্য্য নয় যে য়েট্‌স্‌ কেবল হপ্‌কিন্স্‌-এর কাব্য প'ড়ে যে-অভিমতে পৌঁছেছেন, তাঁর রোজনামচা ও রেখাচিত্র হাতে পেয়েও আমরা সেই অনুসারেই মানতে বাধ্য যে তিনি নিজে না জেনে ফরাসী ইম্প্রেশনিস্ট-দের শিষ্য, তাঁর শিল্পও প্রকৃতির অবিকল প্রতিলিপি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে হপ্‌কিন্স্‌-এর ব্যাকরণবৈশিষ্ট্য উক্ত ইম্প্রেশনিস্ট্‌ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বিজড়িত; এবং যেহেতু যথাযথ প্রতিকৃতি চিনতেও শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন, তাই তাঁর বস্তুসাপেক্ষ ব্যাকরণ অনভ্যস্ত পাঠকের কাছে প্রথম প্রথম দুর্ব্বিষহ লাগে। কিন্তু শেক্স্‌পীয়রী উপমাসঙ্কর যাঁদের নখদর্পণে, তাঁরা জানেন যে ওই উপায়ে কেবল বৃথা বাক্যব্যয়ই থামে না, উপয়ান্তরে একাধিক অনুভূতির স্বাভাবিক তাৎকাল্য অপ্রকাশ্য। অর্থাৎ সভ্যতার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গ্রন্থি বাড়ায়, আমরা যদিও অগত্যা ভাষার মধ্যে ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় দিয়েছি, তবু মানবচৈতন্যের নিবিদ সমগ্রতা এখনো ঘোচে নি; এবং কোনো আদিম বিভক্তিবিহীন শব্দসমষ্টি আজ চলুক বা না চলুক, অন্তর্দর্শীমাত্রেই বোঝে যে প্রাগৈতিহাসিক উপজ্ঞার পরিচর্য্যায় তার পঞ্চেন্দ্রিয় যুগপৎ ব্যতিব্যস্ত। উপরন্তু এটা শুধু আত্মসন্ধানীর আবিষ্কার নয়; যেখানে বিশ্লেষণবৃত্তি কদভ্যাসে শিকড় গাড়ে নি—যেমন অশিক্ষিত জনগণের নিত্যনৈমিত্তিক ভাষায়—সেখানে বিধেয়বাক্য অনেক সময়ে সর্ব্বনামের বালাই চুকিয়ে প্রায় বিশেষণের মতো মূল কর্ত্তৃকারককে আঁকড়ে

ধরে।* কিন্তু যে আসলে জটিল, সরলতার অভিনয়ে সে কুটিলও বটে; এবং ভাবের দৈন্য ভাষার ঐশ্বর্য্যে ঢাকাই গর্হিত নয়, প্রকৃত বৈচিত্র্যের স্বল্পাঙ্গ অভিব্যক্তিও অক্ষমতাসূচক, এমনকি সততার পরিপন্থী।

সুতরাং আজকালকার সাত্ত্বিক শিল্পীর দায়িত্ব তার পিতৃপুরুষদের দ্বিগুণ: বুদ্ধির আধিক্যবশত সে অখণ্ড অভিজ্ঞাকে না ভেঙে আয়ত্তে আনতে পারে না; অথচ ভগ্নাংশগুলো না জুড়ে দর্শকদের হাতে দিলে, তাদের অভাব অপূর্ণ থাকে। এ-ক্ষেত্রে হপ্‌কিন্স্-তুল্য কবির পক্ষে চিত্রকর মানে-র দৃষ্টান্তই শিরোধার্য্য; এবং যাঁরা সেই ঊর্দ্ধশ্বাস পটুয়ার বৈদ্যুতিক রেখাপাত নির্নিমেষ নেত্রে দেখেছেন, তাঁদের কাছে হপ্‌কিন্স্-এর বিস্ফোরক দীর্ঘসূত্রতা আর অহৈতুক ঠেকবে না, তাঁরা মানবেন যে উভয়ের অপরিচ্ছন্নতা, অবিন্যাস বা অসমাপ্তি নিতান্ত বাহ্য, প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলেই. দুজনে উদ্বায়ী উপলব্ধির এ-রকম হুবহু নকল করতে পেরেছেন। তবে কৃতিত্ব হয়তো হপ্‌কিন্স্-এরই কিছু বেশি। কারণ আলেখ্যে বাস্তবিকতার প্রবেশ যত অনায়াস, সাহিত্যে তেমন নয়; এবং সামান্য জ্যামিতিক রূপকল্পের প্রতিবিম্বনে যখন দিনের পর দিন কাটে, একটা তুচ্ছ টুপি আঁকতে যখন পটের পর পট উৎসন্নে যায়, তখন একজন আশুবেদন মানুষের মানসপ্রতিক্রিয়ার বর্ণনায় নৈয়ায়িক পদপরিচয়ের অবমাননা ক্ষমণীয়ই নয়, অনিবার্য্যও। এ-কথা হেন্‌রি জেম্‌স্-এর অবিদিত ছিলো না; তাই তিনিও প্রত্যাশিত পদের স্থানে অপ্রত্যাশিত গুণবাচক বাক্যাংশ ঢুকিয়ে ক্রোধান্ধ বৈয়াকরণদের অভিশাপ কুড়তেন; এবং মালার্মে-র কবিপ্রতিভা ওই রকম নিপট যাথার্থ্যের মুখপাত্র ব'লেই, তিনি বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্যতম দ্বারপাল।

শুনেছি খৃষ্টান ধর্ম্ম প্লেটো-পরিকল্পিত তিতিক্ষার সাংসারিক প্রযোজনা, কিন্তু খৃষ্টীয় তত্ত্ববিদ্যায় আরিস্টট্‌ল্-এর স্বাক্ষর সুস্পষ্ট; এবং অক্স্‌ফোর্ডে থাকতে হপ্‌কিন্স্ পেটর-এর প্ররোচনায় যে-সৌন্দর্য্যসংবাদ লিখেছিলেন, তার রূপ প্লেটোনিক হলেও, মীমাংসা যেহেতু হেগেলী, তাই তাঁর সৃষ্টি-প্রণালীর পিছনে সমন্বয়সাধক ডায়ালেক্‌টিকের অনুসন্ধান হয়তো আকাশকুসুম-চয়নের মতো পণ্ডশ্রম নয়। অন্ততপক্ষে এটা নিশ্চয় যে হপ্‌কিন্স্ যদিও বস্তুস্বাতন্ত্র্য মানতেন, তবু বাস্তবিকতার পরিণামী প্রকর্ষে তাঁর অনাস্থা

* ফলত হপ্‌কিন্স্-এর "Holiest, lovliest, bravest, | Save my hero, O Hero savest." অথবা "...Patience who asks | Wants war, wants wounds ;..." ইত্যাদি পংক্তিগুলোর স্বপক্ষে এলিজাবেথী কাব্যের দোহাই দেওয়া অনাবশ্যক, এ-প্রসঙ্গে শুধু এইটুকুই স্মর্ত্তব্য যে আজও ইংরেজ দাস-দাসীরা ব'লে থাকে, "There's a man come says he's to mend the pipes."

ছিলো না; এবং তিনি বুঝতেন বটে যে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ভিন্ন মর্ত্ত্যমানুষের গতি নেই, কিন্তু তাই ব'লে ঐহিক আর পারমার্থিকের অনাদ্যন্ত অনৈক্য তাঁর চোখে ধরা দিতো না, উল্‌টে তিনি ভাবতেন যে অসম্পূর্ণ লোকায়ত আর অনধিগম্য লোকোত্তর শিল্পের অনির্ব্বচনীয় অতিভূমিতেই অন্তঃপ্রবিষ্ট, এবং সে-জগতে নিঃশ্রেয়সের সান্নিধ্য না মিললেও, রূপকার সেখানে অদ্বৈত ভূমার অনুবর্ত্তী। অতএব তুলনামূলক বিচারে হপ্‌কিন্স্‌ আর জোলা-র বস্তুবিলাস ঐকপদিক নয়; বরং যে-চিত্রকরকে আবিষ্কার ক'রেও জোলা যাঁর উদ্দেশ পান নি, সেই সেজান্‌-এর সঙ্গে হপ্‌কিন্স্‌-এর সাদৃশ্য যেন বংশগত।

সেজান্‌ যেমন শঙ্কু বা গোলক বা সমবর্ত্তুলের দৌত্যেই বিশ্বপ্রকৃতির অভিসারে এগোতেন, হপ্‌কিন্স্‌ তেমনি জানতেন যে কবি অভিধানের আজ্ঞাবাহী, শব্দই তার রসপ্রতিপত্তির একমাত্র সহায়। কিন্তু রোজর ফ্রাই দেখিয়েছেন যে সেজান্‌-এর সংস্কারমুক্ত মন কোনো স্বতঃসিদ্ধ প্রতিসাম্যের ধার ধারতো না; আত্যন্তিক অভিনিবেশের ফলে তাঁর চিত্তপটে পারিপার্শ্বিকের যে-আনুপূর্ব্বিক প্রতিভাস ফুটে উঠতো, সেই নৈরাত্ম্য বর্ণসঙ্গতির যথাযথ অনুবাদই তাঁর অলোকসামান্য বহিরাশ্রয়িতার বীজমন্ত্র। অনেকের মতে এইখানেই বস্তুবাদের উপসংহার; এবং ডায়ালেকটিক্‌ সংঘাতে ভঙ্গুর জ্ঞেয় ও নশ্বর জ্ঞাতার পার্থক্য চুকিয়ে যেখানে সত্যসত্যই অখণ্ড জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে, সেখানে কেবল ন্যায়ের নির্ব্বন্ধে অমৃতের অস্বীকার নির্ব্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত। কারণ ন্যায় নিষ্ঠারই অনুচর; এবং গতানুগতিক বৈদগ্ধ্যও যখন সেজান্‌-ভক্তদের চক্রবৃদ্ধি থামাতে পারে নি, তখন হপ্‌কিন্স্‌-এর প্রভাব যে কালে কালে বাড়তেই থাকবে, তা এক রকম নিঃসন্দেহ। ইতিমধ্যে হাউস্‌-সংগৃহীত রচনাবলী পড়লে, আমরা সকলেই একবাক্যে বলবো যে কবিযশ খেয়ালী ভাগ্যবিধাতার অধিকারবহির্ভূত।

"বাংলা ছন্দের মূল সূত্র"

এক সময়ে আমার বিশ্বাস ছিলো যে বাংলা ছন্দ সংস্কৃত আর্য্যার সন্তান, কিন্তু যে-জৈব নিয়মের শাসনে প্রাণীমাত্রেই বংশানুক্রমিক অবনতির অধীন, তারই প্রভাবে আর্য্যার মাত্রিক পবিত্রতাও বাংলায় আর অবিমিশ্র নেই। শিশুশিক্ষালব্ধ অন্যান্য কুসংস্কারের মতো এ-ধারণাও শেষ পর্য্যন্ত টিঁকলো না; প্রয়োগের তাগিদে এবং তার্কিকের নির্ব্বন্ধে অগত্যা মানলুম যে বাঙালীর ছন্দশাস্ত্র মূলে হয়তো আর্য্য ঐতিহ্যের ঋণমুক্ত। তবে বাল্য প্রত্যয় ক্ষণস্থায়ী হলেও, তার উপসর্গ দুর্মর; এবং সেইজন্যে সংস্কৃতের মোহ একেবারে কাটাতে না পেরে আমি জোর দিলুম প্রাচীন ছান্দসিকদের একটা নাতিপ্রয়োজনীয় বিধানের উপরে, যার কল্যাণে পদান্ত্য বর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘতা কবির রুচিসাপেক্ষ। অবশ্য কেবল এই বিধিমতেই যে বাংলা কবিতার ছন্দোলিপি বানানো যায় না, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং কোনো এক অখ্যাত আলঙ্কারিকের কাছ থেকে আর একটা নিয়ম চেয়ে আনলুম, যার সাক্ষ্যে দেখানো গেলো যে আর্য্যায় যতি ও ছেদ অভিন্ন। কিন্তু এতেও যখন বাংলার মাত্রাপরিমাণ পেলুম না, তখন ওই দুই বিধানের সমর্থনে এক তৃতীয় বিধানের পরিকল্পনা করলুম, যার ফলে আবার বাংলা শব্দান্ত্য বিরামের সঙ্গে যতি ও ছেদের কোনো প্রভেদ রইলো না।

সুবিধার খাতিরে নিয়মনির্ম্মাণের নামই অবৈধতা; এবং আমার উপরোক্ত বিধিগুলি সেই অভিধারই উপযুক্ত। তবু আমার মনোভাব যুক্তির প্রসাদ থেকে একেবারে বাদ পড়ে নি। আত্মজিজ্ঞাসাকে আমি এই তর্কের দ্বারা পরাস্ত করতে চেয়েছিলুম যে বাংলার উচ্চারণপদ্ধতি সংস্কৃতের মতো একটানা নয় ব'লে, বাংলা ছন্দে প্রতি শব্দের শেষে যে-অবকাশ আছে, তা সংস্কৃততে শুধু চরণান্তেই বর্ত্তমান; এবং এই দুই অবকাশের কালপরিমাণে যদি তারতম্য ন' থাকে, তবে তাদের ধর্ম্মেও পার্থক্য দেখা দেবে না, পদান্ত্য বর্ণের মতো প্রাগ্‌যতি অথবা প্রাগ্‌বিরাম বর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘতাও নিশ্চয় স্বয়ম্বশ হবে। অনুমানটা হয়তো নিতান্ত অন্যায্য নয়; কিন্তু এত চেষ্টাতেও সকল সমস্যা মিটলো না। অনেক পরিচিত দৃষ্টান্তে এই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্কৃত বিধির ব্যতিক্রম তো ঘটলোই, এমনকি বাংলা কাব্যের একটা বিরাট বিভাগ, অর্থাৎ স্বরমাত্রিক ছন্দ, কোনোমতেই এই নিয়মের অধীনে এলো না।

বরং তাকে বিজাতীয় ছন্দোরীতির সাহায্যে বোঝা গেলো, তবু তা

সংস্কৃতের সঙ্গে খাপ খেলে না। স্বরমাত্রিককে বৈদেশিক ভাবতে পারলে, হয়তো গোলোযোগ চুকতো, কিন্তু সে-দিকে কোনো সুরাহা ছিলো না। কারণ মেয়েলী ছড়া এবং গ্রাম্য প্রবচন ইত্যাদি যে-ছন্দে রচিত, তাতে স্বদ্ধ পরদেশী প্রভাব লাগলে, বাংলার প্রাণবস্তুকেই অস্বীকার্য্য ঠেকে। কাজেই বহু প্রসিদ্ধ ছন্দোবিদের অনুসরণে বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক দ্বৈত মেনে নিয়ে আমি মনে মনে অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলুম যে স্বরমাত্রিক ছন্দই বাংলা কাব্যের আদিম বাহন; তবে তার উৎপত্তি যেহেতু প্রাক্‌সংস্কৃত যুগে, তাই সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের অপ্রাকৃত বিধিবদ্ধতা তার নাগাল পায় নি; কিন্তু জগতের সকল কাব্যকলার মূল নিশ্চয়ই এক; সংস্কৃত সাহিত্য স্বেচ্ছায় সেই সহজতার সংসর্গ ছেড়েছিলো; এবং সেইজন্যে বাংলা ছন্দের যে-অংশটা সংস্কৃতগন্ধী, তার নিয়ম জগতের অন্যান্য ছন্দঃপদ্ধতির অনুরূপ নয়; যেটা অবিকৃত, তার সঙ্গে বাহিরের সংযোগ সুস্পষ্ট।

এই অদ্ভুত ধারণার ইতিহাস প'ড়ে অনেকেই হয়তো হাসবেন। কিন্তু তাতে আমি লজ্জিত নই; কারণ বাংলার শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ যে-ভ্রান্তির পৃষ্ঠপোষক, তার আনুগত্যে অসম্মান নেই, আছে কেবল গৌরব। আমি ঐতিহ্যে বিশ্বাস করি; অকারণে বা অল্প কারণে পূর্ব্বসূরিগণের সাধনালব্ধ সিদ্ধান্তের উপেক্ষা আমার বিবেকে বাধে। উপরন্তু বাংলা ছন্দের মূলসূত্র-আবিষ্করণও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার অন্তর্গত; এবং বিজ্ঞানে অদ্বিতীয় সত্যের স্থান নেই। বৈজ্ঞানিক নির্ব্বিকল্পের পূজারী নয়, সে খোঁজে অনুমিতির ব্যাপকতা। সে জানে যে পৃথিবীকে অচল ভেবে তার চার দিকে সূর্য্যকে তাড়িয়ে বেড়ালে, সত্যের অপলাপ হয় না, হয় শুধু অনুমিতিসংখ্যার অনাবশ্যক বৃদ্ধি। অর্থাৎ পৃথিবীতে সৌরজগতের কেন্দ্র দেখলে, যতগুলি সমস্যার সমাধান অবশ্যকর্ত্তব্য, সূর্য্যকে কেন্দ্রে বসালে, ততগুলো প্রশ্নের জবাব না দিলেও হয়তো চলে। তাই সারল্যের খাতিরে বৈজ্ঞানিক বলে যে আমাদের জগৎ সৌরকেন্দ্রিক। ছন্দ-সম্বন্ধেও এ-কথা খাটে; এখানেও সত্যাসত্যের বাদ-প্রতিবাদ অসার্থক, নবতর অনুমান অধিক ব্যাপক কিনা, বিবেচ্য কেবল এইটুকুই। সত্যেন্দ্রনাথের প্রকরণেও বাংলা কাব্যের ছন্দোলিপি বানানো যায়; কিন্তু সে-উপায়ে বাংলা ছন্দের দ্বিধা বা ত্রিধা ঘোচে না। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথের নির্দ্দেশ মাথায় ধ'রেও আমি বাংলা ছন্দের ঐক্য চাই; এবং যখন তা পাই, তখনও তাঁর অভিজ্ঞতা আমার কাছে মূল্যহীন ঠেকে না, শুধু বুঝি যে তাঁর পশ্চাদ্বর্ত্তীরা সারল্যের দিকে অপেক্ষাকৃত অধিক এগিয়েছেন।

আমি যত দূর জানি শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এই ঐক্যসাধন-

ব্রতের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা; এবং এ-সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার ফলাফল ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ ক'রে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়েছেন। "বাংলা ছন্দের মূলসূত্র"-নামক* আলোচ্য পুস্তিকাখানি সেই সন্দর্ভের সংক্ষেপসার। বইখানির রচনারীতি দেখে মনে হয় গ্রন্থকার বাংলা লেখায় এখনো অনভ্যস্ত। তাছাড়া তাঁর অপ্রাঞ্জল পরিভাষা, ছাপার ভুল ও ব্যাখ্যার অভাব ইত্যাদি দোষ বইখানির অর্থবোধে বিঘ্ন ঘটায়। কিন্তু এ-সকল দুর্ব্বোধ্যতা এবং দৃষ্টান্ত-উদ্ধারে অমার্জ্জনীয় ভুল-চুক সত্ত্বেও অন্তত আমার মনে আর কোনো সন্দেহ নেই যে অমূল্যধন বাংলা ছন্দের প্রকৃতি-সম্বন্ধে যা বলেন নি, তা বক্তব্যই নয়। এই প্রশংসা আত্যন্তিক শোনালেও বিবেচনাসম্ভূত; এবং সত্য বলতে কি, অমূল্যধনের লেখা যখন প্রথমে সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে পড়ি, তখন মনে কেবল প্রতিবাদই জেগেছিলো। কিন্তু তাঁর প্রতিপাদ্য পুস্তকাকারে হাতে আসার পরে আমার মুখ্য আপত্তিগুলির বোধহয় আর একটাও অবশিষ্ট নেই। অবশ্য এখনো ছোট-খাট অনেক কৌতূহল অতৃপ্ত রয়েছে, তবে সেজন্যে হয়তো আমার স্থূল বুদ্ধিই দায়ী। অমূল্যধন যদি তাঁর সূত্রগুলিকে উদাহরণ সমেত সবিস্তারে লেখেন, তবে আর কোনো অভিযোগ থাকবে না ব'লে আমার বিশ্বাস। কারণ বাংলা ছন্দের মৌল সত্তা যাঁর অগোচর নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ অঙ্গসংস্থানে তাঁর ভুল-ভ্রান্তি নিশ্চয়ই সাময়িক।

দুঃখের বিষয়, এই ভবিষ্যদ্বাণী অনেকের কানেই হাস্যকর লাগবে; এবং ছন্দ-সম্বন্ধে গোটাকতক কার্য্যকর ধারণা থাকলেও, সে-বিষয়ে আমার যেহেতু কোনো নিজস্ব গবেষণা নেই, তাই সাম্প্রতিক মাসিকপত্রের ভদ্রতাবিরুদ্ধ ছন্দোযুদ্ধে আমি দাঁড়াতেই পারবো না, কী নিয়ে এত আপত্তি-বিপত্তি, তা বোঝার আগেই নিরুপলক্ষ বাক্যবাণে প্রাণ হারাবো। তবে আমি পৌরুষেই বঞ্চিত, শ্রুতিশক্তিতে নয়; এবং সেইজন্যে দূর থেকে যুযুৎসুদের শুধিয়ে জেনেছি যে এই কলহকোলাহলের মূলে রয়েছে বাংলা ছন্দের শ্রেণিবিভাগ। অর্থাৎ দ্বন্দ্ব প্রভেদের স্বরূপ-সম্বন্ধে। অমূল্যধনের প্রতিবাদকেরা বলেন যে প্রকার-তিনটি বংশগত নয়, জাতিগত। অর্থাৎ তাঁদের মতে এই ত্রিধারা বাংলা ছন্দের ত্রিমূর্ত্তি: এগুলি অনাদ্যন্ত ও স্বসমুখ।

অমূল্যধনের বিবেচনায় বাংলা ছন্দ কার্য্যত তিন প্রকারের,—শুধু তিন কেন, বহু প্রকারের, হ'লেও তার মূল সূত্র এক ও অবিভাজ্য। এ যেন এক পিতার বহু সন্তান, তাদের কায়িক রূপে যতই তারতম্য ঘটুক না কেন,

---

* বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

তাদের রক্তে কোনো পার্থক্য নেই; তাদের তাল, লয় এক, শুধু ঢং আলাদা। নিরপেক্ষ বিচারকের কাছে অমূল্যধনের মতই বেশি যুক্তিবান; কারণ একই ভাষায় মাত্রাগণনার পদ্ধতি ত্রিবিধ, এমন পরিকল্পনা তো পীড়াদায়ক বটেই, এমনকি তা গায়ে সয়ে গেলেও, প্রয়োগের বেলায় দেখি যে অধিকাংশ প্রাচীন কবিতাই এই ত্রিধা আদর্শের বহির্ভুক্ত থেকে গেলো। এ-ক্ষেত্রে যাঁরা প্রাকৃরৈবিক কবিমাত্রকেই ছন্দোতুষ্ট ব'লে ভাবতে না পারবেন, তাঁদের পক্ষে অমূল্যধনের পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গবাদে আস্থাস্থাপন ছাড়া গত্যন্তর নেই; এবং তার সাহায্যে যেমন একদেশদর্শিতা বাঁচে, তেমনি অসম্ভাব্যতাও প্রশ্রয় পায় না।

অবশ্য পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ অমূল্যধনের নূতন আবিষ্কার নয়; ছন্দোবিচারক-মাত্রেই ও-দুটির অস্তিত্ব মেনে এসেছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তীরা ছন্দে কালের প্রভাব-সম্বন্ধে অমূল্যধনের মতো সচেতন ছিলেন না। তাই তাঁরা অক্ষর বা মাত্রা গুণেই ছন্দোলিপি বানাতে চেয়েছিলেন। অমূল্যধন দেখিয়েছেন যে পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ, অর্থাৎ কালপরিমাণই, বাংলা ছন্দের প্রাণ। এক ঝোঁকে কতকগুলো কথার উচ্চারণই বাঙালীর রীতি; কিন্তু বাক্যারম্ভে বাক্‌যন্ত্রের যে-শক্তি থাকে, বাক্যের শেষে স্বভাবতই তা কমে আসে; এবং বাংলা শব্দও যেহেতু কাটা কাটা ভাবে উক্ত হয়, তাই এখানেও ওই উত্থান-পতন ধরা পড়ে। এইজন্যে বাঙালীর আলাপ-প্রলাপে স্বরগাম্ভীর্য্যের একটা হ্রাস-বৃদ্ধি শোনা যায়; এবং সেই স্বরকম্পনই বাংলা ছন্দের প্রধান উপকরণ। অতএব এই পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গের আদর্শ ও পরিমাপ মনে রাখলে, অক্ষরমাত্রার কম-বেশিতে বাংলায় ছন্দঃপতন ঘটে না; পাঠক বিনা কষ্টেই অক্ষরমাত্রাকে প্রয়োজনমতো হ্রস্ব বা দীর্ঘ ক'রে নিতে পারে ও নেয়।

তবে এ-কথা বলার ব্যাবহারিক মূল্য যৎসামান্য। কিন্তু ছন্দশাস্ত্র যেহেতু কাব্যরচনার পথ দেখায় না, শুধু কাব্যবোধের উপাদান জোগায়, তাই অমূল্যধনের আবিষ্কারকে আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। কারণ এর পরেও বাংলা ছন্দের ত্রিমূর্ত্তি যদিচ ওঙ্কারে পরিণত হবে না, তবু ত্রিবেণীসঙ্গমের সন্ধান নিশ্চয়ই মিলবে। অর্থাৎ আমরা বুঝবো যে আপাতদৃষ্টিতে বাংলা ছন্দকে স্বরান্তিক, আক্ষরিক, মাত্রিক ইত্যাদি বিভাগে ফেলা গেলেও, আলোচনাটিকে এমন এক পর্য্যায়ে তোলা যায় যেখানে এই প্রকারভেদ নিতান্ত নিরর্থক। তাহলেও ব্যবহারের ক্ষেত্রে অথবা বাংলা কাব্যের আধুনিক কাণ্ডে পূর্ব্বানুমোদিত স্তরভেদ এখনো মোটামুটি খাটবে; এবং যে-গণ্ডকারেরা অঙ্ক ব্যতীত ছন্দ লিখতে অক্ষম, অমূল্যধনের হ্রস্বীকরণ ও

দীর্ঘীকরণের নিয়ম জেনেও তারা কাজ গোছাতে পারবে না। তবে যারা শুধু কাজ চালিয়েই সন্তুষ্ট নয়, তারা অমূল্যধনের সিদ্ধান্তেই না থেমে, ভবিষ্যতে তাঁকে ছাড়িয়ে ব্যাপকতর ঐক্য খুঁজবে বটে, কিন্তু তারাও না মেনে পার পাবে না যে সকলেই অমূল্যধনের কাছে ঋণী, এবং তিনি গন্তব্যে না পৌছলেও, দিকভ্রমে পথ হারান নি।

হয়তো ব্যক্তিগত কারণে ঐক্যসাধনের প্রয়োজনই আমার কাছে সব চেয়ে বড়; এবং সেইজন্যে আলোচ্য গ্রন্থের এই দিকটায় আমি বেশি জোর দিয়েছি। কিন্তু এটাও আমি জানি যে কেবল সাধারণ সূত্রের উপরে যে-মতবাদ প্রতিষ্ঠিত, যাতে শুধু অভিন্নতাই সূচিত হয়, বৈষম্যের ব্যাখ্যা মেলে না, তার মূল্য অত্যল্প। সুতরাং অমূল্যধনের নির্দ্দিষ্ট পথে বাংলা ছন্দের সমস্যামূলক ত্রিত্বের কোনো হেতু পাওয়া যায় কি না, তার বিচারেই এ-প্রবন্ধ শেষ করা প্রশস্ত। প্রথমেই শব্দান্তের বিরাম, পর্ব্বান্তের যতি এবং পদান্তের ছেদ, এই তিন অবকাশের নাম নিয়েছিলুম। এগুলিকে পৃথক বলার সার্থকতা এই যে এদের কালপরিমাণ এক নয়, ক্রমবিবর্দ্ধমান।

ছেদ সাধারণত অর্থের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ ছেদে থেমে পাঠকের বুদ্ধি সমাপ্ত বাক্যের মানে বোঝে, এবং আগামী বাক্যের ভাবগ্রহণের জন্যে কোমর বাঁধে; তাই ছেদের সঙ্গে ছন্দের সম্পর্ক, অন্তত মিত্রাক্ষর ছন্দের সম্পর্ক, খুব নিবিড় নয়। কিন্তু যতি নিঃশ্বাসগ্রহণের কাল; কাজেই যে-ছন্দে যতি দূরে দূরে স্থাপিত, সেখানে শব্দ ও অক্ষরগুলোর উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত দ্রুত; কেননা বাক্যের মধ্যে শ্বাস নেওয়া বাংলা উচ্চারণের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ফলে বাঙালী যতিবিরল ছন্দে হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্বরান্ত, হলন্ত ইত্যাদি সকল অক্ষরই প্রায় সমান ভাবে পড়ে, যৌগিক বর্ণকে তার যথার্থ মর্য্যাদা দেয় না। গদ্যে তো এ-রকম ঘটেই, এমনকি পয়ারও এই জাতীয় ছন্দ; কারণ অন্তত আট মাত্রার পরে তার প্রথম অবকাশ, এবং দ্বিতীয় অবকাশ ছয় বা দশ মাত্রার পরে। সুতরাং গদ্যে বা পয়ারে বর্ণোচ্চারণের খুব স্পষ্টতা নেই, আছে একটা ঝোঁক অথবা তান; এবং তার ফলে যুক্ত-অযুক্ত, লঘু-গুরু, সব অক্ষরই পয়ারে একমাত্রিক-রূপে গণ্য। পয়ারের এই গুণকেই রবীন্দ্রনাথ শোষণশক্তি নামে অভিহিত করেছেন।

পক্ষান্তরে অবকাশ যেখানে ঘন ঘন আসে, সেখানে শ্বাসের অনটন না থাকাতে, প্রত্যেক বর্ণ তার প্রকৃত ওজন পেতে পারে। এই শ্রেণীর যতিবহুল ছন্দই মাত্রাবৃত্ত অথবা ধ্বনিপ্রধান-নামে পরিচিত। এর চাল দ্রুত, ধ্বনি তরঙ্গায়িত এবং এর শোষণশক্তি ফলত সুপরিমিত। অর্থাৎ এতে যৌগিক স্বর, যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ব বর্ণ, অনুস্বর, বিসর্গ, হলন্ত অক্ষর ইত্যাদির

মাত্রাসংখ্যা দুই এবং সময়ে সময়ে তিন। তথাকথিত স্বরবৃত্ত অথবা স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ, আমার মতে, শব্দান্ত্য বিরামের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এ-ছন্দে শব্দান্ত্য বিরামই শ্বাসের অবকাশ, যতি নিতান্ত গৌণ। কাজেই এখানে পাঠকের নিঃশ্বাসের পুঁজি সাধারণ উপায়ে ফুরোয় না; তার সদ্ব্যবহার করতে গেলে, তাকে অতিরিক্ত কাজের ভার দেওয়া দরকার। ফলে বাংলা উচ্চারণে বাক্যারম্ভমাত্রেই যে-স্বরাঘাতের সূচনা হয়, এখানে সেটা, ইংরেজী উচ্চারণের মতো, শব্দে শব্দে ঝঙ্কার জাগায়।

· অমিত্রাক্ষরের কারবার ছেদকে নিয়ে। এখানে লক্ষ্য শুধু অর্থ আর আবেগ, ছন্দশিল্পের কারিকুরি নেহাৎ নগণ্য। হয়তো সেইজন্যেই এতে যত নিয়মের ব্যতিক্রম চলে, অন্যত্র তা অসম্ভব। এখানে শ্বাসের অবকাশ এতই অপ্রচুর যে ছোট-খাট অসম্পূর্ণতার হিসাব রাখা আর তার সাধ্যে কুলয় না, একটা অবিরাম ও উদাত্ত ধ্বনিতরঙ্গের উপরে ত্রুটি ঢাকবার দায়িত্ব চাপিয়ে, পাঠক ছেদের উদ্দেশ্যে এমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছোটে যে তার স্বাভাবিক বিজোড়বিদ্বেষকে উপেক্ষা ক'রেও, তাকে তিন, পাঁচ বা সাত ইত্যাদির মতো অযুগ্ম সংখ্যায় অনায়াসেই থামানো যায়।

এই বিরাম, যতি ও ছেদ সম্বন্ধে যা বললুম, তার প্রকাশ্য উল্লেখ আলোচ্য গ্রন্থে নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস লেখক পরিশিষ্টে এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত করেছেন। এ-ধারণা যদি আমার ভ্রান্তি বা শৈশব যতিপ্রিয়তা থেকেই জন্মে থাকে, তবুও ক্ষুণ্ণ হবো না; কারণ এ-প্রসঙ্গে তাঁকে ভুল বুঝলেও, অন্যত্র তিনি আমার অজ্ঞানান্ধকারে জ্ঞানদীপই জ্বেলেছেন। তাহলেও সে-সব কথার সংক্ষেপসার দিলুম না, এবং সমগ্র গ্রন্থখানি এত সংক্ষিপ্ত যে তাকে আর কমানো আমার সাধ্যের অতীত। তাছাড়া পুস্তকখানির সারসংগ্রহের জন্যে যতটা সময় ও স্থানের দরকার, তা আমার নেই। তাই অমূল্যধন-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে দিয়েই আমি ছুটি নিচ্ছি।

"অন্তঃশীলা"

শুনেছি বাংলা উপন্যাসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রাক্‌চল্লিশ ডেলি প্যাসেঞ্জার আর উত্তরচল্লিশ পৌরস্ত্রী। কথাটা সত্য হলেও, আশ্চর্য্যজনক নয়। কারণ ইচ্ছানিদ্রাও সাধনাসাপেক্ষ; এবং মধ্যম শ্রেণীর রুদ্ধশ্বাস লোকারণ্যে প্রভাতী নিদ্রার জন্যে যতখানি অভ্যাস দরকার, তার পক্ষে চল্লিশ বৎসর তো নিমেষমাত্র বটেই, এমনকি ইতিমধ্যে রূপকথার সাহায্যে দিবাস্বপ্ন দেখাও সেই শিক্ষানবিসিরই অঙ্গ। কিন্তু মেয়েদের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। সকল গৃহস্থই অবগত আছেন যে শাশুড়ীর পদে না পৌঁছনো পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতির চিত্তশুদ্ধি দুর্ঘট; এবং অগ্নিপরীক্ষাই যেহেতু সংস্কৃতির সনাতন উপায়, তাই গল্প-গুজব-নামক পরচর্চ্চার গুরুতর দায়িত্ব ধুরন্ধরীদের উপরে ছেড়ে দিয়ে বাঙালী বধূ সেই পরাকাষ্ঠার দিকে এগোয় পাকপ্রণালীর প্রজ্জ্বলিত পথে। সে যাই হোক, এতে সন্দেহ নেই যে নভেল্‌ আমাদের অবসরবিনোদনের সাথী; এবং সেইজন্যেই তার অবস্থা বাংলা কাব্যের চেয়েও শোচনীয়, প্রায় বাংলা প্রবন্ধের মতোই সঙ্গীন। আসলে অর্থবিজ্ঞানের টান-জোগান শিল্পরাজ্যেও অকাট্য; এবং স্বয়ং ভগবানই যখন নিরুদ্দিষ্ট আত্মপ্রকাশে অপারগ বা অসম্মত, তখন নিরপেক্ষ মৌলিকতা বাংলা উপন্যাসে নিশ্চয়ই দুর্লভ।

অবশ্য লেখক-পাঠক কোনো পক্ষই ও-নিয়মের অস্তিত্ব মুখে মানেন না; এবং বাঙালীর স্বভাব এমনি গতানুগতিক, তার কৌতূহল থাকলেও, দৃক্‌শক্তিতে সে এতটা দরিদ্র যে উক্ত স্বকীয়তার অভাব সে ঢাকে তার স্বল্পাঙ্গ সমাজব্যবস্থার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ ক'রে। কিন্তু সাধারণ জীবনযাত্রা অন্য দেশেও বৈচিত্র্যহীন, আষ্টপ্রহরিক সংসারে রোমাঞ্চ চিরদিনই বিরল, এবং অমানুষ বা অতিমানুষ কাল্পনিক জীব। উপরন্তু আধুনিক কালে য়ুরোপীয় ঘটনাপ্রবাহ যদিও অপেক্ষাকৃত দ্রুত, তবু প্রাচ্য মানুষের মন পাশ্চাত্ত্যের মতোই জটিল; এবং এ-দেশে টল্‌স্টয়-এর জন্ম অভাবনীয় বটে, কিন্তু ডস্টয়েভ্‌স্কি-র অভ্যুদয়ে তিলমাত্র বাধা নেই' তবে সাহিত্য আমাদের কাছে অনুশীলনের সামগ্রী নয়। আমাদের মধ্যে যাঁরা গম্ভীর প্রকৃতির, তাঁদের চিত্তবৃত্তি ধর্ম্মানুরক্ত; এবং অন্যেরা উপজীবিকার অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং হয় চিরাচরিত অধ্যাত্ম চিন্তা, নয় অনায়াস আমোদ-প্রমোদ, এ ছাড়া অপর কিছুতে মেধার অপব্যয় আমাদের মতে অনভিপ্রেত; এবং সেইজন্যে বাংলা দেশে যেমন মনীষীর সংখ্যা অগণ্য, তেমনি মননশীল সাহিত্যের—বিশেষত মননশীল কথাসাহিত্যের—অনটন অসম্ভব রকমের বেশি।

সৌভাগ্যক্রমে খ্যাতি আর শ্রেয়োবোধের তুলাদণ্ড প্রায়ই আলাদা; এবং যে-বই লিখে নির্ব্বিচার পাঠকের সাধুবাদ মেলে, তাতে সাধারণত সাহিত্যিক বিবেকের আশ মেটে না। সেইজন্যে পশ্চিমের অধিকাংশ সাহিত্যসেবীই তাঁদের স্বদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বহুল প্রচারকে সভয়ে দেখেন। তাঁরা প্রাণপাত ক'রে যে-শিল্পসামগ্রীর জন্ম দিয়েছেন, তার উপভোগও সমান আয়াসসাধ্য হোক, এইটাই তাঁদের স্বাভাবিক ইচ্ছা। (অতএব তাঁদের লুব্ধ দৃষ্টি সহজেই অষ্টাদশ শতকের দিকে ছোটে, যখন বেশির ভাগ মানুষই নিরক্ষর ছিলো বটে, কিন্তু যারা পড়তে জানতো, তারা অধ্যয়নকে স্বার্থসিদ্ধির ব্রহ্মাস্ত্র অথবা অনিদ্রানিবারণের মহৌষধ ব'লে ভাবতো না।) অবশ্য সেই চিৎপ্রকর্ষ যে-আভিজাতিক অধিকারভেদ ও নিরীহনিগ্রহের উপরে প্রতিষ্ঠিত, তার পুনরুজ্জীবনে এ-কালের আপত্তি আছে অথবা কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত ছিলো। তাহলেও গড্ডলিকাস্রোতে আত্মবিসর্জ্জনে কোনো আধুনিক লেখকই প্রস্তুত নন। তাঁরা বরং নির্ব্বাসনে যাবেন, তবু ভারতীর সভায় অনধিকার প্রবেশের অবকাশ রাখবেন না, এই তাঁদের দৃঢ় সঙ্কল্প।

ফলত সাম্প্রতিক সাহিত্যের অনেকখানিই ব্যাসকূট এবং বাকীটা শ্লেষ আর দুরুক্তি, যার উদ্দেশ্য নির্ব্বোধের দুঃসাহসকে আটকানো। প্রাণিজগতে তার উপমা খুঁজলে, আপনা থেকে মনে আসে সজারু আর শামুকের কথা, অথবা সেই প্রাক্‌পৌরাণিক কৃকলাস-জাতির, যারা বৈশিষ্ট্যের মোহে স্বভাববিচ্যুত হয়ে অবশেষে মৃত্যুবরণ করেছিলো। বলাই বাহুল্য যে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্যাপারটা এখনো এত দূর গড়ায় নি। এই অদ্বৈতবাদের দেশে জন্মেও আমাদের সুমনা সাহিত্যিকেরা কখনো ভোলেন নি যে শিল্প একটা বিনিময়ক্রিয়া, এবং ললিত কলার কল্পলোকে স্রষ্টার আসন যদিও সর্ব্বোচ্চে, তবু দ্রষ্টার স্থান তার নাতিনিম্নেই। কিন্তু জাতিগত সংস্কার শিশুশিক্ষার চেয়ে দুর্ব্বল; এবং আমাদের আধুনিক ভাবুকেরা যেহেতু পাশ্চাত্য আবহাওয়াতেই মানুষ, তাই তাঁরা সকলেই পূর্ব্বোক্ত অসামান্যতার ভক্ত। অবশ্য মাইকেলের সময়েও বিদেশী আদর্শই বাঙালী কবিদের অন্তঃপ্রেরণা জোগাতো। কিন্তু যন্ত্রসভ্যতার কল্যাণে মামুলী মানুষের অবসর-সঙ্কোচ সে-যুগে চরমে গিয়ে ঠেকে নি ব'লে, তখনো প্রত্যাখ্যান সৎসাহিত্যের ধাতে বসে নি; কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে পরিগ্রহণই ছিলো ভাবরাজ্যের মৌল বিধান।

তাই মাইকেলের অনুস্বর-বিসর্গবর্জ্জিত সংস্কৃত একখানা যে-কোনো অভিধানের সাহায্যেই আপামর সাধারণের বোধগম্য; অথচ প্রমথ চৌধুরী

মহাশয়ের নিতান্ত চল্‌তি বাংলা বহুভাষাবিদ্ পাঠকের অপেক্ষা তো রাখেই, এমনকি একাধিক বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হলে, বীরবলী সাহিত্যের গূঢ় তাৎপর্য্য অনাস্বাদিত থেকে যায়। তার মানে এ নয় যে চৌধুরী মহাশয় হরিজন আন্দোলনের বিরুদ্ধে, তার মানে শুধু এই যে প্রমথনাথ অর্জ্জিত বিদ্যাকে কাজে লাগাতে পারেন। তাঁর আজীবন অধ্যয়ন নামের পরে কতকগুলো নিরর্থ অক্ষরের বহর বাড়িয়েই থামে নি, পাণ্ডিত্য তাঁর সকারী ব্যক্তিস্বরূপের সমগ্রতাকে সমৃদ্ধতর ক'রে তুলেছে। কাজেই তাঁর রচনা স্বভাবতই সমধর্ম্মীর মুখ চায়; এবং তাঁর প্রতিভা ও সৌভাগ্য যেহেতু অল্প বাঙালীর ক্ষেত্রেই জোটে, তাই সমসাময়িকদের কাছে তিনি যে-শ্রদ্ধাঞ্জলি পেলেন না, তা হয়তো নিরবধি কালই তাঁকে দেবে। কিন্তু তিনি যদিও পাঠকের দরদে বঞ্চিত, তবু এখনকার লেখকমাত্রেই বোধহয় তাঁর অনুকম্পায়ী; এবং ধূর্জ্জটিপ্রসাদ-প্রমুখ যাঁদের সাহিত্যজীবন তাঁরই সংস্পর্শে বিকশিত, তাঁদের মনোভাবে বীরবলী ব্যক্তিবাদের প্রকোপ অন্তত আমার চোখে সুস্পষ্ট।

উপরে যা বললুম, তার সাক্ষ্যে ধূর্জ্জটিপ্রসাদের বিপক্ষে চিন্তাচৌর্য্যের অভিযোগখ্যাপন আমার অভিপ্রায় নয়। বরঞ্চ তাঁর অত্যধিক স্বাবলম্বনেই আমি ধাক্কা খাই; এবং আমার মতে তাঁর স্বাধীন ধ্যান-ধারণা সর্ব্ববাদিসম্মত যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না, তিনি সাধারণত ভাব থেকে ভাবান্তরে যান স্বকীয় অনুষঙ্গের পথে। ফলে তাঁর প্রবন্ধাদির সিদ্ধান্তে আমি অনেক সময়ে অগত্যা সায় দিই বটে, কিন্তু যে-প্রতিষ্ঠাভূমির পরে তাঁর বক্তব্য দাঁড়ায়, সেখানে প্রায়ই আমার পা পেছলায়। অর্থাৎ সাহিত্যে আমি নৈরাত্ম্যরীতির পক্ষপাতী; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আমার অনাস্থা এত গভীর যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাজ্ঞাপনের ব্যর্থ চেষ্টায় আমার কোনো উৎসাহ নেই; এবং অনুষঙ্গ যেহেতু নিজস্ব উপলব্ধির ধ্বংসাবশেষ, তাই তার সংসর্গ আমাকে স্বপ্নাবিষ্টই করে, নিঃসংশয় সত্যের সাক্ষাতে আনে না। সেইজন্যেই আমার বিবেচনায় এই নৈপথ্যপ্রকরণ প্রবন্ধে অচল, তার প্রয়োগ প্রশস্ত শুধু রসরচনাতে।

কারণ রস সম্ভোগের সামগ্রী; তার স্বরূপ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত হয়তো অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তার সংঘাতে অবিচল থাকা রসিকের পক্ষে দুষ্কর; এবং কাব্যাদি সাহিত্য যেকালে পাঠকচৈতন্যের উদ্বোধনেই সন্তুষ্ট, তখন আত্মরতিতে কবিতার তেমন ক্ষতি হয় না, যেমন হয় সত্যসন্ধানী প্রবন্ধের। অবশ্য সত্যও বিসংবাদের আশ্রয়; তার চতুর্দ্দিকে তার্কিকের এমন ভিড় যে অনেকের বিচারে কৈবল্য লোকযাত্রার লক্ষ্যই নয়, মনুষ্যসংসার হিতবাদী। তাহলেও সত্যের রাজ্যে আমি স্বপ্রাধান্যের প্রয়োজন দেখি না। হয়তো

আমার মনের গঠন প্রাগৈতিহাসিক ব'লে, আমি এখনো ন্যায়শাস্ত্রের উপরে বিশ্বাস রাখি; অন্তত তার নঙর্থক নির্দ্দেশে যে অসত্যকে চেনা যায়, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আসলে স্বতোবিরোধের অনুভূতি দেহীর পক্ষে অসম্ভব; এবং আমরা সকলেই যেহেতু দেহী, তাই অন্বীক্ষার এই প্রাথমিক নিয়মটি আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই অমোঘ। সুতরাং আকাশের প্রকৃত বর্ণ-সম্বন্ধে যতই বাদানুবাদ বাধুক না কেন, আকাশ যে একই সময়ে নীল আর অনীল নয়, এ-প্রসঙ্গে আবালবৃদ্ধবনিতা একমত।

কিন্তু ধূর্জ্জটিপ্রসাদ সমাজতাত্ত্বিক। তাই অপবাদ-ন্যায়ের নেতিবচনে তাঁর মন গলে না; তিনি এমন নির্ব্বিকল্প সত্য খোঁজেন যার শাসনে সমাজের বর্ত্তমান নৈরাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা আসবে। তত্রাচ ব্যাবহারিক-উপাধি সর্ব্বাগ্রে সামাজিক সত্যেরই প্রাপ্য; এবং আচার আর আসক্তি হরিহরাত্মা ব'লে, এ-বিষয়ে মতান্তর সহজেই মনান্তরে গিয়ে ঠেকে। কারণ এ-ক্ষেত্রে সত্য আর নিজ গুণে মর্য্যাদাবান নয়, অভিজ্ঞের অধ্যাসও তার প্রতিদ্বন্দ্বী। আমার জন্ম হয়তো দেহাতে; হোলির এক পক্ষ আগে থেকে বিশ-পঁচিশ জন গ্রামভায়ের সঙ্গে ভাঙের নেশায় মেতে, খোল-খত্তাল নিয়ে চীৎকার না করলে, আমি হয়তো আনন্দ পাই না। কিন্তু তাতে সঙ্গীতজ্ঞ প্রতিবেশীর কান ফাটবার উপক্রম হয়; তারা তখন লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসে। অথচ এখানে ন্যায়বিচারে উভয় পক্ষই সমবল; আমার আমোদ-আহ্লাদের অধিকার যেমন নিঃসন্দেহ, তাদের বিরক্তির হেতুও তেমনি তর্কাতীত। কাজেই বিবাদ বাধলেই, তুলামূল্যের কথা ওঠে; এবং পাড়াপড়শীরা বলেন যে তাঁদের চিৎপ্রকর্ষের ওজন যেকালে বেশি, তখন আমাদের দলে-ভারী মাৎলামি তাঁদের চোখরাঙানিকে মানতে বাধ্য।

এ-কলহে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ সেই অল্পসংখ্যক দলেই যোগ দেন। তাঁর উচ্চতর শিক্ষা-দীক্ষার জোরে তিনি পাঠোদ্ধার-সহকারে অনায়াসেই দেখান যে অধিকাংশ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও সাধক আমাদের মতো ইতর সাধারণকে তফাতে রেখে তাঁদের মতো উত্তম বিশেষকে ভজেছেন। কিন্তু স্বপক্ষে তিনি যতই সাক্ষী ডাকুন না কেন, তাঁরা যেহেতু প্রত্যেকেই আত্মোপলব্ধির গুণগানে শতমুখ, তাই সে-সকল জবানবন্দিতে আমার আত্মপ্রত্যয়ই প্রতিষ্ঠা পায়; এবং ধূর্জ্জটিপ্রসাদের বিনয় যে-পরিমাণে কমে, আমি ঠিক সেই অনুপাতে বুঝি যে তাঁর যুক্তিতে ফাঁক না থাকলে, তিনি কখনো প্রামাণ্য-সম্বন্ধে অতখানি নিশ্চয় হতেন না। সেইজন্যেই "আমরা ও তাঁহারা"-র বিজ্ঞানসম্মত মতামতেও আমি কান পাতি নি; এবং "চিন্তয়সি"-র সুচিন্তিত তত্ত্বসমূহ আমার প্রতিবাদ জাগিয়েছে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ

পরিচয় আছে ব'লেই জানি যে ওই বই-দুটির লেখক দাম্ভিক নন, যথার্থ মানবপ্রেমিক; সারা জীবন হিতৈষণার চেষ্টায় কাটিয়ে আজ যদি তিনি আমার মঙ্গল-সম্বন্ধে আমার চেয়ে বেশি বোঝার দাবি করেন, তবে সে-দাবি না মানতে পারি, কিন্তু তাতে ধৈর্য্য হারানো নিতান্ত মূর্খতা।

আসলে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ বুদ্ধিমান হলেও, বুদ্ধিসর্ব্বস্ব নন; তিনি হৃদয়বান ও আশুচেতন। তাই তাঁর সদ্য-প্রকাশিত উপন্যাসের * নায়ক খগেন বাবু শেষ পর্য্যন্ত আর অগাধ পাণ্ডিত্যে তুষ্ট রইলেন না, প্রজ্ঞাপারমিত সমর্পণেই আত্মদর্শনের ছেদ টানলেন। কিন্তু সমাপ্তি যদিও ভাবপ্রধান, তবু "অন্তশীলা"-য় ভাবালুতার নাম-গন্ধ নেই। জ্ঞান যে একটা কৃত্রিম প্রক্রিয়া, তার নির্দ্দেশে যে পরমার্থের সাক্ষাৎ মেলে না, এবং বুদ্ধিই যে সর্ব্বত্র বিরোধ বাধায়, এই বের্গ্‌সনী সিদ্ধান্তে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ পৌঁছেছেন বুদ্ধিরই পরামর্শে, আবেগের তাড়নে নয়। তবে বুদ্ধির সাধারণ্য একটা কিংবদন্তীমাত্র; অন্ততপক্ষে সব বুদ্ধিজীবীই বৈনাশিক নন; এবং মানুষের মধ্যে যেমন দেহ ও মনের দ্বিত্ব আছে, মনকে যেমন ভাব ও চিন্তায় ভাগ করা যায়, তেমনি বুদ্ধিও দ্বিমুখী, এবং তার একটা বিকলনে ব্যস্ত, অন্যটা সঙ্কলনে নিরত। ধূর্জ্জটিপ্রসাদের বুদ্ধি এই শেষ ধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু সঙ্কলন ন্যায়াতিরিক্ত কর্ম্ম। যে-সমগ্রতাকে ভগ্নাংশসংযোগে পাওয়া যায় না, তা অখণ্ড ভূমার মতো অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয়; বুদ্ধি শুধু তার দূত, তার সখা বোধি অথবা মরমী অনুভূতি। সম্ভবত সেইজন্যেই এই অন্তরঙ্গ উপন্যাসে বাস্তবতার বহিরাশ্রয় নেই; প্রাতিভাসিক প্রত্যক্ষজগৎ বিচ্ছিন্ন বুদ্‌বুদের মতো অন্তঃশীল চৈতন্যস্রোতের উপরে ভাসমান।

উপরন্তু চৈতন্য যেহেতু চির দিনই ব্যক্তিপ্রভব এবং অনুভূতি সর্ব্বত্রই সোহংবাদী, তাই আপাতত খগেনবাবুই যদিও গল্পের নায়ক, তবু প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্তাই পুস্তকখানির মুখপাত্র। কিন্তু ধূর্জ্জটিপ্রসাদের মন এমন অকপট, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ এত ব্যাপক, তাঁর অনুসন্ধিৎসা এ-রকম মর্ম্মস্পর্শী যে এই আত্মচরিতও আধুনিক জীবনযাত্রার প্রতীক হয়ে উঠেছে। খগেনবাবু ও তাঁর পার্শ্বচরিত্রগুলি আমাদের সকলেরই প্রতিভূ; তাঁদের মতোই আজকের মানুষ বিশেষ ও সামান্য, মস্তক ও হৃদয়, প্রেম ও প্রভুত্ব ইত্যাদি উভয়সঙ্কটের সম্মুখীন; এবং এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে আমরা অনেকেই তাঁদের বিপরীতগামী বটে, কিন্তু নির্দ্বন্দ্ব তাঁদের মতো আমাদেরও কাম্য। সেইজন্যেই কথাসাহিত্য হিসাবে বইখানার দু-চারটে স্খলন-পতন-ত্রুটি

---

* অন্তঃশীলা—শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত (ভারতীভবন, কলিকাতা)

থাকলেও, "অন্তঃশীলা"-কে আমি স্মরণীয় মনে করি। চিন্তাপ্রধান প্রবন্ধে মতপ্রকাশের সময়ে যে-স্বকীয়তার আতিশয্যে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ পাঠকের সমর্থন হারান, এখানে সেই ঐকান্তিক রীতিই পুস্তকটির মূল্য বাড়িয়েছে। কারণ সত্য যেমন সর্ব্বজনীন না হলে অগ্রাহ্য, তেমনি সার্থক অভিজ্ঞতামাত্রেই প্রামাণিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ; তার বিরুদ্ধে নাস্তিকের প্রতর্ক খাটে না; তাকে সবিনয়ে মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

এত বাগ্‌বিস্তারের অনেকখানিই হয়তো অনাবশ্যক। কিন্তু তার ফলে এ-কথা নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়েছে যে "অন্তঃশীলা" ঠিক শিশুপাঠ্য উপন্যাস নয়; বইখানি ভাবুকের জন্যে লেখা এবং ভাবুকের দ্বারা লিখিত। তাহলেও তার আখ্যানভাগ চমৎকার; এবং সাধারণ কথক যেখানে এসে থামেন, সেখানেই ধূর্জ্জটিপ্রসাদের প্রস্তাবনা। প্রথম পৃষ্ঠাতেই খগেনবাবুর চরম ট্র্যাজেডির উপরে যবনিকা নামে; তাঁর আত্মঘাতিনী স্ত্রী সাবিত্রীর সংকার শেষ ক'রে, তিনি এসে আশ্রয় নেন রমলাদেবীর বাড়িতে, যাঁর কুমন্ত্রণাই সাবিত্রীকে আত্মহত্যার পথে চলিয়েছিলো। এই থেকে যে-সম্পর্কের সূত্রপাত, তারই অন্তঃপ্রেরণায় খগেনবাবুর অহঙ্কৃত অবিদ্যা কাটে, এবং তিনি ক্রমশ বোঝেন যে সাবিত্রীর মৃত্যুতে একটা হাস্যকর নির্ব্বন্ধাতিশয্য থাকলেও, আসলে সে-দুর্ঘটনা তাঁরই অমানুষিক আদর্শের সঙ্গে মনুষ্যধর্ম্মের সাংঘাতিক সংঘাতপ্রসূত। তাঁর আদর্শনিকষে রমলাদেবীই খাঁটি সোনা আর সে নিজে রাংতা, সাবিত্রীর অবচেতনা এই সত্যটাকে অস্পষ্ট ভাবে জেনেছিলো ব'লেই, তাঁদের দাম্পত্যজীবন ভিতরে ভিতরে বিষিয়ে ওঠে; খগেনবাবুর মাসতুতো বোন, যার সম্বন্ধে ঈর্ষাই এই দারুণ দ্বন্দ্বের প্রকাশ্য কারণ, বস্তুত সে-বেচারা উপলক্ষমাত্র, অত্যন্ত নগণ্য ও অতিশয় নিরপরাধ।

সুতরাং খগেনবাবু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন, প্রথমটা রমলাদেবীর সংসর্গ থেকে পালিয়ে এবং শেষ কালে সুপ্রাচীন সাধকী পদ্ধতিতে বিঘ্নকে, বিপদকে কায়মনোবাক্যে মেনে নিয়ে। ফলে তাঁর ভারসাম্যহীন, বুদ্ধিগত, বিরস জীবন হঠাৎ অধ্যাত্ম সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে,—শুধু তাঁর একলার নয়, রমলাদেবী ও তাঁর পরম ভক্ত, আত্মত্যাগী সুজনেরও; এবং তাঁরা তিন জনে এই যন্ত্রঘর্ঘরিত বিংশ শতাব্দীতেই আবার নূতন ক'রে বোঝেন যে বিদেহ মিলন কেবল মরমীদের অসার স্বপ্ন নয়, দেহাত্মবাদী সাম্প্রতিক মানুষও সে-অঘটনসংঘটনে সিদ্ধহস্ত। এই অদ্বৈতসিদ্ধির পরে তাঁদের সকলের সংস্কারমুক্তি মিলবে কিনা, সে-সম্বন্ধে গ্রন্থকার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেন নি। তবে আমার বিশ্বাস যে অনন্তর তাঁদের অঙ্গ থেকে সমাজবন্ধনের নাগপাশ খ'সে পড়বে, এই রকম একটা ইঙ্গিতই "অন্তঃশীলা"-র উপসংহারে বর্ত্তমান।

কিন্তু আমার সারসংগ্রহে বইখানিকে রূপকের মতোই দেখাচ্ছে। তাই অবিলম্বে বলা দরকার যে এ-উপন্যাসের দার্শনিক ভূমিকা যাই হোক না কেন, গল্পটি উপাদেয় ও চরিত্রগুলি জীবন্ত। তবে উপাখ্যানের সম্পূর্ণ রস পাবেন তাঁরাই, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কথাসাহিত্য যাঁদের নখদর্পণে।

কেননা কাহিনীটিতে ঘটনাবৈচিত্র্য নেই, অবস্থানপরিকল্পনা কোনো অব্যর্থ পরিণতির ধার ধারে না, একটা সুচিন্তিত প্লটকে সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে ফুটিয়ে তোলা লেখকের উদ্দেশ্যই নয়; তিনি চান দুটি চরিত্রের বিকাশ ও বৃদ্ধি দেখাতে। অর্থাৎ নভেলের সংজ্ঞা-সম্বন্ধে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ আঁদ্রে মোরায়া-র সঙ্গে একমত; তাঁরা দু জনেই ভাবেন যে সাবেকী দৃষ্টান্তে কতকগুলো ছাঁচে-ঢালা প্রতিমার পুতুলনাচে জীবনের অনুকরণ ঔপন্যাসিকের কাজ নয়, তার কর্ত্তব্য স্বসমুখ পাত্র-পাত্রীর বিবর্ত্তনের ছবি আঁকা। এই চেষ্টায় ধূর্জ্জটিপ্রসাদ বিশেষ সাফল্য পেয়েছেন। অবশ্য লেখকের সঙ্গে খগেনবাবুর জীবনগত সাদৃশ্য না থাকলেও, চারিত্র্যগত ঐক্য যে খুব বেশি, তা পূর্ব্বেই বলেছি; এবং তাই হয়তো এই চিত্রের জন্যে অতিপ্রশংসা তাঁর প্রাপ্য নয়। কিন্তু রমলাদেবীর মতো গতানুগতিক বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা সত্যই বিস্ময়কর। এই দিক থেকে তাকালে, বইখানিকে একেবারে বাহুল্যবর্জ্জিত ঠেকে; আলেখ্যের কোনো রেখাই নিরুদ্দিষ্ট নয়, সকল আচরণই সার্থক, চরিত্রটি যেখানে পূর্ণতায় পৌঁছেছে, সেইখানেই পুস্তকের পরিসমাপ্তি।

খগেনবাবুর ছবিও সর্ব্বত্রই বিশ্বাস্য। ধূর্জ্জটিপ্রসাদের পাঠাভ্যাসের প্রসাদে তিনি মাঝে মাঝে হয়তো একটু ভারাক্রান্ত; কিন্তু লেখকের অন্যান্য রচনার এই দোষটাও এখানে গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তাদের সম্বন্ধে নায়কের উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা কোথাও অসামঞ্জস্য আনে নি; এমনকি তত্ত্বসঙ্কুল উদ্ধারগুলোও চরিত্রচিত্রণের উপাদান জুগিয়েছে। ধূর্জ্জটিপ্রসাদ খগেনবাবুর মারফৎ আমাদের জানিয়েছেন যে প্রুস্ৎ, জয়েস্, ভর্জিনিয়া উল্ফ্ ইত্যাদি অন্তর্মুখীন ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে তিনি সুপরিচিত। সে-খবর না পেলেও, তাঁর আদর্শ-সম্বন্ধে আমাদের ভুল ঘটতো না। কিন্তু তাহলেও "অন্তঃশীলা" বাংলা উপন্যাস; এবং বাঙালীদের মধ্যে একা ধূর্জ্জটিপ্রসাদই বোধহয় এই উপন্যাস-প্রণয়নে সক্ষম। আসলে অর্জ্জিত বিদ্যায় তিনি যদিও বৈদেশিক, তবু তাঁর প্রবৃত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে বিশুদ্ধ স্বদেশী; এবং বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রগাঢ় বটে, কিন্তু তিনি যে স্বভাবতই বিশ্লেষণবুদ্ধির অনুর্ব্বর মার্গের প্রতিকূল, তার ভূরি প্রমাণ "অন্তঃশীলা"-র প্রতি পৃষ্ঠায় বিদ্যমান। সেইজন্যেই আধুনিক কাল তাঁর কথকালির প্রশস্তি গেয়েই থামবে; তাঁর মতো দু নৌকোয় পা রেখে উভয়সঙ্কট পেরিয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব ও অবাঞ্ছনীয়।

"চোরাবালি"

শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে আমার বন্ধু; এবং আমি তাঁর ভক্ত—অন্ধ না হলেও, পক্ষপাতী। সুতরাং এ-প্রবন্ধ মোহপ্রবণ; একে একদেশদর্শী বলা তো ন্যায়সঙ্গত বটেই, এমনকি এর সার্থকতা সুদ্ধ তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু বিদূষণ আর কাব্যবিবেচনার মধ্যেও বিস্তর ব্যবধান; এবং অনুকম্পা কেবল সৌহৃদ্যের শ্রেষ্ঠ সম্বল নয়, সৎ সমালোচক যেকালে স্বভাবতই অনুকম্পায়ী, তখন বন্ধুবাৎসল্য বৈদগ্ধ্যের বাদ সাধে না, অনুরাগীর অশোভন উচ্ছ্বাস রসগ্রাহীর উপকারেই লাগে। উপরন্তু বিষ্ণু দের কবিপ্রতিভা অসামান্য ও অভিনব; এবং অপরিণত বয়স থেকেই তিনি যদিও সুপরিণত কাব্যসৃষ্টি ক'রে আসছেন, তবু তাঁর কলাকৌশল, অন্তত বাংলা সাহিত্যে, এমনি অপূর্ব্ব যে শ্রদ্ধা ও সদ্ভাব ব্যতীত তৎপ্রণীত কবিতাগুলির যথার্থ মূল্যবিচার অসম্ভব। তবে দরদ যেমন উদীয়মানের পক্ষে লোভনীয়, তেমনি সমবেদনার অভাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠেরও সমূহ ক্ষতি; এবং সমানধর্ম্মীর সাক্ষাৎ আজ না পাওয়া গেলেও, অচির ভবিষ্যতে নিশ্চয় মিলবে, এই আশাতেই সকল কবি নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর গুণগানে শতমুখ। কারণ রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় একাধিকের ঐক্যজাত ব'লেই, রসাত্মক বাক্যের আধুনিক নাম সাহিত্য; এবং এই শব্দতত্ত্ব নিরুক্তকারের কাছে যতই অমূলক ঠেকুক না কেন, তবু সক্রেটিস্-এর মতে বক্তা ও শ্রোতার হৃদয়সংবেদ্য সহযোগ না ঘটলে, সৌন্দর্য্য কোন্ ছার, সত্যসন্ধানও পণ্ডশ্রম। বুঝি বা সেইজন্যেই কোল্‌রিজ্ দুরূহতার অস্তিত্ব মানতেন না; বরং তাঁর ধ্রুব বিশ্বাস ছিলো যে প্রকৃত কাব্যের অভিভাব পাঠকের অন্তরাত্মায় পৌঁছয় অর্থবোধের বহু পূর্ব্বে।

উপরে যা বললুম, তার পরে হয়তো এমন সন্দেহ মার্জ্জনীয় যে বিষ্ণু দের অভিনব কাব্য অভাবনীয় রকমে কণ্টকাকীর্ণ, এবং তিনিও আর পাঁচ জন সমসাময়িকের মতো স্বাতন্ত্র্য ও উৎকটতার মধ্যে ছেদ টানেন না, কাব্যামোদীর বুদ্ধিবিভ্রাট ঘটিয়েই আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন। কিন্তু এ-দিক থেকে তিনি নিতান্ত নিরপরাধ; এবং তাঁর মনীষা যেহেতু প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের যোগফল, তাই ব্যাসকূটের চর্ব্বিতচর্ব্বণ তাঁর কাছে নূতন লাগে না, পূর্ব্বাচার্য্যদের দেখে তিনি বোঝেন যে প্রবহমাণ ঐতিহ্যের ব্যক্তিগত বিকাশেই বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে। অবশ্য এই ঐতিহ্য কেবল বঙ্গদেশীয় নয়, বিশ্বমানবিক; এবং সেইজন্যে উনিশ শতকী ইংরেজদের যে-আদর্শ

রবীন্দ্রসাহিত্য তথা আধুনিক বাংলা কাব্যের ভূমিকা, শুধু তার নির্দ্দেশ মনে রাখলে, বিষ্ণু দের প্রসাদগুণ হয়তো আমাদের এড়িয়েই যাবে। কিন্তু রসরচনার স্বরূপ-সম্বন্ধে অনর্জ্জিত সংস্কার কাটিয়ে যাঁরা একবার স্বকীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছতে প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁদের আর বিন্দুমাত্র সংশয় থাকবে না যে কাব্যলক্ষ্মীর নির্ব্বিকার স্বভাবের সঙ্গে এ-কবির পরিচয় সত্যই অন্তরঙ্গ। ফলত বিষ্ণু দের তুল্য নিরাভরণ লেখক এ-দেশে বিরল, এবং তাঁর কাব্যে ছন্দ, মিল, উপমা, অলঙ্কার ইত্যাদির প্রযোগ তো সুমিত বটেই, এমনকি বিষয়মাহাত্ম্যে বা অর্থগৌরবে ভাবের স্বল্পতা তিনি কোথাও ঢাকতে চান নি, সার্ব্বজনীন অনুভূতির ঐকান্তিক অঙ্গীকারেই সাধারণ চিত্রকল্পাদির মধ্যে প্রাণস্পন্দ জাগিয়েছেন। অর্থাৎ বিষ্ণু দে জানেন যে প্রসঙ্গনির্ব্বাচনে সমভাব কবিচিত্তের প্রধান লক্ষণ, এবং নির্ভরের উচ্ছ্রিতি যদি কাব্যকে অমৃতলোকে পাঠাতো, তবে নবীন সেনের পাঠকসংখ্যা শেষ পর্য্যন্ত শূন্যে ঠেকতো না, অথবা হেরিক্-এর সমসাময়িক হেন্‌রি মূর আজ পুরাবিদের কৃপাজীবী হতেন না।

আসলে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব হয়তো বা রসপ্রতিপত্তির অন্তরায়; এবং লুক্রিশিয়াস্ ও দান্তে ছাড়া আর কোনো কবি তত্ত্ব আর কাব্যের অদ্বৈত ঘটাতে পেরেছেন ব'লে আমার অন্তত মনে নেই। সম্ভবত সেইজন্যেই দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হয়েও মালার্মে কবিযশঃপ্রার্থী দেগাস্-কে জানিয়েছিলেন যে কাব্যের উপাদান ভাবনা নয়, ভাষা; এবং সাহিত্যিক ভাষার স্বাবলম্বন যদিচ রিচার্ড্‌স্-এরই আবিষ্কার, তবু তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তীরাও মানতেন যে কবিতার অর্থ অভিধানসাপেক্ষ নয়, সার্থকতার নামান্তর। অবশ্য এ-অভিমতে অতিশয়োক্তির আভাস আছে; কারণ ভাষার উৎপত্তিতে ধ্বনির প্রাধান্য থাক বা না থাক, শব্দমাত্রেই যে সাঙ্কেতিক, তা এক রকম সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং কলাকৈবল্যের পুরোধারাও বিষয়ের সংক্রাম একেবারে এড়াতে পারেন না, খুব জোর, উপমার মায়া কাটিয়ে ঘন ঘন উৎপ্রেক্ষার শরণ নেন। তাহলেও বাগর্থ আর যাথার্থ্যের সম্পূর্ণ সমীকরণ অসাধ্য; এবং কালগুণে শব্দের ধাতুগত অর্থে তো ঘুণ ধরেই, এমনকি তর্কের খাতিরে অভিধার অবিনশ্বরতায় সায় দিলেও, এ-সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য ঠেকে যে স্বতন্ত্র শব্দ আর অন্বয়ী শব্দের বহিরাশ্রয় প্রায়ই পৃথক, এত পৃথক যে ন্যায়ত উভয়ের তাৎকাল্য অনেক ক্ষেত্রেই অচিন্ত্য। উদাহরণত আকাশকুসুম উল্লেখযোগ্য; এবং এ-পদার্থ যেমন অন্বীক্ষাশাস্ত্রের অনুসারে নিরুপাখ্য, তেমনি ভূতবিদ্যার মতে নীলাকাশেরও কোনো অস্তিত্ব নেই। সুতরাং সাত্ত্বিক কবিদের মধ্যে অত্যধিক বিষয়াসক্তির নিদর্শন বিরল; এবং তাঁদের দৈনন্দিন ক্ষুধা-তৃষ্ণা

অতিমর্ত্ত্য কল্পনার অসার উপজীব্যে কোনো দিনই মেটে না বটে, কিন্তু মরমী সাহিত্যের নিরন্তর ব্যর্থতা দেখে তাঁরা স্বভাবতই ভাবেন যে বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠার ব্যর্থ অনুকরণ কবির কর্ত্তব্য নয়, স্বাধিকারপ্রমত্ত শব্দসমূহের সামঞ্জস্যসাধনই তার আত্মকৃত্য।

এই কথাকেই ঘুরিয়ে বলা যায় যে ভাষা অভিধা ও অভিপ্রায়ের দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত; এবং প্রথমের পরাকাষ্ঠা যেমন গণিতে, দ্বিতীয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি তেমনি কবিতায়। অতএব কবিতার সঙ্গে সত্যাসত্যের আদান-প্রদান নেই, তার সম্বল সম্ভাব্যতা; এবং কবিমাত্রেই যদিও বোঝেন যে বিষয় ও বিষয়ীর অন্তঃপ্রবেশেই অভিজ্ঞতার উৎপত্তি, তবু একা বিষয়ী তাঁদের স্বভাবসিদ্ধ মমতা জাগায়। অর্থাৎ বিজ্ঞানোক্ত বিষয় সুদ্ধ শুধুই অনুমেয়, নিশ্চিত নয়; সে-বস্তু এ-রকম নিরুপাধিক যে, চৈতন্য কোন্ ছার, আমাদের সংবেদনাও প্রতিভাসের আজ্ঞাধীন; এবং সে-প্রতিভাস তো ব্যক্তিগত বটেই, এমনকি ব্যক্তিবিশেষের বেলাও একই প্রতিভাস এত বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার উদ্‌ভাবক যে মনস্তত্ত্বে কার্য্য-কারণের উল্লেখ পর্য্যন্ত হাস্যকর। কিন্তু কাব্যোপজীবিকার এই অনিত্যতার দরুণ অনাবাসিক কবিরা প্লেটোনিক্ গণতন্ত্রে অন্নজল পান বা না পান, এর ফলে নৈমিত্তিক সংসারে ক্ষতির চেয়ে লাভই তাঁদের বেশী। কারণ তাঁদের অন্তর-বাহিরের মধ্যে যখন হেত্বাভাসটুকুও অবর্ত্তমান, তখন গতানুগতিক পরিস্থিতির আশ্রয়েও তাঁরা প্রাক্তন অনুভূতির পুনরাবৃত্তি করেন না, প্রাচীন ও সার্ব্বজনীন প্রতীকগুলোকে অর্ব্বাচীন আত্মোপলব্ধির কাজে লাগান; এবং বিষ্ণু দের ক্ষেত্রেও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি,—নদী ও বন, মেঘ ও পর্ব্বত, সমুদ্র ও আকাশ, রাত্রি ও দিন ইত্যাদি চিরপরিচিত চিত্রকল্পাদির সাহায্যেই তাঁর স্বকীয় প্রেমানুভূতির অপূর্ব্ব দ্বন্দ্বসমাস সূচিত হয়েছে। উপরন্তু এজন্যে আমাদের ধন্যবাদই তাঁর প্রাপ্য, এখানে বিস্ময়প্রকাশের অবকাশ নেই; এবং মনোবিকলন-সম্বন্ধে যাঁদের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানও আছে, তাঁরাই জানেন যে অল্পসংখ্যক ভাবচ্ছবিই যেহেতু অনন্ত বিভাবের বাহক, তাই স্বপ্নের তাৎপর্য্যবিচারে মানস প্রতিমাদির বাহ্য রূপ নিতান্ত গৌণ, মুখ্য সেগুলোর অন্তঃসঙ্গতি ও অন্যোন্যসম্পর্ক।

দুর্ভাগ্যক্রমে উনিশ শতকের কবিরা এ-সত্য মনে রাখেন নি; চোখের সামনে বিজ্ঞানের অপ্রত্যাশিত বিস্তার দেখতে দেখতে, তাঁরা স্বভাবতই ভুলে গিয়েছিলেন যে স্বয়ং ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থ্ সুদ্ধ মহার্ঘ্য অভিজ্ঞতাকে কাব্যের মূলধন ভাবেন নি, রটিয়েছিলেন যে স্মৃতিসঞ্চিত আবেগের সুগ্রথিত ঊর্ণাজালেই কবিতালক্ষ্মী বাসা বাঁধেন; এবং বাঙালী কাব্যবিবেচকেরা সেই উনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র ব'লে, তাঁদের কাছে 'বলাকা'-র মূল্য

'ক্ষণিকা'-র চেয়ে বেশি। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের সাক্ষ্য তাঁদের বিপক্ষে; এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু ন্যায়বুদ্ধির নির্দ্দেশে রসবিচারে নামলে, শুধু লোকসাহিত্যকেই অসম্বদ্ধ লাগে না, চীন-জাপানের গাঢ়বদ্ধ ধ্রুপদেও অতিবস্তুবাদের খামখা খেয়াল ধরা পড়ে। সুতরাং সাধকের মতো কাব্যামোদীও বুদ্ধির অহঙ্কার ছাড়তে বাধ্য; এবং তাতে কৃতকার্য্য হলে, তথাকথিত জটিলতাও আর উপভোগের বাদ সাধে না, সমর্পণের ফলে লেখক-পাঠকের মধ্যে একটা ঐকান্তিক সালোক্য ঘটে। তখন বোঝা যায় যে ঐতিহ্যভ্রষ্ট উনিশ শতকেও অবলম্বনের স্পষ্টতা অথবা বিষয়ের প্রাধান্য কবিতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতো না, সে-মর্য্যাদা জোগাতো কবির ব্যক্তিস্বরূপ, যার সঙ্গে রচনারীতির সম্বন্ধ, অন্তত ফরাসীদের মতে, হরি-হরের চেয়েও নিবিড়। ফলত সে-দেশের অভিধানে নূতন শব্দের অব্যাহত প্রবেশ নিষিদ্ধ, সেখানকার সাহিত্যে নূতন বাক্যবিন্যাসের অবাধ স্বাধীনতা অনাবশ্যক; এবং তৎসত্ত্বেও কর্নেই আর রাসীন্ এক নন, তাঁদের তুলনায় ব্রাউনিং ও টেনিসন্-এর সাদৃশ্য অনেক বেশি। হয়তো সেইজন্যেই ওয়র্ড্স্ওয়র্থ্ আর শেলি উভয়ে একই ভরদ্বাজ-পক্ষীর বিষয়ে কবিতা লিখে অতখানি মূলগত পার্থক্যের পরিচয় দিয়েছিলেন; এবং যুবাসুলভ পদস্খলন যেমন প্রথমোক্তকে বকধার্ম্মিক বানিয়েছিলো, তেমনি শেষোক্তের কৈশোরিক উচ্ছৃঙ্খলতা শেষ পর্য্যন্ত ধরেছিলো বিশ্ববিদ্রোহের রূপ।

তৎসত্ত্বেও ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে জন্মান্তরীণ রহস্যের কোনো যোগ নেই; আমাদের স্বাতন্ত্র্য যেহেতু পরাধীন শিক্ষা আর যদৃচ্ছালব্ধ সংস্কারের ফল, তাই শত চেষ্টাতেও মানুষ কমঠবৃত্তি বজায় রাখতে পারে না; তার সকল ক্রিয়া-কর্ম্মে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ছাপ পড়ে। সুতরাং আত্মসন্ধানী কবিরা কলাকৈবল্যের প্রয়াসী নন; তাঁরা বিষয়বিমুখ শুধু এই জন্যে যে বস্তুবিলাসের আধিক্য বিশ্ববীক্ষার পরিপন্থী, এবং সাহিত্য আর সমাচারদর্পণের সাদৃশ্য নগণ্য। কবি বরঞ্চ প্রত্নাস্থিবিদের সঙ্গে তুলনীয়, যিনি এক টুকরো শিলীভূত কপালে কল্পবিশেষের সমগ্র জীবনেতিহাস দেখেন; এবং এ-কথা না ভুললে, আধুনিক কাব্যের আপাতবিলগ্ন প্রকাশপদ্ধতিকেও আর প্রলাপের মতো শোনায় না, বোঝা যায় যে স্বয়ংসিদ্ধ বিকল্পনা সুদ্ধ পাকে-প্রকারে সাধারণ্যেরই অংশভাক। অর্থাৎ কবি যখন তাঁর ভাবনা-বেদনা তথা পঠন-পাঠনের জন্যে পারিপার্শ্বিকের মুখাপেক্ষী, তখন অপ্রাসঙ্গিক উল্লেখেও তিনি তাঁর ঐকান্তিক অধিগম ঘোষণা করেন না, খুব জোর, সাময়িক চিৎপ্রকর্ষের সীমারেখা টানেন। এমনকি জ্ঞাতসারে সমাজের সর্ব্বনাশ সাধলেও এই সামান্য বিধির হাত থেকে নিস্তার নেই; কারণ

দার্শনিকদের মতে অভাবও সদর্থক, এবং আজ পর্য্যন্ত নেতিবাদ শুধু ব্রহ্মবিদ্যার নান্যপন্থা বটে, তবু ন্যায়ত অবিরোধ আর অদ্বৈতের মধ্যে আকাশ-পাতালের ব্যবধান। কাজে কাজেই পলায়নে প্রাণরক্ষা কবির পক্ষে অসম্ভব, এবং বৃদ্ধ বয়সে মনের পাপ যেমন শুচিবায়ুতে ফুটে বেরোয়, তেমনি ওয়াইল্ড্-এর মতো সংসারসেবীরাই উর্দ্ধশ্বাসে শিল্পশুদ্ধির গুণ গায়। কিন্তু তাতেও বিষয়ের উপদ্রব থামে না; লেখকের দিক থেকে যতই আপত্তি থাক না কেন, অবশেষে প্রকৃতিই প্রতিশোধ নেয়, এবং লোকযাত্রাই সর্ব্বত্র জেতে। তবে কাব্যবস্তু সব সময়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, প্রায়ই তন্মাত্র-পদবাচ্য; এবং সেইজন্যেই কাব্যের আবেদন যুগধর্ম্মের নামাঙ্কিত হয়েও যুগে যুগে বদলায়, আর ধরা পড়ে যে কবিজনোচিত মাত্রাজ্ঞান সমালোচক-শোভন মূল্যজ্ঞানেরই নামান্তর।

কারণ বিষয়াতিরিক্ত কাব্যচর্য্যা আর নৈর্ব্যক্তিক পুরুষসিদ্ধি আপাতত একই পর্য্যায়ের ব্যাপার; এবং চিত্তবৃত্তিনিরোধেই যেমন আত্মসমাহিতি আসে, তেমনি সাময়িক নির্ভর ঘুচিয়ে স্বগত আবেগে পৌঁছতে পারলেই, কবিতা সার্থক হয়। আমার বিশ্বাস বিষ্ণু দের শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহে এই আর্য্যসত্যের অমর্য্যাদা ঘটে নি; এবং সকল কর্ম্মপ্রবৃত্তির মতো তাঁর কবিপ্রতিভাও অবস্থাগতিকেই জাগে বটে, কিন্তু সে-উত্তেজনার তাড়নে তিনি আত্মজীবনী লিখতে বসেন না, এমন একটা ব্যাপক পরিস্থিতি খোঁজেন যাতে শুধু স্বকীয় অনুভূতির স্বাক্ষর থাকে না, অনুরূপ অভিজ্ঞার আরো অনেক স্তর বিনা বিবাদে প্রশ্রয় পায়। অবশ্য এতাদৃশ ব্যাপ্তির চতুঃসীমা স্বভাবতই অনিশ্চিত; এবং এর পরিকল্পনা যত না কষ্টকর, এর সম্যক উপলব্ধি ততোধিক দুঃসাধ্য। উপরন্তু বিষ্ণু দের আদর্শ আর আচার সর্ব্বত্র সমতালে চলে না; কাব্যকে তিনিও কালে-ভদ্রে আত্মবিজ্ঞাপনের কাজে লাগান, সুলভ করতালির লোভ তাঁর ধ্যান-ধারণাতেও ক্বচিৎ-কদাচিৎ বিঘ্ন আনে, অধীত বিদ্যা, অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা ও অভীষ্ট সঙ্কল্পের সংমিশ্রণ শ্রমসাপেক্ষ জেনে তিনিও মাঝে মাঝে চকিত চাতুরীর শরণ নেন। কিন্তু যেখানে তিনি সত্যই সফল—এবং সে-রকম কবিতাই "চোরাবালি-"তে* বেশি, সেখানে তাঁর প্রতিযোগী নেই; এবং সে-সমস্ত রচনা যদিও একাধিক বার একাগ্রতা-সহকারে পাঠ্য, তবু সেগুলি এতই রসোত্তীর্ণ যে পারদর্শী পাঠকেরা উপভোগের আতিশয্যে নিশ্চয়ই পথকষ্ট ভুলে যাবেন। তাঁরা তখন বুঝবেন যে বিষ্ণু দের দায়িত্বপূর্ণ লেখনী অসার আত্মপ্রকাশের গরজে অস্থির নয় ব'লেই, তাঁর লেখা অল্পবিস্তর অসরল। উত্তরসঙ্গম বিষাদের

---

* চোরাবালি—বিষ্ণু দে প্রণীত (ভারতীভবন, কলিকাতা)

বশেও তিনি যেহেতু আত্মপ্রবঞ্চনার বিষয়ে মাথা ঘামান না, স্ত্রী-সহবাসের সঙ্গে ব্রহ্মসাযুজ্যের সুপ্রসিদ্ধ তুলনা স্মরণ ক'রে, হেসে ওঠেন, তাই তাঁর কাব্যে প্রেমের মতো একনিষ্ঠ হৃদয়াবেগ সুদ্ধ সমাজ ও সভ্যতার রঙ্গভূমি।

প্লেটো তো পড়েছি, তবু
বুঝিনি কো সুরেশের
মানস জীবন।
সে কি খুঁজে খুঁজে ফেরে
এ সহরে
খোঁপার ছায়ায়
কেশগুচ্ছ কানে কানে
চুড়ির নিক্বণে
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে, হাতে হাত ভিড়ে
ডিয়োটিমা? সক্রাটিস্ খুঁজেছে যেমন?
কি বলেন বর্ট্রাণ্ড্ রসেল্?
মার্কিনী বেন্ লিন্‌সে বা?
ছিল দুই কবি, দুই (যতদূর জানি
প্রকাশ্যে) কুমার—
ওঅর্ড্‌স্‌ওঅর্থ্ আর কোল্‌রিজ্
তাদের বাঁচাল, পথ দেখাল যেজন
অষ্টদশ শতকের ক্লেদসিক্ত বুদোআর, বিপ্লবের
দাবদাহ থেকে,
জাগ্রত নয়ন, মন প্রজ্ঞাসুকুমার,
নাম তার—
শ্লেগেল হেগেল নয়,
ডরথিই নাম জানি তার।
ডরথি যে নেই এই লিলি রমা অলকার ভিড়ে,
গ্রামোফোন-সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে বিচিত্র সন্ধ্যায়,
গোধূলিমায়ায় মুগ্ধ মোটরের সিটে,
চুম্বনতাড়নাকম্প্রবায়ু সিনেমায়
মেলে নাকো ডিয়োটিমা, তার কিছু আছে কি প্রমাণ?
(শিখণ্ডীর গান, পৃষ্ঠা, ৭৩-৭৪)

এই সংক্ষিপ্ত সামন্তীকরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'ওফেলিয়া'-নামক কবিতা; এবং সেটি প'ড়ে নেপথ্যবিলাসীর কৌতূহল মিটুক বা না মিটুক, অভিজ্ঞ পাঠক নিশ্চয় তার রসবৈচিত্র্যে মজবেন। কারণ বাহ্যত 'ওফেলিয়া' যদিচ

গীতি-কবিতার শ্রেণিভুক্ত, তবু তার ভাববিস্তার একখানা পঞ্চাঙ্ক নাটকের উপযোগী ; এবং তাতে কবি শুধু প্রেমিকসাধারণের সুদীর্ঘ জীবনকাহিনীর সারসংগ্রহ করেন নি, সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখিয়েছেন যে এ-রূপকথার বিয়োগান্ত পরিণতির জন্যে কোনো পক্ষই অপরাধী নয়, সমাজবাসী জীবমাত্রেই প্রাক্তন পাতকের উত্তরাধিকারী ব'লে, ট্র্যাজেডি এখানে অবশ্যম্ভাবী। তত্রাচ দিনানুদৈনিক সংসারযাত্রায় ট্র্যাজেডির প্রবেশ নিষিদ্ধ ; সেখানে শোচনীয় ঘটনার অন্ত নেই বটে, কিন্তু সে-সকল দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মানুষ কার্য্য-কারণের সন্ধান পায় অথবা ত্রুটিসংশোধনের উপায় শেখে ; যে-চিত্তশুদ্ধির লোভে দর্শক বারম্বার ট্র্যাজেডিসন্দর্শনে ছোটে, প্রাত্যহিক শোকে-তাপে সে-অন্তর্বেদনার অবকাশ মেলে না। সেইজন্যেই ট্র্যাজেডির নায়ক-নায়িকারা বস্তুত নাট্যকারদের নিগূঢ় উপলব্ধির মুখপাত্র হলেও, সকলেই বিনা ব্যতিরেকে অলৌকিক মহিমার অংশীদার ; এবং বিষ্ণু দের ওফেলিয়া-ও যেহেতু কোনো প্রকৃতিকৃপণা পার্থিবা নন, সার্ব্বভৌম বিপ্রকর্ষের প্রতীক, তাই তাঁর সঙ্গে কবি নিজে কথা কন নি, অতিমর্ত্ত্য হ্যাম্লেট্-এর মধ্যস্থতা মেনেছেন। ফলত তাঁর ব্যক্তিগত অভাববোধের গোষ্পদে শেক্স্‌পীয়র-এর বিশ্বমানবিক ছায়া তো পড়েছেই, তাছাড়া হ্যাম্লেটী রহস্যের ঘনান্ধকারে আরো একটা আকাশপ্রদীপ জ্ব'লে উঠেছে তাঁরই প্রযত্নে। অবশ্য এই নূতন আলোকের তৈল ও সলিতা জুগিয়েছেন ফ্রয়েড্ আর উইল্‌সন্ নাইট্। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে বিষ্ণু দের কৃতিত্বও কিছু কম নয় ; দীপাধারটি একেবারেই তাঁর নিজস্ব ; এবং যিনি অধ্যয়ন-রূপ পরচর্চ্চাকালেও স্বধর্ম্ম ভোলেন না, তাঁর অবৈকল্য স্বতই নিঃসংশয়।

মরণে মোরা করিনি জয়, জীবনে বাহুডোরে
অতনুরতি বাঁধি নি আজো মোরা।
বিদায়রবি-রক্তালোকে, শিশিরসিত ভোরে
অনির্ব্বাণ তবুও পথে ঘোরা॥

* * *

মুক্তি-ইসারা নয়নে তোমার দূরবিহঙ্গ নভোবিহার,
শান্তিতুষার মুঠিতে তোমার, ছড়াও বারেক বৃষ্টিধারে।
হৃদয় ওড়াও আকাশে, জীবন হোক তুষার॥

* * *

উদ্ধত প্রেম উদ্ধৃত হাতে আনো।
সন্ধ্যা-আকাশে বৈশাখী হাসে
মরণমায়ারে হানো॥
এনেছিলে বটে হাসি।

মেঘের রেশমী আড়ালে দেখি নি
বজ্রের যাওয়া-আসা।
অমরাবতীর দৈব প্রাচীর চূরমার হল মর্ত্ত্যলোকেই !
ধূমকেতু এই বিরাটদাহন বিশ্ব আমার তোমার চোখেই
পেয়েছিল তার পরমাগতি।

(ওফেলিয়া. পৃষ্ঠা, ২৬-২৭)

সত্য বলতে কি, এ-রকম নৈরাত্ম উপকরণে এতখানি স্বকীয়তার সৃষ্টি আমার পরিচিত অন্য কোনো কবির সাধ্যে কুলয় না; এবং এই অনন্য পদ্ধতির পরাকাষ্ঠা 'ক্রেসিডা'-শীর্ষক কবিতায়। কেননা এখানে তিনি বাদী, বিবাদী ও অনুবাদী ভাবের নাটকীয় প্রতিসাম্য ঘটিয়েই সন্তুষ্ট হন নি, যে-প্রশস্ত পরিমণ্ডল গ'ড়ে তুলেছেন, তার মধ্যে চসর, হেনরিসন ও শেক্স্‌পীয়র তুল্যমূল্য। উপরন্তু শুধু করকৌশলপ্রদর্শনের জন্যে তিনি এ-অসাধ্যসাধনের প্রয়াস পান নি; তাঁর প্রণয়সংক্রান্ত ভাবনা-বেদনা প্রবর্দ্ধমান ব'লেই, উক্ত মহাকবিদের প্রত্যেককে পৃথক ভাবে তাঁর অসম্পূর্ণ লেগেছে। প্রিয়ার কৃপাকটাক্ষে পৃথিবীবিস্মরণ এখন তাঁর কাছে লজ্জাকর ঠেকে, তিনি আর মানতে প্রস্তুত নন যে বাঞ্ছিতার আত্মদানে ভবব্যাধির জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়োয়; এবং সেইজন্যেই ক্রেসিডা-র বিশ্বাসঘাতকতায় শেক্স্‌পীয়রী মুমূর্ষা তাকে আর টানে না, চসরী জিজীবিষায় প্রতিপক্ষের অস্ত্রাঘাত থেকে বেঁচে তিনি আবার সংসারধর্ম্মে মন দেন। তবে স্মৃতির দৌরাত্ম্য অত সহজে থামে না; তৎসত্ত্বেও নবোঢ়ার বহুবন্ধনে ক্রেসিডা-র ছায়ামূর্ত্তি মাঝে মাঝে তববারিবৎ বাজে, এবং তখন অর্দ্ধসভ্য জাতিদের মতোই তাঁর বিচারেও প্রেম ও যুদ্ধের তফাৎ থাকে না, তিনি ভেবে বসেন কুরুক্ষেত্রের সর্ব্বনাশ বুঝি সে-সর্ব্ববল্লভার মধ্যে মূর্ত্তিমান। কিন্তু বিষ্ণু দের মতে ট্রয়লাস্-এর এ-মতিভ্রম শোকাবহ নয়, তার আসল ট্র্যাজেডি এই যে অগ্নিপরীক্ষা পেরিয়েও সে মহাকালেরই ক্রীড়নক, এবং সময়ে মানুষের মূল্যজ্ঞান বাড়ে না, তার স্মরণশক্তিই কমে। সেইজন্যে উপসংহারে তিনি হেন্‌রিসন্-এর পদাঙ্কে চলেছে।; এবং সে কবি যদিচ নীতির খাতিরেই ক্রেসিডা-কে কুষ্ঠরোগে ভুগিয়েছিলেন, তবু বহু বৎসর বাদে পাত্র-পাত্রীর পরিচয়হীন সাক্ষাৎকারে বিষ্ণু দে বোধহয় এই সত্যই প্রত্যক্ষ করেছেন যে প্রাণযাত্রায় প্রত্যাবর্ত্তন নেই, এবং অভ্যাসবশে আমরা ক্রমাগত পিছনে তাকাই বটে, কিন্তু কার্য্যত পুনরুজ্জীবিত অতীতের সাদর সম্বর্দ্ধনা মর্ত্ত্যবাসীর স্বভাববিরুদ্ধ।

তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ করে' দেবে ?
উদ্বায়ু আজো হয় নি আমার মন।

লোকায়ত মোর স্বেচ্ছাবর্মে লেগে
বর্শা তোমার হয়ে গেল খান্‌-খান্‌ ॥

*　　　　*

পাহাড়ের নীল একাকার হল ধূসর মেঘের স্রোতে
পাঁচ পাহাড়ের নীল।
বাতাসেরা সব বাসায় পালাল মেঘের মুষ্টি হতে।
স্তব্ধ নিথর পাঁচ-সায়রের বিল ॥

*　　　　*

তুমি চলে গেলে মরণমারীচ মায়াবীর ডাকে মূক
বধির ওষ্ঠাধরে।
তারপরে এল রণমন্থনে দূর বিদেশের নারী।
কালো সন্ধ্যায় দিল শ্বেতবাহু দুটি—
স্মরণ তোমার হানে আজো তরবারি ॥

(ক্রেসিডা, পৃষ্ঠা, ৯১-৯২)

বলাই বাহুল্য যে কবিতামাত্রেই অনির্ব্বচনীয়; অন্ততপক্ষে তার গদ্য ব্যাখ্যা অসম্ভব; এবং আমার মতে 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা' যেহেতু উৎকৃষ্ট কাব্য, তাই সে-দুটির মর্ম্মোদ্‌ঘাটন আমার অভিপ্রেত নয়, আমি সে-সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াই এত ক্ষণ ব্যক্ত করেছি। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া ব্যক্তিগত বিদ্যা-বুদ্ধির মুখাপেক্ষী; এবং যে-পাঠকের পড়া-শুনা আমার চেয়ে বেশি, তিনি কবিতা-দুটির মধ্যে আরো অনেক কিছু খুঁজে পাবেন। কারণ নৃতত্ত্ব বা নব্য মনোবিজ্ঞানের বিষয়ে অজ্ঞতাবশত আমি যদিও কবিতাদ্বয়ের উপরে উক্ত দুই শাস্ত্রের প্রভাবনিরূপণে অক্ষম, তবু এ-কথা আমারও সুবিদিত যে বিষ্ণু দের মতো এলিয়ট্‌-ভক্ত কখনো নিছক অন্তঃপ্রেরণার তাড়নে কাব্য লেখেন না, ভাবাবেশের উপযোগী বহিরাশ্রয়ের সন্ধানে আধুনিক সংস্কৃতির দিগ্বিদিক বেড়িয়ে আসেন। এ-অবস্থায় কালে-ভদ্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে তিনি বাধ্য; এবং আমার বিবেচনায় 'অপস্মার'-কবিতাটির উপভোগার্থে মৃগীরোগের জন্মবৃত্তান্ত তো অনাবশ্যক বটেই, এমনকি সে-ব্যাধির প্রসঙ্গে ক্রেৎস্‌মার-এর মন্তব্য জানার পরেও রতিজনিত আত্মবিস্মরণের সঙ্গে বিচিত্রবীর্য্য বা দশরথের আত্মীয়তা ধরা পড়ে না।

কোনো গোরোচনা গোরী কি
বাঁধে নি চরণে পরাণে ?
শোনো নি কি ঘুমপাড়ানি
জরৎকারীর শিথানে ?

হিংস্র অভাব হরি' কি
আলাদীন দীপ জ্বালে নি ?
কোনো বিচিত্রবীর্য্য কি
পূর্ব্বজ কোনো দশরথ
রাজযক্ষার ক্ষয়ভার,
জায়ুজ ব্রণের ক্ষয়পথ
দায়ভাগে নির্লজ্জ কি
রেখে গেছে পিছে উপহাব ?
তাই কি ঘুমের নীলিমা
বৈতরণীতে চেয়েছ ?
পলে পলে প্রাণ-পরাভব।
মরীচিকা-ফাঁকা ত্রিসীমা !
তাই কি রক্তে চেয়েছ
রসাতলব্যাপী নীল হিম
অপস্মারেবই বিপ্লব ?

(অপস্মার, পৃষ্ঠা, ৫৯)

তবে এতাদৃশ অপরিপাক বিষ্ণু দের পক্ষে অস্বাভাবিক ; এবং যেখানে তিনি সত্যসত্যই সফল, সেখানে তাঁর চর্য্যা ও চর্চ্চা একাগ্র, বোধি ও ব্যুৎপত্তি ঐকান্তিক, অন্তর ও বাহির অভিন্ন। তখন তাঁর পাণ্ডিত্যকে আর অবান্তর লাগে না, দর্শন-বিজ্ঞানের প্রত্যয়াদিতে স্বদ্ধ উপমার উপলক্ষণ জাগে ; এবং অনন্তর অনভিজ্ঞের জ্ঞানচক্ষু খুলুক বা না খুলুক ; প্রজ্ঞাপারমিত অনুষঙ্গের আহ্বানে অন্তত অনুকম্পায়ীরা নিষ্কুণ্ঠ চিত্তে সাড়া দেয়। এই ইন্দ্রজালের সর্ব্বপ্রধান নিদর্শন 'চোরাবালি'-কবিতা ; এবং যাঁদের কাছে য়ু-প্রমুখ পুরাণবিদেরা নামমাত্র, তাঁরাও বুঝবেন যে চোরাবালি আর ঘোড়সওয়ার শুধু রিরংসার রূপক নয়, তাদের উপরে প্রকৃতি-পুরুষ বা ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধারোপ সহজ ও শোভন।

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার ?
দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী ! বর্শা তোলো।
কেন ভয় ? কেন বীরের ভরসা ভোলো ?
নয়নে ঘনায় বারে বারে ওঠা-পড়া ?

চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি ?
হৃদয়ে আমার চড়া ?
অঙ্গে রাখি না কাহারো অঙ্গীকার ?
চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।
এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া ?
মৃগতৃষ্ণিকা দূরদিগন্তে ডাকি ?
আত্মাহুতি কি চিরকাল থাকে বাকি ?
জনসমুদ্রে উন্মথি কোলাহল
ললাটে তিলক টানো।
সাগরের শিবে উদ্বেল নোনাজল,
হৃদয়ে আধির চড়া।
চোরাবালি ডাকি দূরদিগন্তে,
কোথায় পুরুষকার ?
হে প্রিয় আমাব, প্রিয়তম মোর !
আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর,
অঙ্গে আমাব দেবে না অঙ্গীকাব ?
হালকা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো।
সাত সমুদ্র চৌদ্দ নদীর পার—
হালকা হাওয়ায় হৃদয় দু'হাতে ভরো,
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার।
পাহাড় এখানে হালকা হাওয়ায় বোনে
হিমশিলাপাতঝঞ্ঝার আশা মনে।
আমার কামনা ছায়ামূর্ত্তির বেশে
পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে।
কাঁপে তনু বায়ু কামনায় থরো থরো।
কামনার টানে সংহত গ্লেসিআর।
হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো।
হে দূরদেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার॥

(চোরাবালি, পৃষ্ঠা, ২১-২২)

কিন্তু বিষ্ণু দে কেবল এক রকম কাব্য লেখেন নি; এবং আমার রুচি সঙ্কীর্ণ ব'লে আমি যদিও তাঁর নানার্থব্যঞ্জক কবিতা-কটির সম্বন্ধে এত বাক্য-ব্যয় করলুম, তবু স্বচ্ছ ও ঋজু কবিতার সংখ্যাই বর্ত্তমান পুস্তকে বেশি। তবে সেগুলির প্রসঙ্গে কালক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন; এবং সেখানেও বিষ্ণু দের নাট্যরচনা নিরতিশয় সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু সে-নাটক যেহেতু প্রায়ই

ঐতিহাসিক, নচেৎ প্রহসন-জাতীয়, তাই তাতে শ্লেষ-বক্রোক্তির প্রাচুর্য্য থাকলেও, অর্থবৈচিত্র্য বা বিষয়াতিক্রমের অবকাশ অত্যল্প। সম্ভবত সেইজন্যেই সে-সকল কবিতা আমাকে অপেক্ষাকৃত কম টানে; এবং যথাযথ সমাজচিত্রে আমি যত আনন্দই পাই না কেন, আমার টুয়টনী মন কোনোমতেই সামান্যী-করণের মোহ কাটাতে পারে না, ক্রমাগত পটভূমির পানে তাকাতে তাকাতে, অবশেষে ছবির অস্তিত্ব সুদ্ধ ভুলে যায়। অবশ্য পরিপ্রেক্ষিতই সামাজিক নক্‌সার প্রাণ-স্বরূপ; এবং 'শিখণ্ডী', 'কবিকিশোর' ইত্যাদি ব্যঙ্গকবিতাতেও বিষ্ণু দে নর-নারীর আপতিক সংস্থান দেখে হাসেন নি, তাদের মানসিক অসঙ্গতিই তাঁর বিদ্রূপ জাগিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্মরণীয় যে ক্রেসিডা বা ওফেলিয়া-র মতো এই নিঃসম্বল লিলি-রমা-অলকার ভাগ্যে বিষ্ণু দের করুণাকণা জোটে নি; তিনি জানেন না অথবা জেনেও মানেন 'না যে এদের দৈন্যেও একটা জাগতিক নিয়ম ক্রিয়াশীল; এবং ফলে এরা তাঁর বিশ্ববীক্ষার দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে নি, শুধুই জুগিয়েছে তাঁর নেতিবাচক অবজ্ঞার উপলক্ষ। উপরন্তু এই তাচ্ছিল্য-সম্বন্ধে তিনি নিজেও নিশ্চিন্ত নন; তাঁর উপেক্ষা অনেক সময়েই অহৈতুক আত্মশ্লাঘার উপায়মাত্র; এবং সেই কারণে তিনি যখন উন্নাসিক ভেদবুদ্ধির প্ররোচনায় সুরেশাদির সংসর্গ ছেড়ে স'রে দাঁড়ান, তখনো তাঁর দুরুক্তি যেন খেদোক্তির মতো শোনায়, বোঝা যায় না তিনি কখন হাসছেন, কাঁদছেনই বা কখন।

প্রতিটি মুহূর্ত্তে মোর মূর্ত্তি পায় তিক্ত রসহীন
দুর্ব্বসা বিশ্বের ক্রূর সর্পফণা অশ্রান্ত কৌতুক।
সূর্য্য দেয় অর্থহীন স্বচ্ছ তার বিদ্রূপ যৌতুক,
রাত্রিশেষে নিদ্রাহীন চুম্বনের জ্বালা হানে দিন।
ভুলে গেছি কিবা ভুল—দিন মোর ক্লান্ত হতাশ্বাস
হেমন্তের কুষ্ঠরোগে গতপত্র অরণ্যের মতো।
প্রত্যহ প্রভাতে জানি দিন মোর ব্যর্থতা-আহত
মিলাবে রাত্রিতে বৃথা,—এ জীবন এক দীর্ঘশ্বাস।
দীর্ঘিকায় ভাসিলাম—তোমাদের তরঙ্গের মাঝে,
খাণ্ডবদাহের ক্ষত জুড়াল না হায় নারী, হায়!
কাজলগভীর মৃগনয়নের ঘন পক্ষ্মছায়ে
প্রাণবহ বসন্ত তো নাহি এল শ্যামপত্রসাজে
শীতমরুচিত্তে মোর নিঃশ্বাসের চৈতালী হাওয়ায়।

(কবিকিশোর, পৃষ্ঠা, ৪৬-৪৭)

পক্ষান্তরে কলাকৌশলের দিক থেকে তাঁর এই কবিতাগুলি প্রায়

অনবদ্য; এবং গম্ভীর কাব্যেও তিনি অসাধারণ ছন্দনৈপুণ্য দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু শৃঙ্খলা ও স্বাচ্ছন্দ্যের অপরূপ সমন্বয়ে তাঁর লঘু কবিতাবলী অঘটনসংঘটনপটীয়সী। ফলত তাঁর পদ্য সর্ব্বত্র অকাট্য নিয়ম মেনেও কোথাও আড়ষ্ট নয়; তার সঙ্গে যেমন সংস্কৃত পদ অনায়াসে খাপ খায়, তাতে তেমনি ইংরেজী শব্দও অশ্রাব্য শোনায় না; এবং তথাকথিত 'গদ্য কবিতা' তাঁর হাতে অদ্ভুত সংযমের সাক্ষ্য, তার মাত্রাবণ্টন এমনি বিস্ময়কর যে পাঠকের অভিরুচি-অনুসারে তাকে গদ্য বা পদ্য হিসাবে পড়া সহজ।

'তোমার প্রেমের সন্ধ্যাছায়ায় আলো কোথায়? প্লেটোর পেশীর মাভৈ তো নেই পাশে। ক্রিশ্চিআনের মৈত্রী তুমি ছড়াতে যাও, বর্ত্তমানের স্বপ্নভঙ্গে, ভবিষ্যতের পারিজাতের বীজে। বিশ্বপ্রেমিক, বাতির পাশেই কালোর খেলা, চারপাশে তার আলো। আমার তুমি নিলে, যেন সুরঙ্গমার রঙীন বিশ্ব মুছে' দিয়েই নিলে। পিতৃকালের বাড়ীবদল তোমার স্বভাবেই—এ-কৈলাসে কেমন তরো হালচাল যে ভাবি।

(দ্বিধাদম্পত্তি, পৃষ্ঠা, ৬১)

*   *   *

কিন্তু আমার মন যে উদাস,
মাথুর তো নয়, শিথিল-পেশী।
গদ্যেই তাই বলি—
বিকল্প এ নয় গো প্রিয়া নয়।
তোমারই প্রেম থরো থরো
আমার প্রেমের তপশ্চারী একটিমাত্র চূড়ায়;
দ্বৈতজনের ছায়াও আমি মাড়াইনে কো,
দ্বৈতাদ্বৈতের দোদুলদোলা স্বভাববিপরীতই।
একাধিকের সম্ভবনা তোমার মনেই;
আদিম নারীর স্বত্বজামির চাষে।

(উন্মনা, পৃষ্ঠা, ৮০)

অথচ এই স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ তিনি কখনো কথ্য রীতি ভুলে যান নি, বৈয়াকরণিক বিধি-নিষেধে জলাঞ্জলি দেন নি, সদা-সর্ব্বদা মনে রেখেছেন যে গদ্য হোক, পদ্য হোক, কাব্যের ভাষা জীবন্ত; এবং জীবন্ত ভাষা যেমন একাধারে লৌকিক ও ব্যক্তিস্বরূপের মুদ্রাঙ্কিত, জীবন্ত ছন্দ তেমনি সার্ব্বজন্য আবেগ আর অদ্বিতীয় অনুভূতির সঙ্কলন। তৎসত্ত্বেও ছন্দের সঙ্গে আঙ্গিকের সমীকরণ অবশ্য অসম্ভব; এবং বিষ্ণু দের নিজস্ব তাল-লয়-মানে অত্যাশ্চর্য্য শ্রুতিশুদ্ধির পরিচয় থাকলেও, তাঁর বাক্যযোজনা মাঝে

মাঝে দোষাবহ, ক্রিয়াপদের অপব্যবহার অল্প-বিস্তর অস্বস্তিকর, শব্দনির্ব্বাচন যে-পরিমাণে অনুষঙ্গবাহী, সে-অনুপাতে অভিধানসম্মত নয়।

যদি মোর কারুশিল্প রচনারা করে' থাকে কোনো অপরাধ
কুম্ভীরক প্রবৃত্তিতে, প্রিয়া মোর, পল্লবপ্রচ্ছন্ন তব চোখে ;
যদি মোর রচনারা তব শুভ্র সুকুমার তনুর মাধুরী
রূপান্তরে ব্যর্থ হয় ; স্বপ্নসুকোমল তব আঁখিছায়াপাত
যদি না দিয়েই থাকে শিল্পে মোর ঘটকালি-সার্থক প্রসাদ ;
যদি মোর কল্পনার মন্দিরের তোরণে শিখরে দেখে লোকে
তোমারই হাসির দক্ষ অভিনব গভীরতা অনন্য চাতুরী ;
তবু তো কহিবে তারা—এ তো কভু ভয়ে ক্ষোভে ভ্রান্তিতে বা শোকে
মৃত্যুরে বহেনি কর। জীবনের উল্লাসই এ চেয়েছে বরিতে।
লজ্জা মোর অক্ষমতা ; তবু প্রিয়া, তুচ্ছ হবে যত অপবাদ—
গ্লানি শুধু অক্ষমতা, তাই আর তোমারেই নিমিত্ত করিতে।

(পঞ্চমুখ, পৃষ্ঠা, ২৯)

উপরন্তু তাঁর অনুপ্রাস গতানুগতিক ও যমক শৈথিল্যসূচক ; এবং এ-অভিযোগের খণ্ডনে তিনি যদি একাধিক মহাকবির নাম নিয়ে বলেন যে পদান্ত্য মিলের কৃত্রিম যতিপাত উপলব্ধিগত ধ্বনিতরঙ্গের প্রতিকূল, তবে তাঁর বিরুদ্ধে এই আপত্তি উঠবে যে ওয়েনী অনিযমের যথেষ্ট সুপ্রয়োগ তিনি করেন নি। অন্ততপক্ষে তাঁর দীর্ঘ কবিতায় মিত্রাক্ষরের অভাব-প্রাদুর্ভাব হেতুপ্রভব নয়, সুবিধাসাপেক্ষ ; এবং যেখানে মিল আছে, সেখানে যখন দ্বি বর্ণের সৌসাদৃশ্যে পাঠকের আবেশতন্ময়তা ভাঙে না, তখন ত্রিবর্ণ বা চতুর্ব্বর্ণ যমকও সে নিশ্চয়ই সইতে পারে।

সে যাই হোক, এ-রকম নিন্দারোপের কোনো শেষ নেই ; স্বয়ং গ্রহ-পতিরা সুদ্ধ দুর্মুখের বাক্যবাণে ক্ষতবিক্ষত, এবং কোমর বেঁধে ছিদ্রান্বেষে নামলে, শুধু বিষ্ণু দে কেন, যে-কোনো সাহিত্যিকের ত্রুটিতালিকা মহাভারত ছাপিয়ে উঠবে। কিন্তু প্রারম্ভেই বলেছি যে বিনয় ও সহানুভূতিই বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্যের শ্রেষ্ঠ ভূষণ ; এবং যাঁরা প্রকৃত কাব্যামোদী, তাঁরা বিনা তর্কে বুঝবেন যে বিষ্ণু দে যখন মাত্রাচ্ছন্দের মতো রাবীন্দ্রিক যন্ত্রকেও নিজের সুরে বাজিয়েছেন, তখন তাঁর প্রতিভা নিঃসন্দেহ, তাঁর উৎকর্ষ স্বতঃপ্রমাণ, তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। কারণ ছন্দোমুক্তি যদিচ সাম্প্রতিক কাব্যের মূল সূত্র, তবু এক জনের আলাপ-আলোচনা অন্যের থেকে বিভিন্ন শব্দের গুণে নয়, শব্দোচ্চারণের গুণে ; এবং এই উচ্চারণ-পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য পদ্যের চেয়ে গদ্যেই সহজসাধ্য বটে, কিন্তু পদ্যের সার্ব্বিক

ঐকতানেও যাঁর স্বকীয় কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে না, তাঁর বৈশিষ্ট্যই নিশ্চয় অবিসংবাদিত। সুতরাং আমার মতে কবিপ্রতিভার একমাত্র অভিজ্ঞানপত্র ছন্দস্বাচ্ছন্দ্য; এবং মূল্যনির্ণয় যেহেতু মহাকালের ইচ্ছাধীন আর অর্থগৌরবের আবিষ্কর্ত্তা অনাগত সমধর্ম্মী, তাই সমসাময়িক কাব্যবিবেচনার নির্ব্বিকল্প মানদণ্ড ছন্দোবিচার। এই দিক দিয়ে বিষ্ণু দের অবদান অলোকসামান্য; এবং সেইজন্যেই তাঁর আর আমার মতান্তর সময়ে সময়ে মনান্তরে গিয়ে ঠেকলেও, তাঁর কাব্যে আমি কেবল আনন্দই পাই। অধিকন্তু আমার বিশ্বাস এই আনন্দ বন্ধুত্বের ধার ধারে না, বরং তাঁর কাছে যাঁদের কোনো রকম ব্যক্তিগত প্রত্যাশা নেই, তাঁদের নিরপেক্ষ সাধুবাদই বিষ্ণু দের অবশ্যলভ্য।

নয়নে তোমার মদিরেক্ষণ মায়া।
স্তনচূড়া দিল ক্ষীণ কটিতটে ছায়া।
স্বপ্নসারথি, তোরণ কি যায় দেখা?
অমরলোকের ইসারা তোমার চোখে।
ক্রান্তিবলয় মিলায় সুমেরুলোকে।
আজি কি আমারে ভুলেছ মহাশ্বেতা?
অমৃতের ঝারি মদির ওষ্ঠাধরে
স্মৃতি-বিস্মৃতি শরতের ধারা ঝরে।
আজি কি আমারে ভুলেছ মহাশ্বেতা?
শরীর তোমাব অলকানন্দা গান।
অচ্ছোদনীরে করো তুমি যেই স্নান
স্বপ্নবাণীতে শিহরায় ক্রন্দসী।
ভাস্বর তব তনুতে অমৃতজ্যোতি।
প্রাণসূর্য্যের একান্ত সংহতি।
ক্রান্তিবলয়ে শিহরায় ক্রন্দসী।
উত্তরকরে মুদ্রিত বরাভয়।
তামসীবে করো খণ্ডন, করো জয়।
স্বপ্নসারথি, তোরণ কি যায় দেখা?
পশ্চাতে ধায় মরণ-চাঁদের আলো
দিগন্তফণা, তুহিন, পাণ্ডু, কালো।
বিস্মরণীর বালুতীর যায় দেখা?
হে বীর অতনু, নাচিকেত ধনু টানো,
দেহদুর্গের রক্ষায় মোরে আনো—
তোমার প্রাকৃত বাহুতে মহাশ্বেতা।

সূর্য্যাবর্ত্ত

রবীন্দ্রনাথ হাল বাংলার সিদ্ধিদাতা গণেশ। তিনি তো আমাদের উৎসব-অনুষ্ঠানের সূত্রধার বটেই, এমনকি তাঁর বাণী-ব্যতিরেকে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যেও লাভ নেই। কারণ রবীন্দ্রপ্রতিভা মুখ্যত ভাবয়িত্রী হ'লেও, কারয়িত্রী পরিকল্পনাতেও তিনি অদ্বিতীয়; এবং শিল্পের সর্ব্ববিধ বিভাগেই তাঁর সিদ্ধি যেমন বিস্ময়াবহ, তেমনি বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনেও তাঁর দান সুস্পষ্ট। সেইজন্যেই স্বকীয় মনীষার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি খুঁজতে গিয়ে তিনি মাতৃভাষাকে যে-অভিনব রূপ দিয়েছেন, তার প্রতিভাসে কেবল সুধীসমাজই সমুজ্জ্বল নয়, অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিতেরাও উদ্ভাসিত; এবং তাঁর চিত্তবৃত্তির অনুকরণ যদিও আজ আর তেমন প্রশংসা পায় না, তবু অনেকের মতে রাবীন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষাই তরুণ-সাহিত্যেরও মূলধন। অবশ্য মানুষের মর্ম্মানুসন্ধানে বিদেশী পরকলাই সাম্প্রতিকদের একমাত্র সম্বল; কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় এখনো নিশ্চয় রৈবিক উপক্রমণিকার নিয়ম মানে; এবং তাঁর শালীন মাত্রাজ্ঞান বর্ত্তমান প্রগতি-বিলাসীদের চোখে অস্বাভাবিক ঠেকলেও, রবীন্দ্রনাথের উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিবাদই ইদানীন্তন উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যপদেশ।

সুতরাং অতিশয়োক্তির মতো শোনালেও, তাঁকেই গত পঞ্চাশ বছরের বঙ্গীয় চিৎপ্রকর্ষের পুরোধা বলা বিধেয়। রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত অগ্রণীরা যে-সার্ব্বভৌম সংস্কৃতির স্বপ্ন দেখেছিলেন, সন্ধান পান নি, সেই কল্পনাবিলাসকে এই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশের দৃষ্টিগোচরে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ; এবং আমরা সকলে যেহেতু সেই প্রবাহেরই বুদ্বুদ, তাই তার গতি-অগতির বিচার অথবা উপকার-অপকারের আলোচনা শুধু অশোভন নয়, দুষ্করও। কারণ আধিদৈবিক শ্রেয়োবোধ তো দূরের কথা, আধুনিক বিজ্ঞান বংশানুক্রমিক প্রবৃত্তিতেও আস্থা খুইয়েছে; সমাজতত্ত্ব এখনো পুরোপুরি যন্ত্রবাদে না পৌঁছলেও, মানুষমাত্রেই যে অভ্যাসের দাস, তাতে ভাবুকদের আর সন্দেহ নেই; এবং তথাকথিত তুলামূল্য যেকালে অনুশীলনেরই নামান্তর, তখন আজকালকার বাংলায় জন্মে রবীন্দ্রপ্রতিভার যাচাই করা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মতোই নিষ্ফল ও হাস্যকর।

তাহলেও রবীন্দ্রনাথ ও উপরোক্ত সংস্কৃতিধারার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ; এবং সম্প্রতি কোনো এক বাঙালী কবি তাঁর সঙ্গে হিমালয়ের তুলনা

করেছেন বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় সে-সমীকরণ উপমা নয়, উৎপ্রেক্ষা। কারণ সাধারণত অপাঠ্য হ'লেও, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি অন্ততপক্ষে প্রাক্‌মোগল যুগে; এবং প্রাদেশিকতার প্রকোপে এই অঞ্চল যদিও সর্ব্বদাই আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূত থেকেছে, তবু অনার্য্য আর অসভ্য চির দিনই ভিন্নার্থবাচক। অতএব রবীন্দ্রনাথকে বঙ্গীয় প্রাণসামগ্রীর উৎপাদক বলতে আমার ইতিহাসবোধে বাধে; এবং যখন অলঙ্কার-নির্ম্মাণের তাগিদে আমিও তাঁর প্রতিরূপ খুঁজি, তখন আমার মানস চক্ষে গোমুখী গিরিরাজের চিরন্তন চিত্র ভেসে আসে না, ফুটে ওঠে কোনো কাল্পনিক শৈলশৃঙ্গের অবচ্ছিন্ন ছবি, যা হয়তো নগাধিরাজের মতোই শাশ্বত ও সমুচ্চ, কিন্তু যার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সমভূমির সম্পর্ক নিতান্ত আপতিক, গঙ্গাকে যে জটার জালে জড়িয়ে রাখে না, পায়ের আঘাতে নূতন পথে চালায়।

তত্রাচ সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ছিলেন একা আরিস্টট্‌ল্‌-এর ভগবান। তিনি ছাড়া আর সকলেই পরজীবী; তাঁকে বাদ দিলে, অন্য কারো পক্ষেই নিছক আত্মচিন্তায় কালাতিপাত সম্ভব নয়। সেইজন্যেই পরিচ্ছিন্ন পাহাড়ের নীচেও পদাশ্রিত স্রোতস্বিনীর স্বেদবিন্দু জমে, প্রতিবেশী শস্পে তার সানুদেশে জড়ায়, এবং যে-আধিদৈবিক উৎপাত আশ-পাশের সমতলে ধ্বংস ছড়ায়, তাতেই ঘটে তার বৃদ্ধি। অতএব যাঁরা ভাবেন যে রৈবিক কাব্যের মধ্যে বৈষ্ণব রসধারা অন্তঃসলিলা, তাঁদের অনুমান যেমন নির্ভুল, তেমনি রবীন্দ্র-সাহিত্যে যাঁরা ওয়র্ড্‌স্‌ওয়র্থী চিত্তবৃত্তির প্রতিবিম্ব দেখেন, তাঁরাও মতিভ্রান্ত নন; এবং উভয় সিদ্ধান্তই শুধু আংশিক সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, কোনো পক্ষই তাঁর সমগ্র সত্তার সাক্ষাৎ পান নি।

তবে ব্যক্তিস্বরূপ যতই অসংযুক্ত হোক না কেন, তার সঙ্গে অতিমর্ত্ত্যের কোনো সম্বন্ধ নেই; এবং রৈবিক ব্যক্তিস্বরূপ যে-ধাতুসমূহে গঠিত, তার প্রত্যেকটাই যদিচ তন্মাত্র-পদবাচ্য, তবু উপাদানের গুণে তিনি আমাদের থেকে স্বতন্ত্র নন, পানের জোরেই তিনি সাধারণ ভঙ্গুরতা কাটিয়ে উঠেছেন। ফলত আমাদের মতো কালস্রোতের বুদ্বুদও রবীন্দ্রনাথের মূল্যবিচারে একেবারে অপারগ নয়, শুধু অনেকখানি প্রতিবন্ধ; এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের একটা প্রাক্তন সাদৃশ্য তো আছেই, উপরন্তু দার্শনিকদের মতে ভাব ও অভাব যেহেতু একই সত্যের এ-দিক আর ও-দিক, তাই আমাদের স্বভাবে যা নেই, তা জানলেই, আমরা তাঁর বৈশিষ্ট্য বুঝবো।

বলাই বাহুল্য যে উপরস্থ উপমাসঙ্করের সঙ্গে বৈদান্তিক নেতিবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। রহস্যঘনতা যেমন সকলের মতেই ব্যক্তিস্বরূপের

প্রধান লক্ষণ, তেমনি সেই কৈবল্যই যে সকল স্বতোবিরোধের তীর্থসঙ্গম, এ-বিশ্বাসও অনেকের বিবেচনায় অন্যায়। সুতরাং ভণিতা বাদে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে আমার বক্তব্য দাঁড়ায় এই যে প্রামাণ্যস্তাবক প্রাচ্য কবিদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাগ্রে প্রত্যক্ষের প্রয়োজন বুঝেছিলেন; এবং এই আত্মনিষ্ঠাই তাঁকে জাতিচ্যুত ক'রে আন্তর্জ্জাতিক লেখকমণ্ডলীতে স্থান দিয়েছিলো। অবশ্য উক্ত স্বাধিকারবোধ থাকলেই, মহাকবির মর্য্যাদা মেলে না; তার জন্যে আরো পাঁচটা গুণের সঙ্গে একটা নিরুপাধিক ঐশী ক্ষমতাও অপরিহার্য্য। তাছাড়া রাসীন্ থেকে ল্যাগুর পর্য্যন্ত কাব্যরচয়িতাদের ধ্রুপদী উৎকর্ষে যার আস্থা আছে, তার কাছে পরোক্ষ অনুভূতি শুধু মহার্ঘ্য নয়, সাম্প্রতিক সাহিত্যের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সে হয়তো প্রত্যক্ষকে এড়িয়েই চলে।

কিন্তু অতিবুদ্ধি শাস্ত্রনিষিদ্ধ ব'লেই, কূপমণ্ডূকের অনীহা প্রশংসনীয় নয়; এবং সঙ্গীতজ্ঞ না হওয়াতে আমি যদিও অবগত নই যে এই কীর্ত্তনের জন্মভূমিতে রাগ-রাগিণীর শুচি বায়ু কতটা প্রবল, তবু আমাদের কাব্যপ্রচেষ্টা যে চির কাল বর্ণাশ্রমের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে পথ চলেছে, তাতে বোধহয় সন্দেহের অবকাশ নেই। আসলে ভাষ্যপ্রণয়নই হিন্দুস্থানের সনাতন অভ্যাস; এবং দূরত্ববশত বেদ-বেদান্তের টীকা-টিপ্পনী আর আমাদের টানে না বটে, কিন্তু যুগধর্ম্মের তাগিদেও নিজস্ব চোখ-কানের ব্যবহার আমরা আজ অবধি শিখি নি। তার অপ্রমাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও ওয়ট্সনী মনোবিজ্ঞানে যাঁরা ছিদ্র খুঁজে পেয়েছেন, একবার ভারতবর্ষে বেড়িয়ে গেলে, তাঁরা নিশ্চয়ই মতপরিবর্ত্তন করতেন; এবং তার পরেও হয়তো প্রথাপ্রবণ মানুষকে কলের পুতুলের পর্য্যায়ে ফেলা চলতো না; কিন্তু বোঝা যেতো যে গুরুদীক্ষা সত্যই অঘটনসংঘটনপটীয়সী, অন্তত তার ফলে জীব ও জড়ের অদ্বৈত ঘটে।

প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ্য আর প্রথার মধ্যে ঐক্যের চেয়ে বৈষম্যই হয়তো বেশি; এবং ব্যক্তিত্বের ভিত্তি যেমন জাতির নৈর্ব্যক্তিক সংস্কারে, তেমনি জাতীয় জীবনীশক্তির উৎস দেশ-কালাতিরিক্ত মনুষ্যধর্ম্মে। কিন্তু নাৎসী মতবাদে আস্থা খুইয়েও জাতিরূপের উপলব্ধি যদি বা সম্ভবপর হয়, তবু অন্তত রোজর বেকন্-এর যুগ থেকে বিশ্বমানবের সাক্ষাৎকারে দার্শনিকমাত্রেই বৈফল্য কুড়িয়েছেন। তাহলেও প্রত্যয় হিসাবে বিশ্বমানবের মূল্য প্রায় অপরিসীম; এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমানায় তার সাক্ষ্য না মিললেও, কার্য্যত স্বয়ং সোহংবাদী সুদ্ধ এই অনেকান্ত মানবজাতির স্বভাবগত সাম্যে নিঃসংশয়। সেইজন্যেই পাঁচ হাজার বৎসর ধ'রে নির্ব্বিকার অধিকারভেদে বেড়ে উঠেও আমরা এখনো ভাবি যে অনুরূপ অবস্থায় বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি ঘটে,

এবং শিক্ষা ও প্রতিবন্ধকের তারতম্যেই বাঘে-ছাগলে এক ঘাটে জল খায় না।

এই কথাকেই ঘুরিয়ে বলা যায় যে গতানুগতিক প্রথাই শ্রেণিসংঘর্ষের জনক ও প্রাদেশিকতার উদ্যোক্তা; এবং মানুষ যেখানে তার স্বতন্ত্র সত্তা ও সহজ প্রবৃত্তি, তার নিজস্ব স্বার্থ ও প্রাক্তন পুরুষকার সংঘসঙ্কীর্ণ সমাজের তত্ত্বাবধানে সঁপে দেয় নি, সেখানে বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গল অলীক স্বপ্নমাত্র নয়, সেখানে সদ্ভাব স্বাভাবিক ও শাসন অনাবশ্যক, সেখানে চিরাচার মৃত কিন্তু ঐতিহ্য প্ররোহী। কারণ ভূপঞ্জরবিদ্যার বিচারে মানুষের মধ্যে স্তরভেদ অবর্ত্তমান; চামড়ার রঙে, ভাষার প্রয়োজনে, ভৌগোলিক তাগিদে আমরা আপাতত যত বিবাদই বাধাই না কেন, তবু আমাদের প্রত্যেকের উত্তরাধিকার এক ও অভিন্ন; এবং সেই বিশ্বস্ত ও বহু পরীক্ষিত অধিকর্ম্মার উপরে অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ের ভার চাপালে, আমাদের সংসারযাত্রাই শুধু অবাধে চলবে না, ব্রহ্মাণ্ড-সম্বন্ধে নানা মুনির নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতও হয়তো নির্ব্বিকল্পের নির্দ্দেশে নির্দ্বন্দ্ব হবে। সম্ভবত সেইজন্যেই ব্যক্তিবাদী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশ্বমানবের উদ্বোধন অসঙ্গত নয়, আবশ্যিক।

দুর্ভাগ্যবশত ভূতত্ত্ব নূতন বিজ্ঞান; এবং এ-দেশে সভ্য মানুষের বাস অন্তত পাঁচ হাজার বৎসর ধ'রে। উপরন্তু অন্যূন তিন হাজার বৎসর যাবৎ পরদেশী বিজেতাপরম্পরার পদান্তে প'ড়ে আদিম ভারতবর্ষ অনবরত স্বায়ত্তশাসনের স্বপ্ন দেখেছে। এ-অবস্থায়, এই রাজনৈতিক নিগ্রহের চাপে প্রস্তরিত প্রথার অপর্য্যাপ্তি কেবল প্রত্যাশিতই নয়, অনিবার্য্যও; এবং বাঙালী কবিকিশোরদের কাছে সত্যটা যতই অপ্রীতিকর ঠেকুক, তবু সাহিত্য যেকালে সমগ্র জীবনের ভগ্নাংশমাত্র, তখন আমাদের মজ্জাগত জাড্য সাহিত্যেও পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। যে-জাতি এক দিন কোমর বেঁধে নিরুক্তের নির্দ্দেশমতো একটা সাধু ভাষা বানিয়ে, অলঙ্কারশাস্ত্রের উদাহরণ হিসাবে এতগুলো বিরাট কাব্য লিখে গেছে, আধুনিক বাঙালী হয়তো তাদের বংশধর নয়; কিন্তু বাংলা ভাষা সেই সংস্কৃতেরই উঞ্ছজীবী, এবং খৃষ্টপূর্ব্ব সংস্কৃত কবিদের মতোই বিংশ শতাব্দীর বাঙালী সাহিত্যিকদের উপজীব্যও উদ্বৃত্ত।

হয়তো সেইজন্যেই রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এত বড় লেখকের এত দিনকার সহযোগকে আমরা যথেষ্ট উপকারে লাগাতে পারি নি, তাঁর স্বাবলম্বনের দিকে না তাকিয়ে বাঙালী শুধু তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের অনুকরণে অসংখ্য শাদা কাগজ অজস্র কালির আঁচড়ে ভরেছে। তাই "মানসী"-র অপূর্ব্বতা আর দৈনন্দিন পাঠকের নজরে পড়ে না, "গীতাঞ্জলি"-র অতুল ঐশ্বর্য্য আজ আটপৌরে আসবাব-পত্রের সামিল হয়েছে, এবং সম্প্রতি সম্ভবত "বলাকা"-র

পুনরাবৃত্তিতে থ'কে গিয়ে আমাদের প্রত্যেকেই রৈবিক গদ্যকবিতার মক্সয় হাত পাকাচ্ছে। অর্থাৎ বঙ্গসাহিত্যের সৌরমণ্ডলে উল্কাপাত অসম্ভব; এবং আমাদের গ্রহপতিদের গতিবিধির চর্চ্চা আমরা এত দিন ধ'রে করেছি যে তাঁদের প্রত্যেক বিকীরণ আমাদের নখদর্পণে, প্রত্যেক অপচার প্রত্যাশিত। অধিকন্তু এ-বৈধতা শুধু প্রাচীন সাহিত্যের চিহ্ন নয়, আমাদের অর্ব্বাচীন সাহিত্যও নিয়মাধীন। এ-দেশের কবিযশঃপ্রার্থীরা যে-গুণের জোরে নাম কেনেন, তারই অভ্যাসে তাঁদের সারা জীবন কাটে; কাব্য যে রসবৈচিত্র্য ব্যতীত বাঁচে না, তা বোধহয় তাঁদের অবিদিত।

অথচ বাঙালী নিজেকে কলালক্ষ্মীর বরপুত্র ব'লে মনে করে। সে ভাবে যে তার কাছে রূপ যেহেতু রৌপ্যের চেয়ে মহার্ঘ্য, তাই সরকারী পরীক্ষা-গুলোয় মান্দ্রাজীর সাফল্য তাকে টলাতে পারে না, স্বদেশী বাণিজ্যে মারোয়াড়ীর একাধিপত্য সে নীরবে সয়। কিন্তু আত্মপ্রসাদ প্রায় সর্ব্বত্রই অহৈতুকী; এবং বাংলা অভিধানে যদি বৈদগ্ধ্য আর ভাবালুতা সমার্থবাচক না হয়, তবে আমাদের রসজ্ঞান নিশ্চয়ই কিংবদন্তীমাত্র। আমরা অন্তত পাঁচ শ বছর থেকে কবিতা লিখছি; কিন্তু জন তিন-চার সর্ব্ববাদিসম্মত মহাকবির রচনা বাদ দিলে, আমাদের ভাণ্ডারে যা বাকী থাকে, তাতে সাহিত্যামোদীর লোভ ততটা নেই, যতটা লাভ মসলাবিক্রেতার।

আধুনিক বাঙালীর কথা জানি না; কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, শিবের গান, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি যাদের কলমে বেরিয়েছিলো, কল্পনা তো তাদের ছিলোই না, উদ্ভাবনার প্রয়াসও তারা কোনো দিন পায় নি; পূর্ব্ববর্ত্তীর অনুলাপ পরবর্ত্তী পুনরুক্তির উপাদান জুগিয়েছে। ফলে আমাদের আধ্যাত্ম্য-কবিতায় আত্মসমর্পণ বা অমৃতপিপাসা নেই, আছে কেবল কুসংস্কার ও নির্ব্বন্ধাতিশয্য; আমাদের প্রেমগাথায় স্বর্গ-নরকের দ্বন্দ্ব নেই, আছে শুধু নির্লজ্জ নাগরালি; আমাদের নিসর্গকাব্যে প্রকৃতির পরিচয় নেই, আছে মাত্র বারমাস্যার বাগ্‌বাহুল্য। এই গেলো বাংলার কবিকাহিনী; এবং সাহিত্যে ব্যাবসায়িক টান-জোগানের বিধান খাটলে, মানতেই হবে যে প্রতিধ্বনিপ্রীতি বাঙালী পাঠকেরও মজ্জাগত। হয়তো সেইজন্যেই আমাদের বাইরন্-বিলাসী অগ্রজেরা নবীনচন্দ্রকে মহাকবি বলতে দ্বিধা করেন নি, এবং আমাদের রবীন্দ্রপ্রভাবিত সমসাময়িকেরা সাহিত্যের সীমা-সম্বন্ধে অতটা উন্মুখর।

বরঞ্চ রবীন্দ্রপ্রতিভার ঐকান্তিক মহত্ত্বে আধুনিক লেখকের আস্থা আধুনিক পাঠকের চেয়ে বেশি, এবং সাহিত্যের মাত্রা না মানলেও, আত্মশক্তির পরিমিতি সকল স্রষ্টাই হাড়ে হাড়ে বোঝেন। ফলে আমাদের কাব্যরচয়িতারা কাব্যবিবেচকদের মতো কালাতীতের উপাসক নন: তাঁদের যেহেতু

ইতিহাসজ্ঞান আছে, তাই তাঁরা জানেন যে বাইরন্‌-এর মতো গৌণ কবির অনুকরণই যখন অত শক্ত, তখন রবীন্দ্রনাথের মতো মুখ্য কবির পদানুসরণ একেবারে অনর্থক। সেইজন্যেই সনাতনী বেতসীবৃত্তিকে তাঁরা যথাসাধ্য এড়িয়ে চলেন। সেইজন্যেই প্রচলিত ঠাটে মানসীমূর্ত্তির পুনর্নির্ম্মাণ তাঁদের অনভিপ্রেত। সেইজন্যেই তাদের শ্রেষ্ঠ প্রয়াস প্রযুক্ত আত্মবিজ্ঞাপনে, আত্মনিবেদনে নয়।

পক্ষান্তরে সাহিত্যের মাত্রা যদিও অনিশ্চিত, তবু তার ধর্ম্ম সুবিদিত; এবং স্বতঃসিদ্ধি গণিতের ভিত্তি হ'লেও, শিল্পসৃষ্টির পটভূমি পরিণামী চিৎপ্রকর্ষ। অতএব কবির পক্ষে রোমন্থন যত না গর্হিত, স্বয়ম্ভূতি ততোধিক অভাবনীয়; এবং মার্লো-র সঙ্গে শেক্স্‌পীয়র যেমন কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে গ্রথিত, মাইকেলেব পরে রবীন্দ্রনাথের জন্মও তেমনি আবশ্যিক। কিন্তু আমাদেব তথাকথিত তরুণ-সম্প্রদায় এই আর্য্যসত্যটাকে কাজে স্বীকার করলেও, কথায় আমল দেন না; এবং তাঁদের রচনারীতি রাবীন্দ্রিক বলরোলে অনুরণিত বটে, তাঁদের মনোভাবে তথাচ অধমর্ণোচিত বিনয় নেই। অবশ্য তাই ব'লে তাঁরা নিন্দনীয় নন; এখানেও তাঁরা রবীন্দ্রনাথেবই অনুকারী। বরং এ-বিষয়ে তাঁদের মৌনিতা তাঁর চেয়ে বেশি শোভন; কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষা এখন সাধারণের সম্পত্তি, আমাদের মাতৃভাষার আজ আর কোনো পৃথক সত্তা নেই; এবং সেইজন্যেই আমরা তাঁর সম্মোহ কাটাবার প্রয়াস পেলেও, আত্মরক্ষার উপায় জানি না। তবু সামর্থ্য না থাকলেও, ইচ্ছার যে অন্ত নেই, এইটাই বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য-সম্বন্ধে স্মরণীয় কথা।

কেননা ঐতিহ্য-ব্যতিবেকে সাহিত্যসেবা সম্ভব হোক বা না হোক, নির্ব্বিকার ঐতিহ্য শুধু চিরাচারের নামান্তর, যার পাষাণপুরীতে কারুকর্ম্মীই সমাদৃত, রূপকারের যাতায়াত নেই। সুতরাং সাম্প্রতিকদের বিদ্রোহ সর্ব্বতঃকাম্য; তার মধ্যে বিপ্লবেব পরিমাণ নগণ্য বটে, কিন্তু তার বিশিষ্টতা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য; এবং আধুনিকেরা যদিও প্রায়ই ভুলে যান যে ব্যক্তি-স্বরূপের অভাব কোনো দিনই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আস্ফালনে ঢাকা পড়ে না, তবু উত্তররৈবিক ছায়ানুবর্ত্তিতায় কাকজ্যোৎস্না জাগিয়েছেন তাঁরাই, আমাদের নিরিন্দ্রিয় নিরুদ্দেশযাত্রা শেষ হয়েছে তাঁদেরই নির্দ্দেশে। তাই শুধু সাধনার বিচারে আমাদের নূতন লেখকদের আমি অত্যাধুনিক ইংরেজ কবি অডেন্‌ বা স্পেণ্ডর বা ডে ল্যুইস্‌-এর সমপাংক্তেয় মনে করি; এবং সিদ্ধিতে, অর্থাৎ লোকমতে, এই বিদেশীরা আমাদের ছাড়িয়ে গিয়ে থাকলেও, সেজন্যে হয়তো ভারতের ভাগ্যবিধাতাই দায়ী। হয়তো প্রতিষ্ঠা পশ্চিমে সুকর; হয়তো সেখানকার আত্মনিষ্ঠ সমাজ স্বকীয়তার মূল্য দিতে জানে;

হয়তো ইংরেজী সাহিত্যের প্রাণপ্রবাহ ফল্গুর মতো প্রেততর্পণের মরুতীর্থ নয় ব'লে, উর্ব্বরতা সেখানে উৎসের চার পাশেই ধরা পড়ে না, নদীসংলগ্ন শ্মশানও সে-দেশে শ্যামল।

তাই ব'লেই কেন্দ্রাপসারণ আর সংস্কারমুক্তি এক নয়; এবং প্রকৃত কবিমাত্রেই যদিও প্রথম প্রকরণে অভ্যস্ত, তবু দ্বিতীয় অবস্থার অধিকারী শুধু তথাগতেরা। এ-কথা বাঙ্গালী কবিরাও জানেন; এবং সেইজন্যে তাঁরা পুনর্ব্বাদেরই প্রতিকূল, অনাসৃষ্টির চেষ্টায় বদ্ধপরিকর নন। উপরন্তু সে-প্রয়াসের কোনো অর্থ নেই; এবং আমাদের বস্তুজ্ঞান তো সাধারণ্যের অন্তর্গত বটেই, এমনকি আমাদের ভাষাও সার্ব্বজনীন, তার মারফতে আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি স্বতই অসম্ভব। তবে কবিরা অন্যদের চেয়ে আত্মচেতন; এবং নিজ গুণে না হোক, আঠারো শতকের শেষ থেকে তাঁদের স্বকীয়তা-সম্বন্ধে পশ্চিমে যে-জনশ্রুতি চ'লে আসছে, অন্তত তার শাসনে তাঁরা অপেক্ষাকৃত আত্মস্থও। অতএব তাঁদের জাতিব্যবসায়ে আর সামবায়িক সঙ্কল্পের প্রাদুর্ভাব নেই; তাঁরাও আজকাল স্বাধীন প্রতিযোগিতার পক্ষপাতী। তবু কবিজীবন কাব্যের চেয়ে ব্যাপক; এবং আমাদের ভাবে যতই মৌলিকতা থাকুক না কেন, স্বভাবে আমরা নিতান্ত নির্ব্বিশেষ।

অর্থাৎ বাংলা কাব্যের নব্য তন্ত্রও আগাগোড়া নূতন নয়; এবং ইদানীন্তন কবিরা আনুপূর্ব্বিক দৃষ্টিভঙ্গিই কাটিয়ে উঠেছেন, পরিপ্রেক্ষিতের পরবশতা ঘোচান নি। কিন্তু এর মধ্যে লজ্জার কোনো কারণ নেই। কাব্য আর দর্শন বিভিন্ন বস্তু; এবং কবির সমস্ত শক্তি যেকালে রূপসন্ধানেই নিয়োজিত, তখন তত্ত্বের জন্যে তিনি অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য। এ-নিয়ম দান্তে থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল মহাকবির সম্পর্কেই খাটে; এবং দান্তে যেমন "সুমা"-র রসানুবাদ ক'রে খৃষ্টান আখ্যা পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি উপনিষদের অনুগত ব'লে হিন্দুসভ্যতারই কবি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরে লোকযাত্রার লক্ষ্য বদলেছে। আজ আমাদের প্রাচীন বিদ্যাপীঠগুলোয় পরগাছাই একমাত্র বোধিদ্রুম-রূপে বিরাজমান; যান-বাহনের বাহুল্যে পৃথিবীর প্রসার সঙ্কুচিত; সার্ব্বভৌম অন্নাভাবে সকল মানুষের অবস্থাই সমান। কাজেই আমাদের আধুনিকেরা বৈদান্তিক বীক্ষায় নির্ভর হারিয়েছেন; তাঁদের মতে ভূমার দিকে নজর রেখে মোটর-ধাবিত রাজপথে চলা বিপজ্জনক।

ফলত বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য আর ভোরের কুয়াশায় আচ্ছন্ন নেই, তার পরিমণ্ডল এখন অস্তরাগে রঞ্জিত। কিন্তু এজন্যেও সাম্প্রতিকেরা চিন্তাশীল ব্যক্তির কৃতজ্ঞতাভাজন, এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রত্নতাত্ত্বিকের অভিযোগ অগ্রাহ্য। কারণ এ-ক্ষেত্রে তাদের বৈদেশিকতা দোষাবহ বটে, কিন্তু তাদের

মনুষ্যধর্ম শ্রদ্ধেয়। অবশ্য বৈদিক সভ্যতার বিধান মানলেই, মনুষ্যধর্ম নিপাতে যায় না; এবং মানুষকে অমৃতের পুত্র ব'লে ভেবেও রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যধর্মেরই পুরোহিত। কিন্তু তাঁর পটভূমিকা নিরুপাখ্য হওয়াতেই, বিশ্বমানবের চিত্রকেও তাতে বেখাপ্পা লাগে না; এবং আধুনিকেরা খুঁটি-নাটির মিল ধরতে পেরেই আত্ম-পরের প্রভেদ ভুলেছে। অতএব কেবল সন্ধানের বিচারে সাম্প্রতিক দর্শনের জয় হয়তো অনিবার্য্য। অন্ততপক্ষে অধুনাতনীরা দেখে শেখার সুযোগ পায় নি; তারা সাধারণত ঠেকেই শিখেছে; এবং সেইজন্যে যেখানে সম্মানের মাত্রা সিদ্ধির উপরে নির্ভর করে না, শুধু সাধনার মুখ চায়, সেখানে তাদের পাশ্চাত্ত্য পরিকল্পনা নিশ্চয়ই সাধুবাদের যোগ্য।

তাছাড়া বর্ণসঙ্করতায় বাংলা সাহিত্য অভ্যস্ত; এবং রবীন্দ্রনাথের নিজের বিশ্বাস যে আদর্শের দিক দিয়ে, এমনকি ভাবের হিসাবনিকাশে, তিনি খাঁটি বাঙালী নন। শুধু তাই নয়, প্রাক্‌মাইকেলী যুগেও কমঠবৃত্তির আদর ছিলো না; এবং ভারতচন্দ্রের চরিত্র যদিও আর্য্যপন্থী, তবু তাঁর ভাবনায় ও ভাষায় মুসলমানী প্রভাব সুস্পষ্ট। সুতরাং হাল আমলের বনেট্-পরা সরস্বতীও দেবতা; তিনিও বরদা ও নমস্যা; এবং দর্শন দূরের কথা, প্রতীক ও কবিপ্রসিদ্ধির প্রয়োজন কাব্যে যত দিন অক্ষুণ্ণ থাকবে, তত দিন অ্যাফ্রোডাইটি উর্ব্বশীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী। তবে শিল্প হেতুপ্রভব হ'লেও, তার ভূমিকার সমস্তটাই যদৃচ্ছালব্ধ নয়, তাতে অতিদৈবের স্থান আছে; এবং সাহিত্যপ্রসঙ্গে উপযোগবাদ যেহেতু অকাট্য, তাই তার উদ্দেশ্যে ও সার্থকতায় দ্বিরুক্তি নিষিদ্ধ। ফলে আমাদের সাগরলঙ্ঘনের কৈফিয়তে শুধু কালনিষ্ঠার নাম শুনেই আমার জিজ্ঞাসা বারণ মানে না, সিন্ধুপারের মায়াকাননে বন্দিনী সীতার কুশলপ্রশ্নও স্বতই মনে আসে।

এখানে আবার রবীন্দ্রনাথই আমাদের আদর্শ ও আশ্রয়। কারণ কতকটা অবস্থাগতিকে, এবং অংশত রুসো-পরবর্ত্তী পশ্চিমী লেখকদের দৃষ্টান্তে, তিনি আবাল্য নিজেকে ব্রাত্য-রূপেই দেখে এসেছেন। তাই কোনো দিনই কেবল অনুকরণে তাঁর মন ওঠে নি; এমনকি স্বরচিত রীতিকে মুদ্রাদোষে স্থায়িত্ব দিতেও তাঁর রূপকারী বিবেক আপত্তি তুলেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধুই আত্মসচেতন পুরুষ, তিনি অচেতন মানুষ নন; এবং উৎকর্ণ উন্মুখিতাই যেকালে রৈবিক জীবনযাত্রার বিশেষ গুণ, তখন তাঁর মনে পারিপার্শ্বিকের ছায়াপাত সম্ভাবনীয়। এমনকি অত্যাধুনিক বাংলা সাহিত্যও যে তাঁকে অল্প-বিস্তর প্রভাবিত করে নি, এ-কথা খুব জোর গলায় বলা শক্ত। তাহলেও তাঁর ঋণপরিগ্রহ দৈন্যবিরহিত ও বিলাসবর্জ্জিত; তাতে অকর্ম্মণ্যতার কোনো আভাস নেই; তাঁর হাতচিঠির আষ্টে-পৃষ্ঠে আন্তরিক

প্রয়োজনের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বিদ্যমান। ফলত গদ্যকবিতা-নামক তাঁর অধুনাতন কাব্যপ্রকরণের অন্তরালেও সম্প্রতিবেত্তার বাক্‌সর্ব্বস্ব ভূত বাসা বাঁধে নি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের লীলাবৈচিত্র্যেই তা মুখর।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথও কিছু সব সময়ে গদ্যচ্ছন্দের সদ্ব্যবহার করেন না; মাঝে মাঝে এ-রকম বিষয়কেও এই নব বিধান মানান, যা "পূরবী"-র অলঙ্কারবাহুল্যেই বেশি আরাম পেতো। কিন্তু এতাদৃশ অপপ্রয়োগের মধ্যেও কোনো স্বেচ্ছাচার বা শৈথিল্যের সূচনা নেই, তাঁর স্বাধীন মনের অবশ্যম্ভাবী বিকাশই আছে। বংশের গুণে এবং তৎকালীন পৃথিবীর শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি-দর্শনে রবীন্দ্রনাথের প্রতীতি জন্মেছিলো যে জগৎ আনন্দময়, এবং চূর্ণ মর্ত্ত্যসীমার উত্তরে দেবতার অপার মহিমা বিদ্যমান। দীর্ঘ জীবনের প্রত্যক্ষ পরীক্ষাও তাঁর অপসিদ্ধান্তের অপসরণ ঘটায় নি, তিনি এখনো সুন্দরের ধ্যানে পূর্ব্ববৎ তন্ময়। কিন্তু কুৎসিতকে তিনিও আর ঠেকিয়ে রাখতে পারছেন না, এবং ছন্দ-মিলের ছুৎমার্গে অভিজ্ঞা আব অভিজ্ঞতাব সন্নিপাত অসাধ্য জেনে বীভৎসের সঙ্গে মাধুর্য্যের সন্ধিস্থাপন করতে চাইছেন গদ্যকাব্যের নৈরাজ্যে। এটা যে আর্য্যসমাজী মনোভাব, তা নিঃসন্দেহ; কিন্তু এর পিছনে সনাতনী অনমনীয়তা নেই, অবস্থানুরূপ ব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতাই বর্ত্তমান।

তৎসত্ত্বেও মনে খটকা থেকে যায়; সন্দেহ হয় রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয় লাগুক বা না লাগুক, পরধর্ম্মকে তিনি ভযাবহ ভাবেন; তিনি হয়তো বোঝেন না যে প্রাচ্য মাযাবাদে দৈনন্দিন দুঃখ-কষ্ট অব্যাখ্যাত ব'লেই, সারা এশিয়া আজ অগত্যা পাশ্চাত্ত্য বস্তুতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছে। সম্ভবত সেইজন্যেই গীতিকবিতাবচনায তিনি যে-রকম উৎকর্ষে পৌঁছেছেন, নাট্যসাহিত্যে ততখানি সাফল্য পান নি। আসলে তাঁর মতো বিশাল ব্যক্তিত্ব ও বিরাট সিদ্ধি নিযে নাটকপ্রণযন হয়তো দুষ্কর। অন্ততপক্ষে ট্র্যাজেডির জনকমাত্রেই নিরাসক্ত ও আত্মবিস্মৃত; এবং অদৃষ্টবাদে আস্থা না রাখলেও, তার হয়তো চলে, কিন্তু টেরেন্স্-এর প্রতিধ্বনি ক'রে সে আজীবন বলতে বাধ্য যে মনুষ্যত্বের অপকর্ষও তার সুপরিচিত ও আত্মনিহিত; "পরিশেষ", "পুনশ্চ" ও "বীথিকা"-র এক-আধটা কবিতা অন্য সাক্ষ্য দিলেও, এ-স্বীকারোক্তি যেহেতু রবীন্দ্রনাথের আত্মমর্য্যাদাবোধে আটকায়, তাই তিনি যদিও সংস্কৃত কবিদের আবশ্যিক শুভবাদ কাটিয়ে একাধিক বিয়োগান্ত নাটক লিখেছেন, তবু মহাপুরুষেরাও যে অন্ধ নিয়তির পদানত, এ-কথা তাঁর কাছে অশ্রদ্ধেয় ঠেকে; তিনি মানেন না যে শুভাশুভের বিকল্প

অনিবার্য্য, এবং মানুষ কোন্ ছার, লাইব্‌নিৎস্ স্বয়ং বিশ্ববিধাতার মধ্যেই সাধ ও সাধ্যের দ্বন্দ্ব দেখেছিলেন।

উত্তরসামরিক মানুষের পক্ষে এ-বিশ্বাসের ভাগ নেওয়া অসম্ভব; এবং বাঙালী কবি যদি গতানুগতিকতার অপবাদ খণ্ডাতে চায়, তবে রবীন্দ্রনাথের আওতা থেকে খোলা জল-হাওয়ায় বেরিয়ে এসে তাকে দেখাতে হবে যে তিনি বাংলা দেশে বৃথাই জন্মান নি, জন্মে স্বজাতিকে স্বাবলম্বন শিখিয়েছেন। নচেৎ বঙ্গসাহিত্যের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কারণ স্বপ্নপ্রয়াণে তাঁকে ছাড়িয়ে যাওয়া তো দুষ্কর বটেই, এমনকি তিনিও যেকালে দুঃস্বপ্নের উপদ্রব একেবারে ঠেকাতে পারেন নি, তখন আমরা ঘুমিয়ে থাকলেও, বিশ্বব্যাপ্ত বিভীষিকার সঞ্চারে চমকে উঠবো। কিন্তু চমকে ওঠাই যথেষ্ট নয়; তার পরে আবার ফিরে শুলে, ভবিষ্যতে পুনর্জাগরণের সুযোগ মিলবে কিনা সন্দেহ। সুতরাং রাবীন্দ্রিক গদ্যচ্ছন্দে পয়ার, ত্রিপদী, একাবলীর উপযুক্ত মধুর মনোভাব ব্যক্ত ক'রেই আধুনিক বাঙালী কবির রক্ষা নেই, যুগধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ তার অবশ্যকর্ত্তব্য। এ-কথা না মেনে তার উপায় নেই যে প্রত্যেক সৎকবির রচনাই তার দেশ ও কালের মুকুর, এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে যে-দেশ ও কালের প্রতিবিম্ব পড়ে, তার সঙ্গে আজকালকার পরিচয় এত অল্প যে তাকে পরীর দেশ বললেও, বিস্ময়প্রকাশ অনুচিত।

নানা কারণে, প্রধানত যথেষ্ট সময়ের অভাবে, বইখানায় ছাপার ভুল বিস্তর রইলো। তবে সেগুলোর অধিকাংশই বোধহয় ক্ষমাশীল পাঠক নিজগুণে শুধরে নিতে পারবেন। সুতরাং নীচের শুদ্ধিপত্রে কেবল এমন প্রমাদ লিপিবদ্ধ হলো যা নিতান্তই অর্থবোধের অন্তরায়।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪	২০	নাম	দাম
২৭	১৪	এখানকার	এখনকার
৬৭	১	ছিলো না ;	ছিলো ;
৮০	২৪	মোদগটির	মোরগটির
৯০	১৬	নিলিপ্ত	নির্লিপ্তি
৯৯	২৬	চালানে	চালনে
১৫০	২৯	সে-যুক্তির	সে যুক্তির
১৬৬	২৮	অন্যান্য	অনন্য
১৬৯	১৩	থাকতে চান কি ব'লেই,	থাকতে চান নি ব'লেই,
১৮৫	১৪	দরুণ	দারুণ
২১২	১৯	নৃতত্ত্ব	নৃতত্ত্ব
২১৩	২৩	য়ু-প্রমুখ	য়ুং-প্রমুখ